বাংলাদেশের নাটকে নিম্নবর্গের জীবন

(১৯৭২-২০০৭)

বিদ্যুৎ সরকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ফিল ডিগ্রির জন্য রচিত অভিসন্দর্ভ

জানুয়ারি ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ সরকার-কর্তৃক উপস্থাপিত ***বাংলাদেশের নাটকে নিম্নবর্গের জীবন (১৯৭২-২০০৭)*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

(ডক্টর মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলাদেশের নাটকে নিম্নবর্গের জীবন (১৯৭২-২০০৭) শীর্ষক এম ফিল গবেষণা এবং অভিসন্দর্ভ রচনার উদ্দেশ্যে আমি ২০০৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে নিবন্ধনভুক্ত হই। প্রথম পর্বের পরীক্ষা শেষ করে ২০১০ সালের ডিসেম্বর থেকে আমি গবেষণাকর্ম শুরু করি। কিন্তু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নানান সংকটের কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমার পক্ষে অভিসন্দর্ভ-রচনা শেষ করা সম্ভব হয়নি। এরপর আমি ছয় মাস সময় বৃদ্ধির আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ তা মঞ্জুর করে।

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আমার শিক্ষক, অধ্যাপক ডক্টর মোঃ সিরাজুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। তাঁর অকৃত্রিম প্রেরণা, তাগিদ এবং দিক-নির্দেশনা আমার গবেষণাকর্মটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সব সময় সাহস যুগিয়েছে। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে তিনি আমার পাঠ-পরিধিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সহৃদয় সাহচর্য আমার কর্মকে করেছে সহজতর।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন আমার শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আকরম হোসেন, অধ্যাপক ডক্টর বেগম আকতার কামাল, অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আজিজুল হক। সহপাঠী ও বন্ধুপ্রতিম মুনিরা সুলতানার নিকট থেকে যে সহমর্মিতা পেয়েছি তা প্রায়-দুর্লভ। গ্রন্থ দিয়ে আমার কর্মকে সহজ করে দিয়েছেন কবি মিনাজ মুর, নাট্যনির্দেশক জসীম উদ্দিন, সাংবাদিক ও নাট্যামোদী অনীক রহমান। কবি কাজলেন্দু দে, গল্পকার আবু হেনা মোস্তফা এনাম, গবেষক শারমিন নাহার, কবি হানিফ রাশেদীন, বন্ধুবর মনোজ দে, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক সরকার সোহেল রানা গবেষণাটি শেষ করার তাগিদ দিয়ে সব সময় আমাকে উৎসাহিত করেছেন। এদের সকলের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

সাংসারিক কর্তব্যকে নিজ দায়িত্ব হিসেবে নিয়ে আমার অভিসন্দর্ভ-রচনা সহজ করে দিয়েছে জীবনসঙ্গী প্রতিমা বিশ্বাস। তাঁর ধৈর্য ও শ্রম আমার নিরন্তর প্রেরণা।

গবেষণাকালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃতিবিকাশ কেন্দ্র গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারসহ আমার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসব গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

মুক্তিযুদ্ধোত্তর কাল-পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক কাঠামোয়, মানুষের চিন্তা-চেতনায়, আশা-আকাঙ্ক্ষায় যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তারই সূত্র ধরে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটকের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আর্থ-সামাজিক মুক্তির আশা ও গণতান্ত্রিক চেতনার সঞ্চার করে। কিন্তু অচিরেই তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ক্ষমতা দখলের রাজনীতি, দুর্নীতির অবাধ বিস্তার, সামরিক শাসন, নেতৃত্বের নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি দৈশিক প্রেক্ষাপটে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যার ফলে অনিবার্যভাবেই মানুষের যাপিত জীবন অস্থিরতা ও হতাশায় নিমজ্জিত হয়। মানুষের পারস্পরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকে দিনের পর দিন। উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত, শাসক-শাসিত, শোষক-শোষিত, বিত্তবান-বিত্তহীন, উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ ইত্যাদি বিভেদমূলক সেই পুরোনো আর্থ-সামাজিক কাঠামোই ক্রমেই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হতে থাকে। একদিকে সমাজের ক্ষুদ্র অংশ ক্ষমতাবান, প্রভুত্বশক্তির অধিকারী অর্থাৎ উচ্চবর্গ, অন্যদিকে বৃহৎ অংশ ক্ষমতাহীন, বেঁচে থাকার তাগিদে অন্যের অধীন অর্থাৎ নিম্নবর্গ। মূলত কতিপয় ব্যক্তি, গোষ্ঠী দ্বারা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষমতা-কাঠামো নিয়ন্ত্রিত বলে সাধারণ-নিম্নবর্গীয় মানুষের যাপিত জীবনের কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তারই ফলস্বরূপ স্বাধীনতালাভের পর চারটি দশক পার হয়ে গেলেও দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী এখনো বহুবিধ সংকটে নিপতিত। ক্রমশ কতিপয় ধনী আরো ধনী এবং অসংখ্য গরিব আরো গরিব হচ্ছে। তাই বাস্তব কারণেই, আর্থ-সামাজিক কার্যকারণের সূত্রে বাংলাদেশের বেশির ভাগ নাটকে নিম্নবর্গের জীবনের প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে বহুমাত্রিকভাবে। সৈয়দ শামসুল হক, আবদুল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ, সেলিম আল দীন প্রমুখের বেশির ভাগ নাটকে বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে নিম্নবর্গীয় মানুষ। যারা কখনো আত্মরক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত, কখনো নিজস্ব ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার মানসে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আবার কখনো নিজের অস্তিত্ব নিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত।

বর্তমান গবেষণায় ১৯৭২ থেকে ২০০৭ কালপর্বে প্রকাশিত বাংলাদেশের নাটকে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন কীভাবে রূপায়িত হয়েছে, তা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের নাটক নিয়ে একাধিক পূর্ণাঙ্গ, খণ্ডিত আলোচনা-গবেষণা হলেও আমাদের জানা মতে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন নিয়ে এ পর্যন্ত কোনো গবেষণা হয়নি। কিন্তু সমকালীন বৈশ্বিক ও দৈশিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিম্নবর্গীয়দের নিয়ে যে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে, তাতে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক কাঠামো বিশ্লেষণে 'নিম্নবর্গ' ধারণাটি ভূমিকা রাখতে পারে। এই ভাবনা থেকেই মূলত বাংলাদেশের নাটকে রূপায়িত নিম্নবর্গীয়দের জীবন নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের আলোচনায় নিম্নবর্গ বলতে কী বোঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট করা দরকার। সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তি কোনো না কোনো শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে এক শ্রেণির সার্বিক আলোচনায় অন্য শ্রেণির কথা প্রসঙ্গক্রমে আসতে পারে। আমাদের গবেষণায় 'নিম্নবর্গ' বলতে মূলত সেই ব্যক্তি বা শ্রেণিকে বোঝানো হয়েছে, যারা অর্থনৈতিক দিক

থেকে সংকটে পতিত, সামাজিকভাবে অবহেলিত, রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন এবং জীবন যাপনের প্রয়োজনে কারো না কারো অধীন। তবে নিম্নবর্গ চিহ্নিতকরণে ধর্ম, বর্ণ, পেশা, শিক্ষা, লৈঙ্গিক পরিচয়ও আমাদের বিবেচ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বেশির ভাগই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্গের। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটকও সমাজবাস্তবতার নানামাত্রিক রূপকে জীবন্ত করে তুলতে সক্ষম। তাই বাংলাদেশের নাটকে নিম্নবর্গীয়দের জীবনসংশ্লিষ্ট সমাজকাঠামো ব্যাখ্যা করাই ছিল এই গবেষণার লক্ষ্য।

এটা অনস্বীকার্য যে, একটি সমাজে কোনো একটি শ্রেণি বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে না। বিভিন্ন শ্রেণির পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে সমাজ এগিয়ে যায়। আবার সাহিত্যে নির্মিত চরিত্রগুলোর শ্রেণিগত অবস্থানও বেশ জটিল। ফলে চরিত্রগুলো বিশ্লেষণের জন্য মাঠ পর্যায়ের গবেষণা ক্ষেত্র-বিশেষে সহায়ক হলেও বর্তমান গবেষণায় সে সুযোগ নেই। এজন্য আমাদের গবেষণা সম্পাদন করতে হয়েছে তত্ত্বনির্ভর ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে।

গবেষণার জন্য প্রাথমিক ও সহায়ক– দু'ধরনের উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ১৯৭২-২০০৭ কালপরিসরে রচিত নিম্নবর্গের জীবনসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নাটক। এ ক্ষেত্রে সৈয়দ শামসুল হক, আবদুল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ, সেলিম আল দীন, আবদুল্লাহেল মাহমুদ, মান্নান হীরা, মলয় ভৌমিক, গোলাম শফিক, মাসুম রেজা প্রমুখের নাটক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং 'নিম্নবর্গ' বিষয়-নির্ভর বিভিন্ন বই, প্রবন্ধ, পত্রিকা ইত্যাদি।

আমরা গবেষণাকর্মটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিস্তৃত করেছি। প্রথম অধ্যায় দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে 'নিম্নবর্গ' তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত এবং বৈশিষ্ট্য। এজন্য আমরা আন্তোনিও গ্রামসি, রণজিৎ গুহ, মিশেল ফুকো, অশোক সেন, গায়ত্রী চক্রবর্তী প্রমুখ তাত্ত্বিকের তত্ত্বের সাহায্য নিয়েছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের ঐতিহাসিক ও বর্তমান রূপটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাস, বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে শহরে বসবাসরত নিম্নবর্গের জীবনবাস্তবতা। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের মতো নাটকেও শহুরে জীবনের উপস্থিতি তুলনামূলক কম। তাই এ অধ্যায়ে আলোচিত নাটকের সংখ্যা বেশি নয়। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি বাংলাদেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গের অস্তিত্বের সংগ্রাম, যাপিত জীবনের নানান বাস্তবতা। সবশেষে শাহরিক ও গ্রামীণ নিম্নবর্গের জীবন বিশ্লেষণপূর্বক আমরা উপসংহারে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : পরিপ্রেক্ষিত ১-১৯

প্রথম পরিচ্ছেদঃ নিম্নবর্গঃ তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত ১-১১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ১২-১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ২০-২৭

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের নাটকে শাহরিক নিম্নবর্গ ২৮-৪৮

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাদেশের নাটকে গ্রামীণ নিম্নবর্গ ৪৯-১২১

উপসংহার ১২২-১২৫

পরিশিষ্ট ১২৬-১৩০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পরিপ্রেক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
নিম্নবর্গ: তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত

কোনো অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এক-একটি তত্ত্বের ধারণা। পরিবর্তনশীলতার অনিবার্য নিয়মে এক সময় সেই তত্ত্ব পুরোপুরিভাবে সমাজ, জীবন, সভ্যতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। তখন প্রয়োজন দেখা দেয় নতুন আরেক তত্ত্বের। যেটি পুরনো তত্ত্বকে সংস্কার, অস্বীকার কিংবা সম্প্রসারিত করার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। টমাস কুন (১৯২২-১৯৯৬) তার *দি স্ট্রাকচার অব সায়েন্টিফিক রেভুলেশনস* (১৯৬২) বইয়ে দেখিয়েছেন এক-একটি ঐতিহাসিক অবস্থায় জীববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে এক-একটি আদিকল্প বা তত্ত্বের ধারণাকে আশ্রয় করে। তারই ভিত্তিতে এক-একটি বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী বা ঘরানা গড়ে ওঠে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক চিন্তা এবং পরীক্ষা চলে সেই তত্ত্বের আদর্শে রচিত নানা মডেল বা প্রতিকল্পকে কেন্দ্র করে। সেই সব চিন্তা বা পরীক্ষার ফল বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্যোগে এবং পত্রপত্রিকা, পাঠ্যবই, নানাধরনের তালিমি কেতাবের মাধ্যমে প্রচার পায়। কিন্তু একটা সময় আসে যখন তত্ত্বে ও প্রয়োগে প্রচারের বা আন্দোলনের ফলে একই বিদ্যার ক্ষেত্রে নতুন নতুন এমন সব প্রশ্ন ওঠে বা সমস্যা আবিষ্কৃত হয়, যার উত্তর বা সমাধান ঐ তত্ত্বের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে পুরনো তত্ত্বকে হটিয়ে নেতৃত্বে নামে নতুন তত্ত্ব।[১] বিজ্ঞানের মতো জ্ঞানের অন্যান্য শাখার ক্ষেত্রেও এই বক্তব্যের যথার্থতা পরিলক্ষিত হয়।

'নিম্নবর্গ' ধারণাটির উৎপত্তি হয়েছে মূলত ইতিহাসকে নতুনভাবে ব্যাখ্যার প্রয়োজনে। বিশ শতকের সত্তরের দশকে ভারতে মার্কসবাদী রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস সংক্রান্ত নানা বিতর্ক দেখা দেয়। এর একটি ছিল অর্থনৈতিক, অন্যটি সামাজিক। অর্থনীতির আলোচনায় একপক্ষের বক্তব্য ছিল– "ঔপনিবেশিক আমলের শেষ পর্ব থেকেই ভারতের কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। কৃষিপণ্যের বিশ্বব্যাপী বাজার এবং বড় মাপের সংগঠিত অর্থলগ্নী ব্যবস্থার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়ে বড়-মাঝারি ছোট সব রকম উৎপাদনই এখন পুঁজিবাদী উৎপাদন রীতির নিয়ম মেনে চলতে শুরু করেছে।"[২] কিন্তু অন্যপক্ষ এ-বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেনি। তাদের বক্তব্য ছিল– "কোনও কোনও এলাকায় সীমিত কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা এখনো অটুট রয়েছে। বৃহত্তর বাজার বা লগ্নী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েও প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজের মৌলিক রূপান্তরের কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি।"[৩] অর্থনীতিবিদদের সমান্তরালে ঐতিহাসিকরাও ভারতবর্ষের উনিশ শতকের নবজাগরণ নিয়ে বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রণজিৎ গুহ (১৯২২-), সুমিত সরকার (১৯৩৯-), পার্থ চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৭-) প্রমুখ ঐতিহাসিকের নাম। তাঁদের প্রশ্ন ছিল– "রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রগতিশীল কোন অর্থে? তাঁদের সংস্কারচিন্তা তো ঔপনিবেশিক অর্থনীতি-রাজনীতির সীমানা ছাড়িয়ে এগোতে চেষ্টা করেনি। বস্তুত ব্রিটিশ শাসনের প্রগতিশীলতার ওপর আস্থা রেখেই তো তাদের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার শুরু। আর সেই শাসনক্ষমতার সীমাবদ্ধতাই তাদের সংস্কার প্রচেষ্টার সীমা। ঔপনিবেশিক ভারতে ক্ষমতার বিন্যাস নিয়ে কোনও মৌলিক প্রশ্ন 'নবজাগরণ' নায়কেরা তোলেননি, বরং ক্ষমতাবিন্যাসকে অবলম্বন করেই তাঁরা সামাজিক প্রগতি আনার চেষ্টা করেছেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়া অনিবার্য ছিল।"[৪] ইতিহাসবিদদের এই চেতনার অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে ১৯৬৭ সালের নকশাল বাড়ির কৃষক সংগ্রাম। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এটি সাময়িকভাবে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেও তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলন স্বাধীন ভারতের জাতীয় বা রাজনৈতিক মঞ্চে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ক্ষমতা বিন্যাস নিয়ে প্রশ্ন তোলে, যা উপেক্ষা করা ছিল অসম্ভব। ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি সম্পর্কিত এসব

অসম্পূর্ণ কিন্তু অনুপেক্ষণীয় বিতর্কের পটভূমিতে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষমতা কাঠামো সম্পর্কে নতুনভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করেন ঐতিহাসিকরা। তাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে দু'টি শ্রেণিতে ভাগ করেন: উচ্চবর্গের ইতিহাস ও নিম্নবর্গের ইতিহাস। প্রচলিত ইতিহাসকে ঔপনিবেশিক উচ্চবর্গ আর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্গের আধিপত্যকামী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ বলে অভিহিত করেন তাঁরা।[৫] মূলত উচ্চবর্গীয় এই আধিপত্যের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যেই শুরু হয় নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা। যার নেতৃত্ব দেন রণজিৎ গুহ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে সে সময় একটি তুমুল বিতর্ক দেখা দেয়। ব্রিটিশ ও মার্কিন ঐতিহাসিকরা দেখানোর চেষ্টা করেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আসলে মুষ্টিমেয় আদর্শহীন, কি নীতিহীন কতিপয় উচ্চবর্গের ক্ষমতা দখলের কৌশল। তারা জনসাধারণের সামাজিক বন্ধনকে কাজে লাগিয়ে তাদের ক্ষমতা দখলের উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছিল। আর এর বিপক্ষের জাতীয়তাবাদীরা তুলে ধরেন নেতাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কথা, আন্দোলনে জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণের কথা।[৬] কিন্তু রণজিৎ গুহ এবং নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চাকারীরা মনে করেন, ইতিহাসের উপর্যুক্ত দুটি ধারা আসলে উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত, কারণ দুটি ইতিহাসই ধরে নিয়েছে যে জাতীয়তাবাদ হলো উচ্চবর্গের ক্রিয়াকলাপের ফসল।[৭] এসব ইতিহাসে আদতে জনসাধারণের চেতনার কোনো স্থান নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী, জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গিজাত ইতিহাসচর্চার বিরোধিতা করেই শুরু হয় নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা– যার মধ্য দিয়ে 'নিম্নবর্গ' বিশ্লেষণে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর সৃষ্টি হয়।

নিম্নবর্গের ইংরেজি পরিভাষা Subaltern। শব্দটি ইংরেজি ভাষায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে। ক্যাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদের সেখানে সাবঅল্টার্ন বলা হয়। তবে শব্দটির সাধারণ অর্থ হল অধস্তন বা নিম্নস্থিত। আরিস্ততলীয় ন্যায়শাস্ত্রে এর অর্থ এমন একটি প্রতিজ্ঞা, যা অন্য একটি প্রতিজ্ঞার অধীন, যা বিশিষ্ট, মূর্ত, সার্বিক নয়। সাধারণ অর্থে ইংরেজিতে এর সমার্থক শব্দ হল সাবর্ডিনেট।[৮] সাবঅল্টার্নের বাংলা হিসেবে 'নিম্নবর্গ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারী গোষ্ঠীর প্রধান উদ্যোক্তা রণজিৎ গুহ। তবে এই ধারণা তিনি পেয়েছেন আন্তোনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭) রচিত *সিলেকশন ফ্রম দ্য প্রিজন নোটবুকস* (১৯৭১) গ্রন্থ থেকে। "সাবঅল্টার্ন (ইতালীয়তে সুবলতর্নো) শব্দটি গ্রামসি ব্যবহার করেছেন অন্তত দুটি অর্থে। একটি অর্থে এটি সরাসরিভাবে প্রলেতারিয়েত-এর প্রতিশব্দ। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সাবঅল্টার্ন শ্রেণি হলো শ্রমিক শ্রেণি। সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরনের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণি শোষিত ও শাসিত হয়। এই বিন্যাসে সাবঅল্টার্ন শ্রমিক শ্রেণির বিপরীত মেরুতে অবস্থিত হেজেমনিক শ্রেণি অর্থাৎ পুঁজিমালিক বুর্জোয়া শ্রেণি।"[৯] শ্রমিক শ্রেণি বনাম বুর্জোয়া শ্রেণি কিংবা সাবঅল্টার্ন বনাম হেজেমনিক শ্রেণি– সামাজিক সম্পর্কের এই বিশ্লেষণে গ্রামসি গুরুত্ব দিয়েছেন সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির ওপর, যার মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণি কেবল শাসনতন্ত্রে তার প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠা করে না, সৃষ্টি করে এক সামাজিক কর্তৃত্ব বা হেজেমনি।[১০] তবে তাঁর লেখায় গ্রামসি সাবঅল্টার্ন শব্দটির আরও সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেছেন। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শুধু নয়, শ্রেণি বিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্বেও তিনি সাবঅল্টার্ন শ্রেণির কথা বলেছেন। যেখানে সাবঅল্টার্ন বলতে শুধু শিল্পশ্রমিক নয়, বরং যেকোনও শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ক্ষমতাবিন্যাসের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উঠে এসেছে সেখানে। ক্ষমতাবিন্যাসকে গ্রামসি দেখেছেন একটি সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মধ্যে, যার এক মেরুতে অবস্থিত প্রভুত্বের অধিকারী ডমিন্যান্ট শ্রেণি, অপর মেরুতে যারা অধীন সেই সাবঅল্টার্ন শ্রেণি।[১১]

প্রাচীন সমাজ থেকে বর্তমান সমাজ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে প্রতি সমাজেই আধিপত্যহীন, অধীন দাস, ভূমিদাস, কৃষক, নিম্ন কারিগর, অন্ত্যজ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণিভুক্ত মানুষের উপস্থিতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।[১২] সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, আদিম সাম্যসমাজের পরে যখন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, তখন থেকেই

মানবসমাজ নানা শ্রেণিতে বিভাজিত হয়ে পড়েছে।[১৩] এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস ও ম্যাক্স ওয়েবারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মার্কসের তত্ত্বানুসারে, আজ পর্যন্ত প্রচলিত সকল সমাজের ইতিহাস হলো শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস।[১৪] মানব ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন প্রতিটি যুগেই সমাজে দুটো শ্রেণি ছিল। দাস যুগে দাসমালিক এবং দাস, সামন্তযুগে সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাস, ধনতান্ত্রিক যুগে পুঁজিপতি শ্রেণি এবং শ্রমিক[১৫]– এক শ্রেণি শোষক অপরটি শোষিত। এই প্রধান শ্রেণি ছাড়াও দাস সমাজ, সামন্ত সমাজে কারিগর শ্রেণি ও যাজক শ্রেণি এবং পুঁজিবাদী সমাজে পাতি-বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিও আছে।[১৬] আমাদের মতে শোষিত শ্রেণিই মূলত নিম্নবর্গ। কারণ এরা সব সময় আধিপত্যবাদী শ্রেণির অধীনে থাকে । নিম্নবর্গীয় ধারণার পথিকৃৎ আন্তোনিও গ্রামসিও এই সব নন হেজেমনিক শ্রেণিকেই মূলত সাবঅল্টার্ন তথা নিম্নবর্গ বলেছেন।[১৭]

বিশ শতকের শুরুতে ইতালীয় সমাজে পুঁজিবাদী বিকাশের অসম্পূর্ণতার পটভূমিতে সামন্তশ্রেণির প্রভুত্ব ও কৃষক শ্রেণির অধীনতার স্বরূপ গ্রামসির লেখায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এই দুই বিপরীত মেরুর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য তিনি অনুসন্ধান করেছেন মূলত সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে সাবঅল্টার্ন কৃষকের প্রাত্যহিক জীবনযাপন, ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক ধ্যানধারণা, তাদের নেতৃত্ব ও বিদ্রোহের সূত্রগুলো অনুসন্ধান ও বোঝার কথা বলেছেন। এজন্য তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন কৃষক শ্রেণির চেতনার সীমাবদ্ধতার ওপর। প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্কসূত্রের কারণে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রভুত্বের অধিকারী যে শ্রেণি, তার চেতনার সমগ্রতা, মৌলিকতা ও ইতিহাসবোধ যে পরিমাণ সক্রিয় থাকে, তার তুলনায় কৃষকচেতনা থাকে একান্তভাবেই খণ্ডিত, নির্জীব, পরাধীন। এমন কি বিদ্রোহের মুহূর্তেও নিম্নবর্গীয় কৃষকের চেতনা বহুলাংশে আচ্ছন্ন থাকে শাসকশ্রেণির মতাদর্শের আবরণে।[১৮] তবে এখানে কৃষক বলতে গ্রামসি শুধু কর্ষণজীবী মানুষকেই বোঝাননি, কৃষকের মধ্য দিয়ে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের অবস্থান ও ভাবাদর্শ ব্যক্ত করেছেন। নিম্নবর্গের চরিত্র বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়েই মূলত তিনি উপরিউক্ত ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। তবে গ্রামসি কৃষকদের আচ্ছন্নতা, পরনির্ভরতার চেতনার পাশাপাশি এ কথাও বলেছেন, যে কোনও শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক হলো বিরোধিতার সম্পর্ক। ফলে পরনির্ভরতার মধ্যেও কৃষকচেতনা সামন্তশ্রেণির চেতনার বিপরীত বিন্দুতে অবস্থিত থাকে।[১৯] যা মাঝে মাঝে তাদের জন্য ইতিবাচক সম্ভাবনা বয়ে আনতেও পারে। "লোকমানসের কিছু কিছু উপাদান যেমন আশ্চর্য রকম শক্তিশালী– বিশেষ করে তার মধ্যে একধরনের স্বাভাবিক নীতিবোধ কাজ করে, যা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, ন্যায়শাস্ত্র বা আইনের তুলনায় অনেক সহজ অথচ গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী। দৈনিক জীবনযাত্রার রীতিতে নানা পরিবর্তন ঘটলেও এই স্বাভাবিক ন্যায়-অন্যায় বোধ অক্ষুণ্ন থাকে। এমন কি নতুন নতুন পরিস্থিতিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নানা অভিনব পন্থার জন্ম দিতেও তা সক্ষম। সংস্কৃতি বা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে লোকসংস্কৃতি যদিও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের চাপে ভারাক্রান্ত থাকে, তা সত্ত্বেও সাবঅল্টার্ন শ্রেণি তাদের নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সেই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদানকেই মাত্র বেছে নেয়। সবটুকু নেয় না। ফলে ধর্মীয় জীবনের সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক চেহারার মধ্যেও একধরনের স্তর বিন্যাস দেখা দেয়। শাসক শ্রেণির ধর্মবিশ্বাস আর তাদের অধীন শ্রেণিগুলির ধর্মবিশ্বাস প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে এক হলেও তাই সেই বিশ্বাসের চরিত্র হয় পৃথক। এমন কী বিরোধী রূপও তা ধারণ করতে পারে। এই বিরুদ্ধতা থেকেই জন্ম নেয় সাবঅল্টার্ন শ্রেণির প্রতিরোধ, যা অনেক সময়ই ক্ষমতাশীল শ্রেণিগুলিকে বিপদে ফেলতে সক্ষম হয়।"[২০] এ কারণে গ্রামসি কৃষকদের চেতনার সীমাবদ্ধতার কথা বললে তার স্বাতন্ত্র্যের সম্ভাবনাই বেশি ব্যক্ত করেছেন তাঁর লেখায় । গ্রামসির এই ধারণার ভিত্তিতে, বলা যায় অনুসরণ করেই নিম্নবর্গ ধারণাটির উদ্ভব।[২১]

ইউরোপের সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণে মার্কস ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার যে প্রতিকল্প অর্থাৎ সামন্তশ্রেণির আধিপত্য ও কৃষকের অধীনতাকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা, তার বিলুপ্তি, পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে কৃষি

উৎপাদনের সূত্রপাত, কৃষকদের মধ্যে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া, জমি ও উৎপাদনের উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন এক সর্বহারা শ্রেণির সৃষ্টি; শহরাঞ্চলের পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় শিল্পোৎপাদনের প্রসার, বুর্জোয়া শ্রেণির সামাজিক কর্তৃত্ব বিস্তার, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও যুক্তিবাদী সমাজদর্শন, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক আদর্শ, প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদি ক্রমসম্পর্কিত যে তত্ত্ব নির্মাণ করেন, তা ছিল মূলত পশ্চিম ইউরোপের অভিজ্ঞতার ফসল।

উৎপাদন সম্পর্ক, রাষ্ট্রক্ষমতার বিন্যাস, সাংস্কৃতিক জীবন বিশ্লেষণের মাধ্যমে পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বুর্জোয়া শ্রেণির প্রাধান্য বিস্তারের একটি সঙ্গতিপূর্ণ চেহারা মার্কসবাদের ধারণায় তাত্ত্বিকভাবে সুবিন্যস্ত, সুসামঞ্জস্য এবং নির্দিষ্ট হলেও বিশ্বের যে সব অঞ্চলে ইউরোপের চেয়ে পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটেছে দেরিতে, কিংবা ঔপনিবেশিক তত্ত্বাবধানে, সে সব অঞ্চলের সঙ্গে এই রূপটির কোন মিল পাওয়া যায় না। তাই দ্বন্দ্বের অসম বিকাশকে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা থেকে জাত প্রতিকল্পের সাহায্যে ব্যাখ্যা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। এজন্য উৎপাদনরীতির বিন্যাসমূলক ও বিমূর্ত বিশ্লেষণ শুরু মাত্রই প্রয়োজন হয়ে পড়ে উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতা, ধর্মীয় জীবন, সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের জগতে শ্রেণিদ্বন্দ্বের চরিত্রটিকে চিহ্নিত করা। যদি ধরে নিই সমাজকাঠামোর প্রত্যেকটি অংশে এই দ্বন্দ্বের বিকাশ সমান্তরালভাবে এগোয়নি, তাহলে উৎপাদনরীতির চরিত্র অনুযায়ী উৎপাদনসম্পর্কের ধারণাটি ছাড়াও আরও কতকগুলি ধারণার প্রয়োজন দেখা দেয় যার সাহায্যে রাষ্ট্র কিংবা সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের বিকাশকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।[২২] প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কের ভিত্তিতে ছিল শ্রেণিবিভাজিত। সমাজব্যবস্থায় জাতিভেদ ব্যবস্থা ছিল প্রকট। ঐতিহাসিকগণ সেই বিষয়গুলো নানাভাবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তা বিদেশি উচ্চবর্গ বা দেশি উচ্চবর্গের পক্ষপাতী হওয়ায় নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক চেতনা ও কর্ম সেখানে অনুপস্থিত। পাশাপাশি শ্রেণি ও জাতিভেদের ভিত্তিতে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কারণে সমকালীন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতির বৈষম্যমূলক চরিত্রটি তাতে স্পষ্ট ধরা পড়ে না। সে কারণে নিম্নবর্গের তাত্ত্বিকরা মনে করেন, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপায় হিসেবে এমন একটা মৌলিক ও কেন্দ্রীয় ধারণা তৈরি করে এগোতে হবে, যা দিয়ে ক্ষমতাসূচক সব সম্পর্ক বোঝা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যা শ্রেণি-সম্পর্ক, শাসক-শাসিতের সম্পর্ক ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির অথচ ওই সম্পর্কগুলি সবই যার অন্তর্নিবিষ্ট। উচ্চবর্গ নিম্নবর্গের বৈপরীত্য এই রকমই একটা কেন্দ্রীয় ধারণা। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও সমাজে এমন কোনও অভিব্যক্তি নেই যা এই দুই শ্রেণির পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ-প্রকৃতি দিয়ে বোঝা ও বোঝানো যাবে না।[২৩] মূলত রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ভাবাদর্শ– যেগুলি ক্ষমতার উৎস– সেগুলির দ্বন্দ্বের বিকাশের প্রয়োজনে নিম্নবর্গ/উচ্চবর্গ ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে।

ক্ষমতাকেন্দ্রিক সামাজিক সম্পর্কই নিম্নবর্গীয় তত্ত্বের মূল কথা। এতে প্রভুত্ব/ অধীনতার বিশিষ্ট একটি কাঠামোর মধ্যে সামাজিক সম্পর্কটি বাধা থাকে। ফলে উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গ ধারণাটির অবস্থান উৎপাদন-সম্পর্কের সমতলে নয়, কিংবা সেটি সামাজিক শ্রেণির কোনও বিকল্প সংজ্ঞাও নয়, বরং বলা যায়, ঐতিহাসিক বিবর্তন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শ্রেণিদ্বন্দ্বের অসম বিকাশকে চিত্রিত করার প্রয়োজনে উৎপাদন সম্পর্কের সম্পূরক ধারণা এটি। ফলে উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের বিশ্লেষণ পদ্ধতি উৎপাদনরীতির ধারণাটিকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। ঐতিহাসিক বিবর্তনের কোনও বিশেষ পর্ব বা পরিস্থিতিতে এই রীতির জটিল বিন্যাস, অসমতা ও উত্তরণের সম্ভাবনার বিভিন্নতাকে বোধগম্য করে তুলতে সাহায্য করে মাত্র।[২৪] তবে ক্ষমতার সম্পর্কই এর সার কথা। এজন্য উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ বিচার-বিশ্লেষণে ক্ষমতার সম্পর্কই মূল বিবেচ্য হিসেবে পরিগণিত হয়।[২৫] কিন্তু শুধু কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কথাই এতে বলা হয় না। কারণ আধুনিক সমাজে ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্র ক্ষমতায় সীমিত নয়। [২৬] সমাজের সর্বত্র ক্ষমতা ছড়িয়ে রয়েছে।[২৭] মিশেল ফুকো মনে করেন, আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র আদৌ সার্বভৌমত্বের ছক অবলম্বন করে চলে না। তা চলে অনুশাসন বা ডিসিপ্লিনের ছকে।[২৮] কোনও নির্দিষ্ট অধিকারী, আধার

বা কেন্দ্রেই শুধু ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নয়। "ক্ষমতা সব জায়গা থেকে আসে এবং সামাজিক বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতা স্থির নয় সদাচঞ্চল, মুহূর্তে সে তৈরি হচ্ছে।"[২৯] এজন্য নিম্নবর্গ শব্দটির কোনো নির্দিষ্টকরণ সম্ভব হয় না। তাই আলাদা করে এর অর্থ খোঁজার চেয়ে উচ্চবর্গের সঙ্গে তার সম্পর্কের সূত্র, গতি-প্রকৃতি আবিষ্কারই জরুরি হয়ে পড়ে। এই সম্পর্ক ক্ষমতার সম্পর্ক।"[৩০]

মূলত ক্ষমতা-সম্পর্কের জন্যই পদমর্যাদার ক্রমোচ্চবিন্যাসে পার্থক্যের স্তর-পরম্পরায় সমাজের একেবারে পাদদেশে অবস্থান করেও প্রত্যেক নিম্নবর্গ তার চেয়ে নিচুস্তরের যে কারো তুলনায় উচ্চবর্গ হতে পারে।[৩১] এই বক্তব্যের আলোকে বলা যায়, অভিজাত শ্রেণির জমিদারের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে ধনী কৃষক নিম্নবর্গ আবার আধিপত্যের দিক থেকে এই ধনী কৃষক দরিদ্র, ভূমিহীন মজুর, কারিগর ও অন্ত্যজ শ্রেণির তুলনায় উচ্চবর্গ।[৩২] ফলে শুধু অর্থনৈতিক ভিত্তি নয়, উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের ক্ষমতাসূত্র সমাজ-সংস্কৃতি ইতিহাসের সঙ্গেও জড়িত।[৩৩] বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের কারণেই ভূমিহীন কৃষক তার ভূমিমালিকের তুলনায় নিম্নবর্গ হলেও তার স্ত্রী তার তুলনায় নিম্নবর্গ। ঠিক একইভাবে শিক্ষক-ছাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কিন্তু আধিপত্যের দিক থেকে শিক্ষক উচ্চবর্গ, ছাত্র নিম্নবর্গ।[৩৪] সর্বত্র ছড়ানো প্রভুত্ব ও শোষণের এই ধারণা থেকেই নিম্নবর্গের তাত্ত্বিকরা উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ সম্পর্ককে যাচাই করে দেখতে চান। প্রত্যেক মানুষ ক্ষমতা ব্যবহার করে, আবার একই সঙ্গে সে ক্ষমতার দ্বারা অধীন হয়। তাই শুধু রাষ্ট্র নয়, সমাজের ভেতর ক্ষমতার এই পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং গতিবিধিও 'নিম্নবর্গ' তাত্ত্বিক কাঠামোর অন্যতম অনুষঙ্গ।[৩৫] এ প্রসঙ্গে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন "নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদরা যা করেছেন তা হলো গ্রামসির কাছ থেকে নিয়েছেন নিম্নবর্গ ও আধিপত্যের ধারণা; আর ফুকোর কাছ থেকে নিয়েছেন ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকৃত অবস্থান ও আপেক্ষিকতার প্রত্যয়।"[৩৬]

রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গের অর্থ স্পষ্ট করতে সাহায্য নিয়েছেন *Concise Oxford Dictionary*র: The word subaltern in the title stands for the meaning as given in the *Concise Oxford Dictionary*, that is, 'of inferior rank'. It will be used in these pages as a name for the general attribute of subordination in southasian society whether this is expressed in terms of class, caste, age, gender and office or in any other way.[৩৭]

বিভিন্ন অভিধানে নিম্নবর্গ বলতে তাদেরই বোঝানো হয়েছে, যারা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষমতার দিক দিয়ে অধঃস্তন।[৩৮] জাত, বর্ণ, পদমর্যাদা, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং চাকরিগত বা পেশাগত অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনায় যারা প্রাধান্যভোগী বা উচ্চবর্গ, তাদের অধঃস্তনরাই নিম্নবর্গ। সর্বোপরি শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পদমর্যাদায় অনগ্রসর, অনুন্নত এবং শারীরিক শ্রমে নিযুক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত।[৩৯]

আগেই বলা হয়েছে, উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ ক্ষমতা সম্পর্কের সূত্রে চিহ্নিত হয়। উপনিবেশিক ভারতে শাসক, ক্ষমতাবান, আধিপত্যকামী উপনিবেশিক শক্তি কীভাবে ক্ষমতাহীন তথা নিম্নবর্গের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস সর্বোপরি তাদের মতাদর্শে আধিপত্য বিস্তার করেছে; নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চাকারীরা তারই বিবরণ প্রকাশ করেন। রণজিৎ গুহ উচ্চবর্গ বলতে বুঝিয়েছেন "ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভু শক্তির অধিকারী ছিল। প্রভুস্থানীয়দের আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়– বিদেশি ও দেশি। বিদেশি প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যে যারা এই সংজ্ঞাসম্মত, তারাও দুধরনের– সরকারি ও বেসরকারি। সরকারি বলতে গণ্য উপনিবেশিক রাষ্ট্রের অভারতীয় কর্মচারী ও ভৃত্য সকলেই; আর

বেসরকারি বলতে গণ্য বিদেশিদের মধ্যে যারা শিল্পপতি, বণিক, অর্থব্যবসায়ী, খনির মালিক, জমিদার, নীলকুঠি, চা-বাগান, কফিক্ষেত বা ওই জাতীয় যে সব সম্পত্তি প্লানটেশন প্রণালীতে চাষ করা হয় তার মালিক ও কর্মচারী, খ্রিস্টান মিশনারি, যাজক পরিব্রাজক ইত্যাদি।"[৪০] দেশি প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যেও তিনি একটা বিভেদ লক্ষ করেছেন। একাংশ বৃহত্তম সামন্তপ্রভু শিল্পপতি বুর্জোয়া এবং আমলাতন্ত্রে বা শাসনযন্ত্রে যারা উচ্চপদস্থ, অন্যাংশে রয়েছে আঞ্চলিক ও স্থানীয় প্রতিনিধি, যারা অঞ্চলভেদে প্রভাবশালী হলেও অন্য অঞ্চলে সে অন্য কোনো প্রভুর অধীন হতে পারে। এই তিন শ্রেণির বাইরে যারা তাদেরকেই নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাত্ত্বিকরা। অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায়ের বাইরে সাধারণ জনতা। রণজিৎ গুহ সাধারণ জনতা ও নিম্নবর্গকে সমার্থক মনে করেন: The terms people and subaltern classes have been used a synonmous throughout this note. The social groups and elements included in this category represent the demographic difference between the total indian population and all those whom we have described as the elite.[৪১]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞায় নির্ধারিত উচ্চবর্গের বাইরে যারা, তাদের সবাইকে রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গ বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে শহরের শ্রমিক, গরিব, সর্বোচ্চপদের আমলা বাদে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, ক্ষেতমজুর , কৃষক, গরিব, মাঝারি গরিব, আদিবাসী, নিম্নবর্ণের মানুষ, এমন কি নারীরাও ক্ষমতার সামাজিক মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের সম্পর্ক প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক, বৈপরীত্যের সম্পর্ক। একদিকে উচ্চবর্গ আধিপত্যকামী, শোষক, শাসক, উৎপীড়ক, অর্থ ও ভূসম্পদের মালিক, জাত-বর্ণ-শ্রেণি পেশাগতভাবে মর্যাদার অধিকারী, অন্যদিকে নিম্নবর্গ দরিদ্র, ভূমিহীন, জাত-বর্ণ-শ্রেণি- পেশাগতভাবে নিম্নশ্রেণি ও বর্ণের, ক্ষেতমজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রাম এবং শহরের মর্যাদাহীন গরিব জনতা। তবে রণজিৎ গুহ আঞ্চলিক ও স্থানীয় প্রভুদেরও নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হলো "দেশীয় প্রভুগোষ্ঠীর স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের সম্পর্কে একটা কথা কিন্তু খুব স্পষ্ট মনে রাখা দরকার। কথাটা এই যে, সামগ্রিক ও শুদ্ধ অর্থে উচ্চবর্গের এই অংশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অসমতা। এই অসমতার কারণ দ্বিবিধ: এক– সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের আঞ্চলিক বৈষম্য; আর দুই– এই অংশটির সামাজিক গড়নের সাংকর্য, অর্থাৎ তার অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলির মধ্যে গুণগত পার্থক্য। এই দ্বিবিধ অসমতার ফলেই যে শ্রেণি বা সমূহ এক অঞ্চলে প্রভুস্থানীয় বলে গণ্য তারাই আবার অন্যত্র আর এক প্রভুগোষ্ঠীর অধীন। একাধারে প্রভুত্ব ও অধীনতার প্রতীক বলেই তাদের মানসিকতা, রাজনৈতিক আদর্শ ও আচরণ, সখ্য ও শত্রুতার ঝোঁক বা তাৎপর্য সর্বক্ষেত্রে এক নয়, বরং অর্থ ও উদ্দেশ্যের নানারকম স্ববিরোধিতায় তা প্রায়শই অস্পষ্ট ও জটিল হয়ে দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক যুগে ভূস্বামীদের মধ্যে যারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, গ্রামভদ্রদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত ওপরের দিকে এবং ধনী কৃষক শ্রেণি– এরা সকলেই আমার সংজ্ঞায় শুদ্ধ অর্থে নিম্নবর্গের অন্তর্গত হলেও বহু ক্ষেত্রেই অবস্থার চাপে ও চৈতন্যের অন্তর্দ্বন্দ্বে উচ্চবর্গের সপক্ষে কাজ করে।"[৪২] নিম্নবর্গ চিহ্নিতকরণে অশোক সেনের অভিমত হলো: The term *subaltern* is used to denote the entire people that is subordinate in terms of class, caste, age, gender and office, or any other way.[৪৩]

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা গরিব চাষি, প্রায় গরিব ও মাঝারি চাষি, গরিব শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত, গ্রাম ও শহরের গরিব জনতা, আদিবাসী, নারী, নিম্নবর্ণ, নিম্নজাতি-বর্ণের কৃষক, শ্রমিক ও বর্গাচাষি, শহুরে নৈমিত্তিক শ্রমিকসহ খামার, খনি ও শিল্পশ্রমিক, নিরক্ষর কৃষক, নিম্নশ্রেণির শহুরে সর্বহারা, ভদ্রলোক পরিবারের গৃহভৃত্য, অচ্ছ্যুত, দলিত, দাস, নিরক্ষর অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, অভিবাসী, শিশু এবং প্রান্তিক মানুষকে নিম্নবর্গ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা বৈষম্যের কারণে উচ্চবর্গ সমাজে মর্যাদাশীল। জীবন, জীবিকার ধরন-ধারণ এবং গতিপথ নির্ণয়ে মূল নিয়ন্ত্রক তারাই। নিম্নবর্গের ভূমিকা সেখানে আপাত দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। কিন্তু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বোঝা যায়, উচ্চবর্গের নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও নিম্নবর্গ তাদের মতো করে একটা উপস্থিতি জানান দিয়ে যায়। যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তাদের রাজনৈতিক চেতনার স্বাতন্ত্র্য। ইংরেজ আমলের আগে থেকেই তাদের এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। রাজনীতির এই স্বাতন্ত্র্য, আদর্শ, ক্ষেত্র ও বাস্তবভিত্তি ইত্যাদির মধ্যে নিম্নবর্গের বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। প্রথম বৈশিষ্ট্য, নিম্নবর্গীয় রাজনীতির মূল উপাদানগুলি ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সনাতন হলেও প্রাকব্রিটিশ যুগের উচ্চবর্গীয় রাজনীতির মতো তা ঔপনিবেশিক অবস্থার চাপে নষ্ট বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি। বরং নতুন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং তারই মধ্যে চেতনা ও ব্যবহারের নানা দ্বন্দ্বের ফলে আকারে ও গুণে কিছু নতুনত্ব নিয়ে তা ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাজ করে গেছে।[৪৪] অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে নিম্নবর্গ তার রাজনীতির ধরন পরিবর্তন করে। উচ্চবর্গের দ্বারা প্রভাবিত হয় কিন্তু তার স্বাতন্ত্র্য লোপ পায় না বা পেতে দেয় না এবং পারিপার্শ্বিক চাপে তাদের রাজনীতি, চেতনা, ধারণা একদম হারিয়ে যায় না।

নিম্নবর্গের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তাদের সমাবেশের কায়দা ও চরিত্রে। উচ্চবর্গের জমায়েতের প্রধান ঝোঁক থাকে আইনের মধ্যে থেকেই শুধু নয় বরং আইনকে আশ্রয় করেই কাজ চালানো। আইনভঙ্গের মধ্যে যথাসাধ্য লিপ্ত না হওয়া তার রাজনৈতিক চরিত্রে বিদ্যমান। অন্যদিকে নিম্নবর্গের জমায়েত যথাসম্ভব আইনগত রাস্তা ধরে এগোয় ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজন হলে তা বেআইনী, এমনকি হিংসাত্মক হয়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত সহজে এবং উচ্চবর্গের তুলনায় তাড়াতাড়ি। তাই এই জমায়েত উচ্চবর্গের কাছে অনেক সময়ই খুব অপ্রত্যাশিত ও স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয়।[৪৫] এ যাবৎকালে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহগুলোই এর সাক্ষ্য বহন করে। ১৭৬৩-১৮০০ সাল পর্যন্ত সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, ১৭৮৩ সালের রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ, ১৮২৫ সালের গারো বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, তিতুমীরের সংগ্রাম, নীলবিদ্রোহ ইত্যাদি উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের ক্ষমতার উত্থান ও রাজনৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ। নিয়ন্ত্রণহীন, স্বাধীন, রাজনৈতিক চেতনায় স্বতঃস্ফূর্ত, উদ্দাম, বিবেচনাহীন, হিংসাত্মক, নিয়মবিরোধী, সশস্ত্র এবং সক্রিয় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের কারণে নিম্নবর্গ শাসনকাঠামোর ভিত কাঁপিয়ে দিতে পারলেও শেষ পর্যন্ত কোনো ইতিবাচক পরিণতি আনতে পারে না।

নিম্নবর্গের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য মূলত আদর্শগত। তাদের সামাজিক সত্তা যে সব উপাদানে তৈরি সে অনুযায়ী তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, চৈতন্যের স্তর ও রাজনৈতিক লক্ষ্য সব ক্ষেত্রে সমান নয়।[৪৬] ফলে আদর্শগত জায়গায় তাদের মধ্যে অমিল ও পরস্পর বিরোধিতা দৃশ্যমান। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের আদর্শের কোনো নির্দিষ্টীকরণ সম্ভব হয় না। নিজের কর্মধারা বিষয়ে কোনো স্পষ্ট তাত্ত্বিক চেতনা তাদের থাকে না। ফলে অনেক সময় তাদের কাজ সামষ্টিক চেতনার বিরুদ্ধাচারীও হতে পারে। আবার পৃথিবী সম্বন্ধেও নিম্নবর্গীয় সামাজিক গোষ্ঠীটির নিজস্ব একটা ধারণা থাকতে পারে। যে ধারণা প্রকাশিত হয় তাদের কাজের মধ্য দিয়ে, ঘটনাচক্রে এবং চকিতে– অর্থাৎ তারা যখন একত্রে, সমষ্টিগতভাবে কাজ করে। কিন্তু যখন তারা কার্যকলাপের দিক থেকে স্বাধীন এবং স্বশাসিত নয়, জ্ঞানগত অধীনতা ও আত্মসমর্পিত চেতনায় আচ্ছন্ন; তখনও তারা অন্যের ধারণা গ্রহণ করে।[৪৭] তাই স্বকীয় উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র, খণ্ড-খণ্ড প্রচেষ্টার মাধ্যমে মাঝে মাঝে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিলেও তার চেতনাকে উচ্চবর্গের চেতনার আচ্ছন্নতা থেকে বেশির ভাগ সময় মুক্ত রাখতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বলা জরুরি, প্রভুত্ব ও অধীনতা যেমন পারস্পরিক বৈপরীত্যের সূত্রে গাঁথা, তেমনি অধীনতারও আছে দুটি বৈপরীত্যপূর্ণ সত্তা– সহকারিতা ও প্রতিরোধ। নিম্নবর্গের চেতনায় দু'টিই সমভাবে থাকে। তবে অবস্থাভেদে একটি অপরটির চেয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে নিম্নবর্গের চৈতন্যে একটি অপরটির চেয়ে প্রাধান্য কায়েম করে।[৪৮] তাই প্রতিরোধই শুধু নয়, সহকারিতাও তাদের

অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্মবোধের স্বরূপেও নিম্নবর্গের চেতনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ ফুটে ওঠে। এই বোধের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তার চেতনার বিচ্ছিন্নতা ও রাজনীতির চরিত্র। জীবন যাপনে বিচ্ছিন্ন হতে হতে সে এমন এক পর্যায়ে পৌছে যায়, যখন কোনো সৃষ্টিকে সে আর নিজের প্রতিভা, শক্তি, ক্ষমতা প্রকাশ বলে মনে করতে পারে না। তাই নিজের শক্তির প্রকাশকে তার মনে হয় অলৌকিক। নিজেদের শক্তি বলে বিশ্বাস করতে চায় না।[৪৯] তবে তাদের ধর্মবিশ্বাস অনড় নয়, তাতে অভিযোজন হয়, আন্দোলনমাফিক ধর্মের নিজস্ব রূপ থাকে, রূপের অন্তর হয়।[৫০] আর এই ধর্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তার রাজনৈতিক চেতনা প্রকাশ পায়। উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে নিম্নবর্গের কোনো কোনো আন্দোলন হয় আপোসকামী আবার কোনোটা তুলনামূলকভাবে প্রতিবাদী। ফলে ক্ষেত্র বিশেষে তাদের রাজনীতিও হয়ে ওঠে আলাদা। কিন্তু নিম্নবর্গের চৈতন্যে এমন কোনো ধর্মবোধ নেই যা ক্ষমতা রহিত এবং রাজনীতি বিবর্জিত।[৫১] উচ্চবর্গের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, বিদ্রোহ কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগোয় নয়। ক্ষমতাগ্রহণের বাসনাও তাদের মধ্যে কাজ করে না। তবে কুটুম্বিতা, আঞ্চলিকতা ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর প্রতি তারা বিশ্বাসী এবং সহমর্মী ।

নিম্নবর্গ হিসেবে আঞ্চলিক ও স্থানীয় প্রধান, ধনী ও মাঝারি কৃষক শ্রেণি এবং আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায় একটু খাটো গ্রামপ্রধানের বৈশিষ্ট্য সাধারণ নিম্নবর্গের থেকে একটু আলাদা। অবস্থার চাপে স্থানীয় প্রভুদের স্বার্থ রক্ষা ও পূরণ করে বলে তারা চৈতন্যের অন্তর্দ্বন্দ্বে কাজ করে। আবার এক অঞ্চলে প্রভুস্থানীয় হলেও অন্য অঞ্চলে তারা কোনো না কোনো প্রভুর অধীন হয়। এ কারণে নিজেদের সামাজিক সত্তার ধর্ম অনুযায়ী তারা সব সময় কাজ করতে পারে না এবং একাধারে প্রভুত্ব ও অধীনতার মানসিকতা ধারণ করে বলে তাদের চৈতন্য হয় স্ববিরোধী ।

তথ্যনির্দেশ:

১. রণজিৎ গুহ, "নিম্নবর্গের ইতিহাস" গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা): *নিম্নবর্গের ইতিহাস*,: আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ২৬।
২. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস", *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ ১০।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১০।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১০ ।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১১ ।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১১ ।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১১ ।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২ ।
৯. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "ক্ষমতা প্রসঙ্গে দুই প্রেক্ষিত: গ্রামশি ও মিশেল ফুকো", শোভনলাল দত্তগুপ্ত (সম্পা): *আনতোনিও গ্রামশি বিচার-বিশ্লেষণ*, ২য় খণ্ড, পার্ল পাবলিশার্স, ও কলকাতা, ২০০০, পৃ ১৯ ।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯ ।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯-২০ ।
১২. মহীবুল আজিজ, *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২, পৃ ১৬।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫।
১৪. কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার*, ডি রিয়াজনভ ও ভি. জি কিয়ের্নান সম্পা, সেরাজুল আনোয়ার অনূদিত, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ ৫৪।
১৫. মহীবুল আজিজ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫-১৬।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬।

১৭. মিল্টন বিশ্বাস, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, বাংলা একাডেমী, ঢকা, ২০০৯, পৃ ৭।

১৮. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

১৯. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস", *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ ৪।

২০. প্রাগুক্ত।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ ৫।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ ৬।

২৩. রণজিৎ গুহ, "নিম্নবর্গের ইতিহাস" গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪।

২৪. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ইতিহাস", *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ ৬-৭।

২৫. মিল্টন বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ ৬।

২৬. শোভনলাল দত্তগুপ্ত (সম্পা) প্রাগুক্ত, পৃ ২২।

২৭. মিল্টন বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ ৬।

২৮. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "ক্ষমতা প্রসঙ্গে দুই প্রেক্ষিত: গ্রামশি ও মিশেল ফুকো", শোভনলাল দত্তগুপ্ত (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ ২৩।

২৯. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, "ঔপনিবেশিক ভারতে ইতিহাসের গতিবিধি", *নতুন দিগন্ত*, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন- ২০০৪, পৃ ২৯।

৩০. মিল্টন বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ ৩।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ ৩।

৩২. মিল্টন বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ ১। মূল উৎস: ডেভিড আর্নল্ড, "Gramsci and peasant subalternity in India", *The Journal of peasant Studies*, ভল্যুম ১১, ১৯৮৪, পৃ ১৬৪।

৩৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯।

৩৪. মিল্টন বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ ৬।

৩৫. প্রাগুক্ত।

৩৬. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২।

৩৭. রণজিৎ গুহ, "ভূমিকা", *Subaltern Studies-1*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লি, ১৯৮২, পৃ ৭।

৩৮. বিভিন্ন অভিধান অনুযায়ী সাবঅল্টার্ন হলো:

1. an officer in the british army below the rank of captain, especially in the second lieutenant. Adj. of lower status (Concise Oxford English Dictionary:1999)

2. any officer in the british army who is lower in rank than a captain, (Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English: 2005)

3. a) of inferior status,quality, or importance

b) person or body of person's subordinate

c) Inferior- now rare

d) Hence, of rank, power, authority, action of or pertaining to a subordinate or inferior. (The Oxford English dictionary: 1989)

4. নিম্নপদস্থ; inferior, অধীন,Subordinate- ক্যাপ্টেনের নিম্নপদস্থ সামরিক কর্মচারী বিশেষ। a commissioned army officer below the rank of captain. (Student's Favourite Dictionary: 2008)

5. পদ, পদবী, শ্রেণি, জাতপাত, বয়স, লিঙ্গ, পদ বা অবস্থান বা অন্য যে কোনো পরিচয়ে প্রাধান্যভোগী কোনো বর্গের অধঃস্থই নিম্নবর্গ। (The New Samsad English-Bengali Dictionary: 2001)

৩৯. মিল্টন বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ ৫।

৪০. রণজিৎ গুহ, "নিম্নবর্গের ইতিহাস" গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২।

৪১. রণজিৎ গুহ, "On some Aspects of the Historiography of colonial India", *Subaltern Studies*-1, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লি, ১৯৮২, পৃ ৮।

৪২. রণজিৎ গুহ, "নিম্নবর্গের ইতিহাস", গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩।

৪৩. অশোক সেন, "Subaltern Studies: Capital, Class and Community", *Subaltern Studies*-5, দিল্লি, ১৯৮৭, পৃ ২০৩।

৪৪. রণজিৎ গুহ, "নিম্নবর্গের ইতিহাস", গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫ ।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬।

৪৭. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "জাতি ও নিম্নবর্গের চেতনা", শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা), *জাতি বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ ৬৪।

৪৮. রণজিৎ গুহ, "নিম্নবর্গের ইতিহাস", গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩।

৫০. গৌতম ভদ্র, "গৌরচন্দ্রিকা", *ইমান ও নিশান, বাংলার কৃষক চৈতন্যের এক অধ্যায়*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ ১৭।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো

তাত্ত্বিকরা আন্তোনিও গ্রামসির সূত্র ধরে 'নিম্নবর্গ' ধারণার উদ্ভাবন করেন। ফলে গ্রামসি কোন পরিপ্রেক্ষিতে, কোন অর্থনীতির সূত্রে এর সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন তা জানা আবশ্যক। সার্দিনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষিনির্ভর মানুষের জীবনবাস্তবতা, ইতালির শ্রমিকশ্রেণির অস্তিত্বের সংকট ও সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি আধিপত্য-অধীনতার স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। তা থেকেই মূলত এই তত্ত্বের সৃষ্টি করেছেন।[১] ইতালির সমাজবাস্তবতার সূত্রেই গ্রামসি আধিপত্যবাদী হেজেমনিক শ্রেণি তথা শাসক অথবা প্রভু শ্রেণির বাইরে যারা রয়েছে তাদের সাবঅল্টার্ন শ্রেণি হিসেবে অভিহিত করেছেন। আবার প্রলেতারিয়েতের প্রতিশব্দ রূপেও সাবঅল্টার্ন শব্দটি গ্রহণ করেছেন তিনি।[২] ফলে ধারণাটির উদ্ভাবন এবং তাত্ত্বিক কাঠামোবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে আর্থ-সামাজিক সম্পর্কও জড়িত।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সাবঅল্টার্ন হলো শ্রমিক শ্রেণি। তারা ক্ষমতাবান হেজেমনিক বা বুর্জোয়া শ্রেণির বিপরীতে অবস্থান করে। অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণি তাদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়। ইতালির প্রেক্ষাপটে এটি উপলব্ধ ও লিখিত হলেও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও সত্য। তবে এই উপমহাদেশে অর্থনৈতিক কতৃর্ত্বের পাশাপাশি আরও একটি বিষয় ব্যক্তির মর্যাদাকে নির্ণয় করে। সেটি হলো বর্ণপ্রথা বা জাতিভেদ প্রথা থেকে সৃষ্ট সামাজিক কর্তৃত্ব । সমাজ কর্তৃক নির্ণীত, জন্মসূত্রে পাওয়া এই ক্ষমতা নিম্নবর্গের জীবনস্বরূপ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই অর্থনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে-সঙ্গে সামাজিক ক্ষমতার বিষয়টিও নিম্নবর্গীয় জীবন বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্কের ইঙ্গিত ভারতীয় সমাজ কাঠামোর মধ্যেই পাওয়া যায়। তবে প্রাক-ধনতান্ত্রিক যুগে তা অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না। ছিল জাতি-বর্ণ প্রথার সঙ্গে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, উৎপাদনের উপকরণে অধিকার ইত্যাদি ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করলেও বর্ণপ্রথাকেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজে তা সম্ভব নয়। প্রাচীন ভারতে বর্ণপ্রথাই ছিল সমাজের মূল ভিত্তি, যা মূলত দাস সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থারই পরিচায়ক।[৩] আর্যরা আসার পর থেকে এই অঞ্চলে বর্ণপ্রথার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা ব্যাপক হারে ঘটতে থাকে। কালক্রমে অদ্বিতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্ণব্যবস্থা স্থিতি লাভ করে।[৪] দামোদর কোশাম্বী মনে করেন, আর্যদের প্রথম আগমনের (খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ এর পরে নয়) মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাদের হাতেই এ অঞ্চলে দাস ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। বর্ণগতভাবে দাসরা ছিল ক্ষমতাহীন। কোনো ধরনের অস্ত্র বহনের অধিকার তাদের ছিল না। সম্পদের মালিকানা থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। তাদের তুলনা করা হতো গবাদিপশুর সঙ্গে।[৫] শাসনব্যবস্থা স্থিতিশীল করার স্বার্থে আর্যরা গড়ে তোলে চার স্তরের বর্ণপ্রথা– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র।[৬] চার শ্রেণির জন্মের উৎসও নির্ধারণ করে দেওয়া হলো: মুখ থেকে নিঃসৃত হল ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে রাজন্য বা ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্র। ক্রমে-ক্রমে মানব উৎপত্তিগত এই ধারণা বংশানুক্রমিক হয়ে সমাজ জীবনকেও প্রভাবিত করলো ব্যাপকভাবে। জন্মের উৎস সূত্রে কাজকেও ভাগ করে দেওয়া হলো। ব্রাহ্মণের কর্তব্য হলো যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপন, ক্ষত্রিয় হলো যোদ্ধা, সমাজের রক্ষক। বৈশ্য বাণিজ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যাপারে যুক্ত। আর শূদ্র হলো মেহনতী মানুষ– জমি চাষ করা, খাদ্য উৎপাদন ইত্যাদি কাজের ভার হলো তার। আর এই চার বর্ণের বাইরে ছিল যারা অবর্ণ বা পঞ্চম– এরা সমাজ বহির্ভূত। নোংরা কাজের ভার চাপিয়ে তাদের নোংরা বলে অবজ্ঞা করা হতো।[৭] আর্য সমাজের এই জাতি-বর্ণভেদ কালক্রমে এই অঞ্চলের সমাজব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হয়ে ওঠে। শূদ্র এবং পঞ্চম বর্ণ হয়ে

পড়ে ক্ষমতাহীন। তাদের ছায়া মাড়ালে পাপ হয়। তারা কোনো খাদ্য স্পর্শ করলে তা অপবিত্র হয়ে যায়– এরকম ধারণা প্রচলিত ছিল বলে সামাজিক কোনো কর্মকাণ্ডে তারা অংশ নিতে পারতো না। আমাদের সমাজ কাঠামো থেকে বর্ণপ্রথা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেলেও তার সূত্রে পাওয়া কর্মের অমর্যাদা এখনো বিদ্যমান এবং দৃশ্যমান। কারণ বর্ণভেদ প্রথা সামাজিক গতিশীলতার পথকে রুদ্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, এ প্রথার আরেকটি অস্বাভাবিকতা হলো এতে ব্যক্তির মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার জন্মপরিচয় দ্বারা।'[৮] কালক্রমে এখানকার মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সঙ্গে বর্ণপ্রথাজনিত বৈষম্য আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে গেছে। যার ফলে এ অঞ্চলে সামাজিক পরিবর্তন সব সময় অর্থনীতির রূপ-রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হয়নি। মৌর্যযুগে জাতিবর্ণপ্রথা বাংলার সমাজব্যবস্থাকে তেমন প্রভাবিত করেনি। অর্থশাস্ত্রে বর্ণকে শ্রেণির ভিত্তি বিবেচনা করা হয়নি। সেখানে উচ্চবর্গ হিসেবে পৌরজনপদের কথা বলা হয়েছে।[৯] ইতিহাসের আলোকে বলা যায়, খ্রিস্টপূর্ব সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিকাশ ঘটলেও গুপ্ত যুগের আগে বাংলা বর্ণপ্রথা তেমন ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি পায়নি।[১০]

গুপ্ত শাসন শুরু হওয়ার মধ্য দিয়েই মূলত বাংলায় সামাজিক স্তর বিন্যাসের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এ সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নিয়ে শাসকশ্রেণি এবং বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ সমন্বয়ে শাসিতগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের সমাজে বর্ণব্যবস্থার বিকাশের দিক থেকে গুপ্তযুগ ছিল সূচনাপর্ব, পালদের আমল হলো বিস্তৃতিকাল আর সেনযুগ হলো সুনির্দিষ্ট পর্যায়।[১১] সে সময় ভূমিই ছিল জীবিকার প্রধান উপায়। সামরিক ও শাসন সংক্রান্ত কর্মচারী ছাড়া বেশির ভাগ রাজপদ ছিল ভূমি ও কৃষি সংক্রান্ত।[১২] সামাজিক কর্তৃত্ব ও ধনের উৎপাদন ও বণ্টনের অধিকারের দিক থেকে পাল ও সেন যুগে বাংলার সমাজ মোটামুটি রাজপাদোপজীবী, ভূম্যধিকারী, রাজা সেবক, ধর্মজ্ঞানজীবী, কৃষক, শিল্পী বণিক, ব্যবসায়ী এবং শ্রমিক শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল।[১৩] এই বিভক্তির ভিত দাড়িয়েছিল বর্ণপ্রথার অপরিবর্তনীয় নিয়মের ওপরে। কারণ যেহেতু জাতিবর্ণ-প্রধান সমাজে বর্ণ ও শ্রেণি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সেহেতু বর্ণ ও বৃত্তির মর্যাদা অনুযায়ী ধনের বণ্টন হতো।[১৪] এর ফলে সেই সমাজের এক দিকে থাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মকর্ম, ভাষা-সাহিত্য– এক কথায় সমাজের মানস-জীবনের নায়কদের, শিক্ষা ও ধর্মজীবীদের, এর বিপরীতে থাকে সমাজের অঙ্গনির্গত আবর্জনা-পরিষ্কারক রজক-চণ্ডাল-বাউড়ী পোদ-বাগদী ইত্যাদি নিম্নবর্গীয়দের।[১৫] সমাজের বেশির ভাগই বর্ণ অনুযায়ী তার বৃত্তিসীমা রক্ষা করে চলতেন। ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে অন্ত্যজ চণ্ডাল পর্যন্ত ছিল অগণিত স্তর এবং অগণিত বৃত্তি। সেই বৃত্তি অনুযায়ীই নির্ধারিত হতো বর্ণের সামাজিক মর্যাদা, আবার বর্ণানুযায়ী ছিল মানুষের বৃত্তির নির্দেশ।[১৬] ফলে সমাজে শ্রেণি বিভাজন ছিল স্পষ্ট। পরিশ্রম দিয়ে এ সময়ে অনেকে সমাজকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখলেও তাদের মূল্যায়ন তেমন ছিল না। এমন কি সমাজের ধনোৎপাদক শিল্পী, ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের লোকরা সৎশূদ্র বা উত্তম সংকর শ্রেণিভুক্ত হতে পারেন নাই। আর যারা সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় শ্রমিক-সেবক, তাদের অবস্থান ছিল একেবারে অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ পর্যায়ে।[১৭] স্পষ্টতই প্রতীয়মান, অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছলতা বর্ণভেদ-আক্রান্ত সমাজে তেমন মর্যাদার বিষয় ছিল না। ফলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কোনো লোক অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল হলেও পদমর্যাদায়, সম্মান-শ্রদ্ধা প্রাপ্তিতে সে অর্থ ও সম্পদশালী থেকে এগিয়ে। ব্যবসায়ী শ্রেণি সমাজের অর্থনীতিকে সচল রাখলেও তাদের মাথা নোয়াতে হতো ব্রাহ্মণদের কাছে। বর্ণপ্রথার এই বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলা-অঞ্চলে কর্মের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। হিন্দুধর্মের বর্ণপ্রথার আদলে ইসলাম ধর্ম-সম্প্রদায়েও বৈষম্য দেখা যায়। উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুতে বাংলার গ্রামীণ সমাজে হিন্দুধর্মের জাতিবর্ণের ধারণা ও আদর্শের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সৈয়দ, মোগল, শেখ, পাঠান এই চার প্রধান এবং মর্যাদাসম্পন্ন মুসলিম গোষ্ঠীর বিপরীতে মোমিন, শাহ ফকির, পটুয়া প্রভৃতি নীচশ্রেণির মুসলমানের অস্তিত্ব পণ্ডি মবাংলায় আজও বিদ্যমান।[১৮] মোগল আমলে বাংলার মুসলিম সমাজ আশরাফ-আতরাফ নামে দুটি

শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[১৯] শ্রমজীবী, নিম্নবর্গের জীবন, চরিত্র, মনোভাব গঠনেও বর্ণভিত্তিক বৈষম্য রেখেছে সুদূরপ্রসারী এক প্রভাব। এর স্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাবো বাংলাদেশের নাটকেও।

প্রাচীন বাংলার সমাজ শুধু বিভিন্ন বর্ণেই বিভাজিত ছিল না, বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণিতেও বিভক্ত ছিল। সামাজিক ধনের উৎপাদন ও বণ্টনানুযায়ী সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণির উদ্ভব ও স্তরভেদ দেখা দেয়।[২০] কৃষি, শিল্প, ব্যবসা–বাণিজ্য– এই তিনটিই প্রাচীন ভারতীয় সমাজের অর্থের ভিত্তি। এই তিন শ্রেণির সামাজিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার ভেতর তারতম্য ছিল। বৌদ্ধ পাল রাজাদের সময়ে শিল্পী, ব্যবসায়ী, বণিকদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় কিন্তু সেন রাজাদের আমলে কৃষকরা একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী হিসেবে গড়ে ওঠে।[২১] শ্রেণিবদ্ধ সমাজকাঠামোয় অর্থনীতি যারা নিয়ন্ত্রণ করে, উৎপাদনের উপকরণ ও পুঁজি যাদের অধিকারে তারাই হয় ক্ষমতাবান। নিম্নবর্গ তাত্ত্বিক রূপটির মূল ভিত্তি ক্ষমতা। তাই অর্থনৈতিক ব্যাপারটি এর সঙ্গে গ্রথিত। পুঁজিবাদী, সামন্ততান্ত্রিক কিংবা পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামোর সমন্বয়ে গঠিত সমাজকাঠামোয় সম্পদ, উৎপাদনশক্তি, মূলধন ইত্যাদি সমাজের কতিপয় লোকের অধিকারে থাকে। শ্রমিকরা থাকে পরাধীন। অর্থনীতির ভিত সুদৃঢ় করলেও সমাজে তারা মর্যাদা পায় না। বখতিয়ার খিলজীর বাংলা জয়ের মধ্য দিয়ে শত শত বছর ধরে প্রচলিত সমাজে ব্যাপক ধাক্কা লাগে। জাতিবর্ণ ব্যবস্থাভত্তিক সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্তির আশায় বাংলার কৃষক শ্রমিক তথা শোষিত মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হয়। তবে এর মাধ্যমে সমাজকাঠামোয় কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। বাংলার ধর্মান্তরিত মুসলমানদের ভেতর গুটি কয়েক ভূমিমালিক ছাড়া ব্যাপক কৃষক সমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নতই থেকে যায়।[২২] সমাজ মূলত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে: মুষ্টিমেয় উচ্চস্তরের অভিজাত এবং নিম্নস্তরের বিরাট জনগোষ্ঠী।[২৩] হিন্দু অভিজাতের সঙ্গে বহিরাগত মুসলিম অভিজাতের সখ্যতা যেমন গড়ে ওঠে, তেমনি হিন্দু ও মুসলমান সমাজের কৃষক, কুটির শিল্পী শ্রেণির লোকেরা পরস্পর আত্মীয়তা অর্জন করে।[২৪] সামন্ততান্ত্রিক মুসলিম সমাজ ছিল শহুরে। আকবরের আমলে ভারতে কমপক্ষে ১২০টি বড় শহর ৩২০০টি ছোট শহর ছিল। এর ফলে ঐ সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে।[২৫] ব্যবসা-বাণিজ্যের এই প্রসারের কারণে অন্যান্য দেশের সঙ্গেও ভারতবর্ষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[২৬] মুসলমান শাসকেরা ব্যাপকভাবে মুদ্রার প্রচলন করেন। ফলে ভারতে তৈরি পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে খুব সহজে জায়গা করে নিতে থাকে।[২৭] ধীরে ধীরে মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ ঘটতে থাকে, যা ভারতবর্ষ তথা বাংলায় দেশীয় পুঁজি সৃষ্টির একটা সুযোগ সৃষ্টি করে। সমাজে ব্যবসায়ী শ্রেণিরও মর্যাদা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে সামাজিক বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক বৈষম্যও প্রকট আকার ধারণের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মোগল আমলে সামন্ততান্ত্রিক বাংলায় কৃষি সমাজকাঠামো এক নতুন রূপ লাভ করে।[২৮] সে সময় রাজা বা রাষ্ট্র বাদে সমাজে চারটি প্রধান স্তর বা শ্রেণি ছিল। ক) জায়গীরদার খ) রাজস্ব আদায়কারী গ) চৌধুরী, লস্বরদার, মণ্ড ল, মাতব্বর, সরপঞ্চ পদবিধারী ব্যক্তিবর্গ এবং ঘ) কৃষক। কৃষকদের মধ্যেও আবার 'খোদকাস্ত' ও 'পাইকাস্ত' নামে দুটি প্রধান রায়ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে। খোদকাস্ত ছিল গ্রামের মূল ও স্থায়ী বাসিন্দা। এরা জমির অধিকার ভোগ করতো এবং নিম্ন হারে খাজনা দিত। অন্যদিকে পাইকাস্তরা ছিল ভবঘুরে। এদের কেউ কেউ জমিদারের জমিতে রায়ত হিসেবে কাজ করতো। এদের স্থায়ী কোনো জমি ছিল না। অনাবাদী জমিকে আবাদ করে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঐ জমির ওপর তারা ভোগ-দখলে অধিকার লাভ করতো। তবে দিনে দিনে জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পাইকাস্ত রায়তরা শেষ পর্যন্ত এক ধরনের ভূমিদাসে পরিণত হয়।[২৯] মুসলিম আমলের অর্থনীতি ভূমিনির্ভর হলেও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তখন ধীরে ধীরে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করে চলেছেন এবং অর্থনৈতিক বিকাশকে রেখেছেন অব্যাহত। সমাজবিজ্ঞানী রংগলাল সেন ভূমিব্যবস্থা ও লগ্নিপুঁজির ওপর নির্ভরশীল সেই সমাজকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন: ১. জায়গীরদার, জমিদার, রাজস্বসংগ্রহকারী, মহাজন ও ব্যবসায়ী ২. ধনী কৃষক ৩.

মধ্যস্তরের কৃষক ৪. নিম্নস্তরের কৃষক ৫. ভূমিহীন কৃষক।[৩০] ১৭০৭ সালে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এদেশে সামন্তবাদ এক নতুন রূপ ধারণ করে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শ্রেণির সঙ্গে উদীয়মান ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণির সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং উভয় পক্ষই শ্রেণি-সচেতন হয়ে ওঠে।[৩১] অনুমান করা যায় যে, সে সময় জমিদার, জমির মালিকদের পাশাপাশি ব্যবসায়ী শ্রেণিও ক্ষমতার অংশ হয়ে উঠেছে এবং বুর্জোয়া শ্রেণি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার মতো অবস্থায় পৌছে গেছে।[৩২] ঠিক এরকম একটি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে ইংরেজরা ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা দখল করে এবং এতদিনের প্রচলিত কাঠামোয়ও ঘটে গুণগত পরিবর্তন। এই পরিবর্তনে প্রধান ভূমিকা রাখে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ১৮৩৫ সালের সরকারি প্রশাসনে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদার-শ্রেণি জমির মালিকে পরিণত হয়। এতদিন জমিতে কৃষকের যে সামন্ততান্ত্রিক অধিকার ছিল তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে গ্রামীণ জনগণের ওপর জমিদারের প্রত্যক্ষ শোষণের পথ প্রশস্ত হয়। কৃষিতে উৎপাদন কমে গেলেও জমিদাররা খাজনা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখে।[৩৩] জমিদার খাজনা আদায়ের স্বার্থে তাদের জমির মালিকানাস্বত্ব বিক্রি করে অসংখ্য ছোট ছোট মধ্যস্বত্বভোগী জমির মালিক শ্রেণির জন্ম দেয়।[৩৪] এর ফলে পত্তনিদার, জোতদার, গাঁতিদার, হাওলাদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। জমিদার সরকারের কাছে তার রাজস্ব পরিশোধ করতে না পারলে জমিদারি নিলামে উঠত আর কোম্পানির ধনী এজেন্ট, কর্মচারী এবং প্রভাবশালী মহাজনরা সেগুলো নিলামে কিনে নিত। এর ফলে জমির সঙ্গে সম্পর্কহীন এক ধরনের শহুরে জমিদার শ্রেণিরও উদ্ভব ঘটে। এর ফলে শহর এবং গ্রাম– উভয় সমাজে শ্রেণিবিভাজন বাড়তে থাকে লাগামহীনভাবে। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের দারিদ্র্যও বাড়তে থাকে। উচ্চবিত্তের মতো কৃষকরাও নানা স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। "রেভারেন্ড লালবিহারী সম্পাদিত দি বেঙ্গল ম্যাগাজিন নামক পত্রিকার ১৮৮০, ১৮৮১, ১৮৮২ সনের বিভিন্ন সংখ্যায় বাংলার কৃষকদের সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এসব প্রবন্ধে অবিভক্ত বাংলারর কৃষকদের চারভাগে ভাগ করা হয়, যথা উচ্চস্তরের কৃষক, স্বত্ববান কৃষক, নিঃস্বত্ববান কৃষক এবং শ্রমিক কৃষক।"[৩৫]

ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে বাংলার নগর জীবন ও অর্থনৈতিক বিকাশে চরম অবনতি ঘটে। ইংরেজদের ঔপনিবেশিক নীতিমালা শহরের শ্রমিকদের কৃষকে পরিণত হতে বাধ্য করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে শিল্পের চেয়ে কৃষিই ব্যবসায়ী শ্রেণির কাছে বেশি লাভজনক হয়ে ওঠে। ফলে নগরায়ণের গতি মন্থর হয়ে যায়। অনুপস্থিত জমিদার, মহাজন, মুৎসদ্দি, ব্যবসায়ী, উকিল, সরকারি কর্মচারী, কেরানি, শিক্ষক, ক্ষুদে ব্যবসায়ী ও ঠিকাদাররা তখন শহরের মুল অধিবাসী হয়ে ওঠে, যারা মূলত বৃটিশ সরকারের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক চাহিদা পুরণে সব সময় ছিল প্রস্তুত।[৩৬] জাতি-বর্ণ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা তখন ভেঙে পড়তে থাকে। অর্থ হয়ে ওঠে পদমর্যাদার মূল নিয়ামক। ১৮৩৫ সালে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের কারণে বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়। শাসকগোষ্ঠীর ভুমি ব্যবস্থাপনা ও পুঁজির বাণিজ্যিকী ক্ষমতা এই শ্রেণির বিকাশে ভূমিকা রাখে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হলে চাকরি, প্রশাসনিক কাজ ইত্যাদিতে অগ্রাধিকার দেয়া হতো। ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিদেশি এই শিক্ষামাধ্যমের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ জন্মে। মূলত ইংরেজির শিক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। প্রথম পর্যায়ে মধ্যবিত্তদের মধ্যে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে মুসলিম জনগণের মধ্যেও মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ ঘটতে থাকে। শিক্ষা ও বিকাশমান অর্থবিত্তের কাছে বংশ-কৌলিন্যের মর্যাদা তখন ক্রমে ক্ষীয়মান। সম্মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি ইত্যাদিতে বুর্জোয়া শ্রেণি তখন অগ্রসরমান। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভাজিত হয়ে পূর্ব বাংলা যখন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন এ অঞ্চলের কৃষি কাঠামোতে চারটি শ্রেণি লক্ষ করা যায়। ক) গুটি কয়েক মুসলিম বড় জমিদারসহ বৃহৎ জমিদারদের একটি ক্ষুদ্র

প্রভাবশালী গোষ্ঠী। খ) হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজের ভেতর প্রায় সমানভাবে বিভক্ত ছোট জমিদার, জোতদার ও ধনী কৃষকের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। গ) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বয়ংস্পূর্ণ মালিক কৃষকের একটি বিরাট শ্রেণি এবং ঘ) হিন্দু-মুসলিম উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় সমভাবে বণ্টিত এক বিপুলসংখ্যক গরিব কৃষক, বর্গাদার ও ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক।[৩৭] ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজনের কারণে পূর্ববাংলার অর্থনীতিতে দীর্ঘকাল প্রভুত্বকারী হিন্দু জমিদার, বুর্জোয়া, অভিজাত শ্রেণি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারি ফেলে ভারতে চলে যায়। তাদের স্থান দখল করে অবাঙালি মুসলমান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগোষ্ঠী।[৩৮] এর ফলে বাংলার অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে থাকে। এই পাচারকৃত সম্পদের মধ্য দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পের সংরক্ষিত বাজারে পরিণত হয়।[৩৯] শুধু ব্যবসা বাণিজ্যই নয়, বাঙালিরা নানাভাবে বঞ্চিত হয় শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা। চাকরি ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ছিল প্রায় একচেটিয়া অধিকার। এই বিমাতাসুলভ আচরণ বাংলার মানুষের কাছে স্পষ্ট ধরা পড়ে উর্দুকে রাষ্টভাষা করার মধ্য দিয়ে। এর প্রতিবাদে ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকের কাছ থেকে বাঙালিরা মাতৃভাষার অধিকার ছিনিয়ে নেয়। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বেশিদিন স্থায়ী হতে দেয়নি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী দেশপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলে বাংলার মানুষের ওপর দমন-পীড়ন ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। সামরিক সরকার কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পুজিবাদী কৃষক শ্রেণি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভূমিসংস্কার শুরু করে। এর ফলে জমিদার, জোতদার, ধনী কৃষক আরো ধনী হলেও দরিদ্র কৃষক দিনে দিনে দরিদ্রতর হতে থাকে। গরিব কৃষক, বর্গাদার, ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুরের অধিকার রক্ষায়ও সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়ে। ১৯৬০-৬৪ সালে পূর্বপাকিস্তানের গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা ৫২ ভাগ পরিবার ও জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ ছিল সম্পূর্ণ দরিদ্র।[৪০] শ্রমিকদের ওপরও শোষণ বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে ১৯৫৯ সালে আদমজী পাটকলের ২৫ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট পালনের ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পুঁজিপতি শ্রেণির অবস্থান দিনে দিনে উন্নত হলেও শ্রমিকদের কোনো উন্নতি সাধিত হয়নি। বরং মালিকের শোষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলার নেতৃত্বকে কোণঠাসা করে রাখা হয়। বাঙালির অধিকার আদায়ের লক্ষে সংগঠিত ১৯৬২'র ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬'র ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৮-১৯৬৯ সালে ছাত্রদের এগারো দফা আন্দোলন, ১৯৬৯'র গণঅভ্যুত্থান– সব পাকস্তানি শাসক কঠোরভাবে দমন করে। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে জয় লাভ করলেও শাসকগোষ্ঠী নানা টালবাহানা শুরু করে। পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে শহর ও গ্রামাঞ্চলে সংখ্যালঘিষ্ঠ বুর্জোয়া, জোতদার, ধনী কৃষক, মহাজন শ্রেণির বিপরীতে পেশাদারি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণি, গরিব কৃষক ও শিল্পশ্রমিকের সমন্বয়ে গঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অসন্তুষ্ট জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।[৪১] এরকম একটা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে দেশের মানুষের মুক্তির আশায় ঝাপিয়ে পড়ে মুক্তির সংগ্রামে। নয়মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ছিনিয়ে আনে দেশের স্বাধীনতা। কিন্তু অচিরেই জনগণের আবার মোহভঙ্গ হয়। যে আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে বাংলার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশ স্বাধীন করেছিল, সেই আশার বাস্তবায়নে মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী সরকার কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি; সেই রকম সাংগঠনিক শক্তি এবং দক্ষতাও তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকারের ছিল না। তাই পাকিস্তান আমলের আর্থ-সামাজিক কাঠামো থেকে স্বাধীন দেশকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা থাকলেও সরকার ব্যর্থ হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার মধ্য দিয়ে দেশে অরাজকতা নেমে আসে। সামরিক বাহিনী সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর পুঁজিবাদের মাধ্যমে দেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের চেয়ে বেসরকারি খাতকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে মালিক, পুঁজিপতি শ্রেণির পুঁজি

এবং ক্ষমতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। নব্য ধনীদের প্রবল প্রতাপে কৃষকরা দিনে দিনে তাদের জমি হারাতে থাকে। গরিব ও মাঝারি কৃষকরা তাদের জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ১৯৮০ সালের এক জরিপ থেকে জানা যায়, সে সময় দেশের ২৫.১ শতাংশ আবাদি জমি ২ শতাংশ লোকের মালিকানায় ছিল। অপর দিকে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ চাষীর মালিকানায় ছিল মাত্র ৪.৮ শতাংশ জমি।[৪২] জমির মালিক পুঁজিপতিরা রাজনৈতিক ক্ষমতায় থাকার কারণে নিম্নশ্রেণির স্বার্থ তারা শ্রেণিগত কারণেই বিবেচনায় আনেনি। কৃষকদের মতো শ্রমিকদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়ে। কলকারখানা বৃদ্ধির ফলে গ্রাম থেকে নিম্নবিত্তের লোকজন শহরে চলে আসতে থাকে। কিন্তু কর্মসংস্থান সেই হারে না থাকায় তাদের বেকার কিংবা জীবন যাপনের জন্য কঠিন সংগ্রাম করতে হয়। নগরায়ণ বৃদ্ধি পেলেও দেশের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি লোক এখন দারিদ্র্য সীমার মধ্যে বাস করে। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও তা থেকে মুনাফা লাভ করে মুষ্টিমেয় কোম্পানি ও ব্যক্তি। ৯০ এর দশকে বাংলাদেশর সম্পদের বিরাট একটি অংশ মাত্র ৩৬টি পরিবারের হাতে কুক্ষিগত ছিল। সেই চিত্র এখনো বিদ্যমান। শতকরা ৩০ ভাগ লোক শহরের শতকরা ৮০ ভাগ জমি নিয়ন্ত্রণ করছে।[৪৩] শ্রমিকের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু জীবনমানের কোনো উন্নতি হচ্ছে না। বৈষম্যমূলক এই আর্থ-সামাজিক কাঠামোর কারণে বাংলাদেশের ক্ষমতাবলয়ে একদিকে মুষ্টিমেয় শাসক-শোষক, বিপরীতে বিপুল সংখ্যক শাসিত-শোষিত। একদিকে জমির মালিক, ভূস্বামী, বুর্জোয়া অন্যদিকে ভূমিদাস, গরিব, ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক, কুলি, মজুর, প্রলেতারিয়েত, সর্বহারা। রংগলাল সেন বর্ণিত সমাজকাঠামো থেকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বৈষম্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়:

"ক) শিল্পশ্রমিক শ্রেণি, যাদের সংখ্যা পঞ্চাশের দশকে বাড়লেও তারা দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় এখনও নগণ্য; খ) বিরাট সংখ্যক গ্রামীণ সর্বহারা– এরা আসলে ক্ষেতমজুর শ্রেণি; গ) কৃষক– এরা ধনী, মাঝারী, গরিব ও ভূমিহীন শ্রেণিতে বিভক্ত; ঘ) শহরের বস্তিবাসী গরিব জনগোষ্ঠী– এদেরকে শহরের আধা-সর্বহারা শ্রেণি বলা যেতে পারে; ঙ) মধ্যবিত্ত বা মধ্যস্তরের জনসমষ্টি– এরা সমাজের এক বড় অংশ, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। এদের ভেতর ছোটো ছোটো উৎপাদক, ব্যবসায়ী, পেটি বুর্জোয়া, অফিসের চাকুরিজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠীর লোকজন রয়েছে। সাম্প্রতিককালে জীবনযাত্রার ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এদের এক বিরাট অংশ নিম্নশ্রেণিতে পর্যবসিত হচ্ছে। এদের ভেতর খুব অল্পসংখ্যক লোকই এখন সদুপায়ে অর্জিত অর্থের উপর নির্ভর করে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারছে। চ) বুর্জোয়া– এরা এখনও আকারে ক্ষুদ্র, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল এবং ছ) জোতদার– এরা বাংলাদেশের সামন্তশ্রেণির অবশিষ্টাংশ। এদের অধিকাংশ এখন মহাজনি কারবার, ব্যবসা, শিল্প ও পুঁজিবাদী কৃষিতে নিয়োজিত। সে যা হোক, উপরিউক্ত শ্রেণিকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাগত দিকে থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মোট শতকরা ৮৭ জন নিম্নস্তরে, শতকরা ৮ জন মধ্যস্তরে, এবং শতকরা পাঁচজন উচ্চস্তরে অবস্থান করছে। বর্তমান বাংলাদেশে যে অর্থনীতি, শিল্পনীতি, ভূমিনীতি ও উন্নয়নকৌশল চালু আছে তার মাধ্যমে ঐ ৫ ভাগ লোকই উপকৃত হচ্ছে।"[৪৪]

এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ নিম্নবর্গ এবং ক্ষমতাকাঠামোর কারণে মুষ্টিমেয় মানুষের দ্বারা তারা নানাভাবে বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত হচ্ছে। লেখক যেহেতু সমাজবিচ্ছিন্ন হতে পারেন না, তাই বাংলাদেশের নাটকে এই সব নিম্নবর্গের মানুষের জীবনও নানামাত্রিকতায় রূপায়িত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ:

১. অশোক সেন, "সার্দিনিয়ার প্রান্ত থেকে ধনতন্ত্রের সীমান্ত" শোভনলাল দত্তগুপ্ত (সম্পা), *আনতোনিও গ্রামশি বিচার-বিশ্লেষণ*, ২য়খণ্ড , পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ ৫৪-৫৫।

২. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "ক্ষমতা প্রসঙ্গে দুই প্রেক্ষিত: গ্রামশি ও মিশেল ফুকো", শোভনলাল দত্তগুপ্ত (সম্পা), *আনতোনিও গ্রামশি বিচার-বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯-২০।

৩. রঙ্গলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৭, পৃ ২১।

৪. ইরফান হাবিব, *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, ভাষান্তর কাবেরী বসু, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ২০০৬, পৃ ১৫১।

৫. দামোদর কোশাম্বী, *An Introduction to the Study of Indian History*, পপুলার প্রকাশন, বোম্বে, ১৯৭৫, পৃ ৯৭।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১০০।

৭. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *ভারতের ইতিহাস* (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) প্রথম খণ্ড , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ, ১৯৯৭, পৃ ৪৬।

৮. এ কে নাজমুল করিম, *Changing Society in India, Pakistan and Bangladesh*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ ১।

৯. রঙ্গলাল সেন, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩।

১২. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৬, পৃ ৪০৪।

১৩. রঙ্গলাল সেন, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২৬।

১৫. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬২।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২৬২ ।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫১।

১৮. রণজিৎকুমার ভট্টাচার্য, "পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলীয় মুসলমানসমাজে জাতিভেদের ধারণা ও চিন্তাধারা", শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা), *জাতি বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ ২১৯।

১৯. রঙ্গলাল সেন, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭।

২০. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬১।

২১. রঙ্গলাল সেন, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ ২৬-২৭।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯।

২৭. দামোদর কোশাম্বী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬০-৬২।

২৮. এ কে নাজমুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ ২-৩।

২৯. রঙ্গলাল সেন, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ ৪১।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ ৪২।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ ৫১।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৫১।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮-৭৯।

৩৮. মো. মেহেদী হাসান, *বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ*, মনন প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ ২৯। মূল উৎস: ফাহিমুল কাদির, "ঊনসত্তরের অভ্যুত্থানে গণমানুষের ভূমিকা", মুস্তাফা নুর-উল ইসলাম সম্পা, *আবহমান বাংলা*, আকাশ প্রদীপ, ঢাকা, ১৯৯৩।

৩৯. অনুপম সেন, *বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সমাজ সামাজিক অর্থনীতির স্বরূপ*, সাহিত্য সমবায়: ২য় সংস্কারণ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ ৫১।

৪০. রঙ্গলাল সেন, প্রাগুক্ত, পৃ ৯০।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ ৯১।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ ১০০।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১২০।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

উনিশ শতকে অবিভক্ত বাংলায় শহর হিসেবে কলকাতার পরে ছিল ঢাকার স্থান। ওই শতকের মধ্যভাগে বা তার কিছু পরে কলকাতা থেকে থিয়েটার ছড়িয়ে পড়ে মফস্বলে। সে সময়ে কলকাতার পাশাপাশি ঢাকাতেও সমান্তরালভাবে থিয়েটার চর্চা হয়েছে।[১] কলকাতার নাটকের অনুসরণে নির্ধারিত হতো এখানকার নাটকের গতিপথ। উনিশ শতকের শেষ পর্যায় থেকে অবিভক্ত ভারতে মুসলিম মধ্যবিত্তসমাজ শ্রেণি সচেতন হতে শুরু করে।[২] মুসলিম মধ্যবিত্তের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ১৯০৬ সালে গঠিত হয় মুসলিম লীগ। এসময় মুসলিম লীগে পাশ্চাত্য-শিক্ষিত মানবতাবাদী তরুণ মুসলিম মধ্যবিত্তের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও এর অন্যতম চালিকা শক্তিরূপে কাজ করছিল সামন্তশ্রেণি।[৩] বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে মুসলিম সম্প্রদায়কে আত্মসচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তবে কংগ্রেসের হিন্দুত্ববাদী ধর্মীয় আবেগের বিপরীতে একই ধারায় ইসলামীয় ধর্মীয় আবেগও তাদের কর্মকাণ্ডে র মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ১৯২৬ সালে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন, পরবর্তী পর্যায়ে গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কারণে ক্রমে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল মূল্যবোধ গড়ে উঠতে থাকে।[৪] ১৯৪৭ সালের দেশভাগের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলে পূর্ববঙ্গের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তন সাধিত হয়। পাকিস্তানী ব্যবসায়ী ও সামন্তপ্রভুদের সেবাদাসরূপে কাজ করবে এমন রক্ষণশীল ধর্মান্ধ সামন্ত মূল্যবোধ-আশ্রয়ী ব্যক্তিরাই প্রশাসনে, বেতার সেক্রেটারিয়েটে, কর্মজীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে পাকশাসকেরা তাদের অনুকূল গোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে।[৫] হিন্দু ব্যবসায়ী এবং ভূস্বামীরা দ্রুত এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে শুরু করে। পাকিস্তানের জন্ম এতদিন শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে পিছিয়ে থাকা অবহেলিত মুসলমান সম্প্রদায়কে আত্মপ্রতিষ্ঠার এবং নেতৃত্বদানের এক সুযোগ এনে দেয়। এই সূত্রে স্থানীয় নাট্যকারদের মধ্যেও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট সুযোগ এবং ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।[৬] তবে এই সময় থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রটির রাজনীতির ধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পূর্ববাংলার নাটক এবং নাট্যকার দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৭] রাজনৈতিক বিভক্তির মতোই পূর্ববঙ্গের নাট্যচর্চায় একদিকে দেখা যায় রক্ষণশীল মৌলবাদী গোষ্ঠী এবং বিপরীতে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী গোষ্ঠী।

পাকিস্তান নামক দেশটির জন্মের পরে-পরেই রক্ষণশীল গোষ্ঠীর নাট্যচর্চার লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের মাহাত্ম্য জনগণের সামনে উপস্থাপন করা। এ কারণে তারা নাটকের বিষয় হিসেবে বেছে নেয় মুসলমান সম্প্রদায়ের সংগ্রামী ইতিহাস-ঐতিহ্যকে। মুঘল ঐতিহ্য, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সাম্রাজ্যসমূহ, বাংলার মুসলমান শাসকগোষ্ঠী ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিমণ্ড লে এই ধারা নাট্যকাররা নাটকের গতিপথ ও সার্থকতা অনুসন্ধান করতো।[৮] এই ধারা ছিল মূলত মফস্বলকেন্দ্রিক।[৯] নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখ্য আকবরউদ্দিন (১৮৯৫-১৯৭৮), শাহাদাৎ হোসেইন (১৮৯৩-১৯৫৩), ইবরাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) প্রমুখ। তবে সামাজিক বিষয় একেবারে তাঁরা এড়িয়ে যেতে পারেননি। আকবরউদ্দিনের *আযান* এবং *অভিশাপ* নাটকের বিষয় সামাজিক। ইবরাহিম খাঁ-এর *কাফেলা* নাটকে প্রকাশ পেয়েছে গ্রামীণ মুসলমানদের জীবন ধারা। তবে নাটকে তারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক কাঠামো, শাসন-শোষণের কোনো চিত্র উপস্থাপন করেননি। ফলে শেষ পর্যন্ত তাদের নাটক হয়ে দাঁড়ায় ইসলামি ঐতিহ্যের প্রচার।

এ সময়ে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল নাট্যকাররা পাকিস্তানী চেতনা নয়, নাটকের বিষয় হিসেবে তুলে ধরেন সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট। নুরুল মোমেন (১৯০৬-১৯৮৯) রচিত *নেমেসিস* (১৯৪৮), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) রচিত *আমলার মামলা* (১৯৪৯), *কাঁকর মণি* (১৯৫২), *তস্কর ও লস্কর* (১৯৫৩), আসকার ইবনে শাইখ (১৯২৫-২০০৯) রচিত *বিরোধ* (১৯৪৮) ইত্যাদি

নাটকে আর্থ-সামাজিক সঙ্কট, অস্থিরতা, নৈতিক স্খলনই মুখ্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে।[১০] এই ধারার নাটক ছিল ঢাকাকেন্দ্রিক।[১১] আরো স্পষ্ট করে বললে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক। স্বাধীনতা-উত্তর কালে বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যচর্চা মূলত এই ধারারই বিকাশমান রূপ। তাই গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী ধারার নাটকের বিষয়গত দিকই এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন বাঙালির জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে জন্ম নেওয়া পাকিস্তান এদেশের মানুষের মনে যে আশা উদ্দীপনা জাগায়, ঔপনিবেশিক আমলের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অপরিবর্তনীয়তার কারণে তাদের সেই আশা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। ক্রমে রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের ধনসম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয় ব্যবহার করে পশ্চিম পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে। ফলে দিনে দিনে বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জীবন যাপন ব্যবস্থা ক্রমে শোচনীয় হয়ে ওঠে। আবার রাজনৈতিক দিক থেকেও বাংলার মানুষ ছিল কোণঠাসা। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর এই সব আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালি প্রথম প্রতিবাদ করে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। এই ঘটনার পরে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক ধারার নাট্যকারদের সঙ্গে রক্ষণশীল ধারার নাট্যকারদের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গণতন্ত্রী-মানবতাবাদী ধারার নাট্যকারদের নাটকসমূহে রাজনৈতিক অঙ্গীকার দ্বারা চিহ্নিত সামাজিক সচেতনতার ক্রমবর্ধমান মাত্রা পরিলক্ষিত হয়।[১২] তাঁরা তাঁদের নাটকের বিষয় হিসেবে তুলে ধরেন জনগণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক শোষণের চিত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ নাট্যকাররা প্রত্যেকে আধুনিক নাটক এবং নাট্যকলা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বব্যাপী জনগণের মধ্যে যে অস্তিত্বসংকট সৃষ্টি করে তার ফলে জন্ম নেয় নতুন জীবনভাবনা।[১৩] '৪৭-পরবর্তী বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ধারার নাট্যকার নুরুল মোমেন, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), আসকার ইবনে শাইখ, আনিস চৌধুরী (১৯২৯-১৯৭১), সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০১০) প্রমুখদের মধ্যে সেই প্রভাবও লক্ষ করা যায়। তবে বিষয়গত দিক বিবেচনায় স্বাধীনতা-উত্তর কালে বাংলাদেশের নাটকে বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রতীয়মান।

ভাষা আন্দোলনের পূর্বে রচিত নুরুল মোমেনের *নেমেসিস* বিষয়বস্তু জীবনদৃষ্টি, গঠনশৈলী এবং উপস্থাপনা-রীতির পরীক্ষায়, সাফল্য ও সিদ্ধিতে বাংলা নাটকের ধারায় বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমধর্মচিহ্নিত।[১৪] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে মধ্যবিত্ত জীবন চরম অস্তিত্ব সংকটে পতিত হয় । অর্থনৈতিক বিপর্যয়, নৈতিক স্খলন মানবতার জন্য ভয়াবহ পরিণাম বয়ে আনে। তারই বস্তুনিষ্ঠ চিত্র তিনি উপস্থাপন করেছেন সুরজিৎ নন্দী চরিত্রের মাধ্যমে। *নেমেসিস* ছাড়াও নুরুল মোমেন *রূপান্তর* (১৯৪৮), *যদি এমন হতো* (১৯৬১), *নয়াখান্দান* (১৯৬২) ইত্যাদি নাটক লিখেছেন, কিন্তু সেগুলোর কোনোটাই *নেমেসিস*-এর স্বকীয়তা, বিষয়, শিল্পমান অতিক্রম করতে পারেনি।[১৫] স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের নাটক আলোচনায় সিকানদার আবু জাফরের *শুকুন্ত উপাখ্যান* (১৯৬১) এবং *সিরাজ-উদ-দৌলা* (১৯৬৫) নাটক দুটি স্থান করে নেয় যথাক্রমে রূপকের আশ্রয়ে সমকালীন বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ উপস্থাপনের কারণে। *শুকুন্ত উপাখ্যান* নাটকে তিনি সমকালীন জীবন এবং যুদ্ধবিরোধী মানসিকতাকে প্রকাশ করেছেন রূপকের আড়ালে। আর *সিরাজ-উদ-দৌলা* নাটকের মাধ্যমে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাংলার মানুষের শক্তি, সাহস আর দেশপ্রেমকে।[১৬]

শওকত ওসমান পাশ্চাত্য মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সমাজতান্ত্রিক চেতনাশ্রয়ী স্রোতধারার নাট্যকার।[১৭] *তস্কর ও লস্কর* নাটকে তিনি তুলে ধরেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক অবক্ষয় এবং সমকালীন জীবনচেতনা ও যুগযন্ত্রণা।[১৮] পঞ্চাঙ্কের প্রহসন *কাঁকরমণি*তে বৃটিশ আমলের পটভূমিকায় সমাজের ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ বিদ্যমান। এরই

ধারাবাহিকতায় তাঁর অনূদিত *বাগদাদের কবি* (১৯৫৩) নাটকে রূপকের আড়ালে প্রকাশ পেয়েছে সমকালীন সামাজিক অবিচার এবং রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে উচ্চকিত আহ্বান।[১৯]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর নাটকে সফলভাবে প্রয়োগ করেছেন ইউরোপকেন্দ্রিক শৈল্পিক ভাবচেতনা।[২০] গভীর অন্তর্দৃষ্টির আলোকে তিনি তুলে এনেছেন জীবন ও জগতকে। *বহিপীর* (১৯৬০) নাটকে সামন্তসমাজ-উদ্ভূত মূল্যবোধের সঙ্গে ধনবাদী সমাজের রূপান্তরিত মূল্যবোধের দ্বন্দ্বই মূলত উপস্থাপন করেছেন। ইতিহাসের ধারা অনুসারে ধনবাদী সমাজ-উদ্ভূত তুলনামূলক উদারতা, মানবতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবনচর্চা এবং চর্চার প্রতিষ্ঠা যে অমোঘ– সেই সত্য এই নাটকের মূল বক্তব্য।[২১] আবার *তরঙ্গ ভঙ্গ* (১৯৬৪) নাটকে ব্যক্তির অন্তর্লোক যেমনভাবে প্রতিবিম্বিত তেমনি সমাজের বহির্জীবনও সুপরিস্ফুট।[২২] *সুড়ঙ্গ* (১৯৬৪) নাটকে রহস্য-কৌতুকে উপস্থাপন করেছেন কিশোরমনের প্রচ্ছন্ন প্রেমকে।[২৩] *উজানে মৃত্যু* (১৯৬৩) নাটকে নৌকাবাহক, শাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি ও কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি চরিত্রগুলোর সমন্বয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তুলে ধরেছেন মানব জীবনের অন্তর্বাস্তবতাকে। যা মূলত অভিব্যক্তিবাদী চেতনার বহির্প্রকাশ। তিনটি চরিত্রের প্রতীকী-উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে জীবনের হতাশা, মৃত্যুবোধ, নিঃসঙ্গতা, প্রবঞ্চনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন নাট্যকার।[২৪] নৌকাবাহক জীবন সংগ্রামে পরাজিত, ক্লান্ত-শ্রান্ত। এর কোনো পরিবর্তন নেই বলে মৃত্যুই তার প্রতাশা। শাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি শুদ্ধতা ও পবিত্রতার প্রতীক। তার কাছে জীবন অর্থপূর্ণ– সেটাই সে বুঝাতে চায় নৌকাবাহককে। আর কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি ষড়যন্ত্রকারী ও অসত্যের প্রতীক।[২৫]

১৯৫৩ সালে রচিত *কবর* (১৯৫৫) নাটকের মধ্য দিয়ে মুনীর চৌধুরী বাংলা নাটকে নতুন মাত্রা যোগ করেন। বাংলা নাটকের ইতিহাসে সহজ সরল অভিব্যক্তি এবং প্রতিবাদী ভূমিকার জন্য নাটকটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।[২৬] এর আগে ১৯৪৭ ও ১৯৫০ সালে যথাক্রমে তিনি রচনা করেন *মানুষ* এবং *নষ্ট ছেলে*। নাটক দুটিতে তিনি তুলে ধরেছেন বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার বিশ্বস্ত রাজনৈতিক নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন।[২৭] *কবর* বাদ দিলে মুনীর চৌধুরীর সবচেয়ে আলোচিত নাটক *রক্তাক্ত প্রান্তর* (১৯৬২)। এ নাটকে তিনি যুদ্ধবিরোধী চেতনার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সংহতি উদ্ধারের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন (বি. এন. আর)। প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের দিয়ে মুসলিম ঐতিহ্য, ব্যক্তিত্ব ও ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে সাহিত্য রচনা করিয়ে নেয়া এ সংস্থার প্রধান দায়িত্ব ছিল। প্রতিষ্ঠানটির নির্দেশে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ও মুসলিম বাহিনীর বিজয় অবলম্বনে মুনীর চৌধুরী *রক্তাক্ত প্রান্তর* নাটকটি লেখেন।[২৮] তবে বি এন আর-এর উদ্দেশ্য নাট্যকার সফল করেননি। আধুনিক চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যক্তিকে মুখ্য করে তুলেছেন। তাই মুসলিম সম্প্রদায়ের বিজয় নয়, ইব্রাহীম কার্দির মৃত্যু ও জোহরার হৃদয়ের ক্ষরণই নাটকটির কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধবিরোধী, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক চেতনাকেই শিল্পরূপ দিয়েছেন।[২৯] মুনীর চৌধুরী অন্যান্য নাটক– যথা: *চিঠি* (১৯৬৬), *দণ্ড* (১৯৬৬), *দণ্ডধর* (১৯৬৬), *দণ্ডকারণ্য* (১৯৬৬) ইত্যাদি নাটক মূলত কমেডিধর্মী ও কৌতুকাশ্রয়ী। এসব নাটকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বহির্ভূত হাস্যরসাত্মক জীবনকেই তিনি তুলে ধরেছেন। মুনীর চৌধুরী প্রথম দিকের নাটকে সমাজ, রাজনীতি ও প্রতিবাদী চেতনা উপস্থাপন করলেও সেটি আর শেষ পর্যন্ত দেখা যায় না। বলা যায় *কবর* নাটকের পর আর কোনো নাটকে তিনি সমকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উচ্চকিত হননি।

এই সময়ের বাংলাদেশের আরেক গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ। বলা যায়, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশের নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি সমাজসচেতন ছিলেন। সমাজ-রাজনীতি-শোষণ, সমসাময়িক ঘটনার চিত্রণে তিনি নাটকে স্বতন্ত্র অবস্থান দখল করে আছেন।

বিদ্রোহী পদ্মা (১৯৪৮), *দুরন্ত ঢেউ* (১৯৫১), *অগ্নিগিরি* (১৯৫৯) *বিল বাওড়ের ঢেউ* (১৯৬০), *এপার ওপার* (১৯৬২), *অনেক তারার হাতছানি* (১৯৬৫) ইত্যাদি নাটকের মধ্য দিয়ে উপরিক্ত বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়।[৩০] *বিদ্রোহী পদ্মা* নাটকে তিনি তুলে ধরেছেন পদ্মাপারের মানুষের সংগ্রামী জীবন চিত্র। জমিতে জেগে-ওঠা চরকে কেন্দ্র করে জমিদার ও প্রজার দ্বন্দ্বকে নাট্যকার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের দুর্বার প্রতিরোধ এবং পরিশেষে বিজয় অর্জনই নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন।[৩১] একই কথা বলা যায় *বিল বাওড়ের ঢেউ* নাটকেও। গ্রাম বাংলার জেলে সমাজের শোষিত-বঞ্চিত জীবনের খণ্ড-খণ্ড চিত্র এ নাটকে প্রতীয়মান। মহাজনের কাছ থেকে সুদে টাকা নিয়ে তারা জাল-সূতা কেনে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা বলে মহাজন বিল-বাওড় ইজারা নেয়। ফলে জেলেরা গরীর থেকে আরো গরীব আর মহাজন দিনে দিনে আরো ধনী হতে থাকে। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য জেলেরা শেষ পর্যন্ত একতাবদ্ধ হয়। সমবায়ের মাধ্যমে জেলেদের দুঃখের অবসান সম্ভব বলে নাট্যকার মনে করেন।[৩২] *দুরন্ত ঢেউ* নাটকে সমকালীন দেশকাল ও রাজনীতিকে বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এ নাটকে শাসক ও তার তল্পিবাহক কায়েমি স্বার্থবাদী, আত্মঅহংবোধ সম্পন্ন অভিজাত শ্রেণির বিরুদ্ধে জনতার সংগ্রামকে রূপায়িত করেছেন। *এপার ওপার* আসকার ইবনে শাইখের প্রচারধর্মী সামাজিক নাটক। গ্রামীণ জীবন এ নাটকের পটভূমি। এতেও তিনি সমবেত শক্তির মাধ্যমে গ্রামের মানুষের দুঃখের অবসান হওয়া প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।[৩৩] আসকার ইবনে শাইখ সমাজমনস্ক নাট্যকার। নিম্নবর্গের মানুষের সংগ্রামের দিকটি তাঁর অধিকাংশ নাটকে রূপায়িত হয়েছে।[৩৪] ইতিহাস আশ্রিত নাটকের ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। *অনেক তারার হাতছানি* নাটকে তিনি ইতিহাসকে রূপায়িত করেছেন তৎকালের আবহে। পাকিস্থান শাসক গোষ্ঠী এদেশের সাধারণ মানুষের ওপর যে অত্যাচার নিপীড়ন চালায় তার সঙ্গে তিনি মিল খুঁজে পান বৃটিশ শাসনের। ১৮৫৭ সালে ঢাকায় সিপাহীদের সশস্ত্র বিদ্রোহের সঙ্গে ১৯৬২ সালে সংঘটিত এ-দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তিনি এক সূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছেন *অনেক তারার হাতছানি* নাটকে।[৩৫] আবার *অগ্নিগিরি* নাটকে ফকির বিদ্রোহকে বিষয়বস্তু করেছেন। পরাধীন ভারতে ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনামলে কোম্পানি প্রতিনিধি দেবী সিং রংপুর-দিনাজপুরে খাজনা আদায়ের নামে নিরীহ, গরিব প্রজাদের ওপর যে অমানবিক, বীভৎস নির্যাতন শুরু করে তার বিরুদ্ধে ফকির মজনু শাহ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তার নেতৃত্বে এলাকার নিরীহ মানুষ ইংরেজদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়। মূলত এ নাটকে তিনি বিদ্রোহী চেতনাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা নাটকে আসকার ইবনে শাইখ সবচেয়ে প্রতিবাদী নাট্যকার। প্রায়ই নাটকে তিনি তুলে ধরেছেন নিম্নবর্গের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়নকে। সমকালের আর কোনো নাট্যকারের নাটকে বিষয়টি এত প্রবলভাবে দেখা যায় না।

দারিদ্র্যপীড়িত মধ্যবিত্ত জীবন তুলে ধরার ক্ষেত্রে আনিস চৌধুরীর *মানচিত্র* (১৯৬৩) নাটক উল্লেখযোগ্য। নাটকটি সম্পর্কে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন: 'আমরা প্রথম আনিস চৌধুরীর মানচিত্র নাটকে আমাদের বাস্তব মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিফলন খুঁজে পেলাম... সেখানে রয়েছে গ্রাম্য স্কুল শিক্ষকের বেড়ার বাড়ি-ঘর, মঞ্চে আমরা আমাদের পরিচিত সংসার চিত্রগুলো খুঁজে পেলাম, সেই লাউয়ের ডগা, সেই ইলিশ মাছ, আদরের বেড়ালটি, আর মুসলমান সমাজের প্রচলিত মামাতো ভাইবোনের সলজ্জ মধুর প্রণয় দৃশ্য। শুধু তাই নয় ঐ নাটকে আমরা আমাদের অতি পরিচিত স্কুল মাস্টার, তার রুগ্না স্ত্রী আর স্কুলে সেক্রেটারি, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকেও দেখতে পেলাম।... এই প্রথম আমরা মঞ্চে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা ও হতাশার রূপায়ণ দেখতে পেলাম।'[৩৬] তাঁর *এ্যালবাম* (১৯৬৫) নাটকের কাহিনীও গড়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করে।

সাঈদ আহমদ বাংলাদেশের নাটকে বরণীয় হয়েছেন অ্যাবসার্ড ধারার নাটকের পথিকৃত হিসেবে। নিরীক্ষাধর্মী নাটক রচনায় তাঁর বিশিষ্টতা।[৩৭] এ প্রসঙ্গে তাঁর *কালবেলা* (১৯৬২), *মাইলপোস্ট* (১৯৬৫) অগ্রগণ্য। ১৯৬১ সালে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস যে তাণ্ডব লীলা চালায় তারই পটভূমিতে *কালবেলা* নাটক রচিত। তবে বিষয় নয়, এ নাটকে অভিনব হচ্ছে এর উপস্থাপনাকৌশল এবং সংগঠনরীতি।[৩৮] *মাইলপোস্ট* নাটকে তিনি তুলে ধরেছেন মানব জীবনের ক্লান্তি, হতাশা, শূন্যতাকে। আর *তৃষ্ণায়* (১৯৬৯) নাটকে শিয়াল ও কুমিরের লোককাহিনীর আড়ালে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ এবং একই সঙ্গে এই শোষণ থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।[৩৯] এসব নাটক রূপায়ণে তিনি গ্রহণ করেছেন অ্যাবসার্ড ধারার নাট্যকৌশল। বাংলাদেশের নাটকে যা যোগ করে নতুন মাত্রা। এছাড়া এসময় ইব্রাহীম খলিল, আযীমউদ্দীন আহমেদ, জসীমউদদীন প্রমুখরা লোককাহিনী ও রূপকথার নাট্যরূপ সৃষ্টিতে বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে সমকালীন জীবন-চিন্তা এবং সমাজ-প্রবণতার সঙ্গে সেই কাহিনীর আন্তরসম্পর্ক নির্ণয় ও নির্মাণে তারা সার্থকতা অর্জন করতে পারেননি।[৪০]

এটা স্পষ্ট যে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের নাটকে বিষয় ও উপস্থাপনাগত বৈচিত্র্য এবং লেখক ভেদে স্বাতন্ত্র্য থাকলেও একমাত্র আসকার ইবনে শাইখ ব্যতীত আর কেউ নাটকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিম্নবর্গের জীবন, বেঁচে থাকার সংগ্রামকে উপস্থাপন করেননি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এবং পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে নাট্যকারদের মধ্যে সমকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক শোষণের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় ক্রমে তা স্তিমিত হয়ে আসে। নাট্যকাররা এ সময় জনসাধারণের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গৃহীত হলেও সে সময়ে তাদের কর্মকাণ্ড ছিল কৃত্রিম এবং প্রবণতায় তা শহুরে অভিজাত শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিজাত।[৪১] পঞ্চাশের দশকের শুরুতে সামাজিক ন্যায় বিচার ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে নাট্যকাররা উচ্চকিত ছিল, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসনের খড়্গ নেমে এলে তারা তাৎপর্যপূর্ণভাবে নীরব ভূমিকা অবলম্বন করে। এর ফলে আর্থ-সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, ব্যক্তি-গোষ্ঠীস্বার্থের বিপরীতে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টিগত স্বার্থের পক্ষে কথা বলা, এমনকি জনগণের অগোচরে পাকিস্তানী শাসকবর্গ কর্তৃক প্রণীত ইসলামীকরণ নীতি কড়াকড়ি এবং শহুরে অভিজাত শ্রেণির স্বার্থে রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের তীব্রতা ক্রমশ কমতে থাকে।[৪২] বিক্ষুব্ধ সমকালকে পাশ কাটিয়ে তাঁরা আধুনিক ব্যক্তিবাদী চেতনার বহির্প্রকাশকে উপস্থাপন করতে থাকেন নাটকে। মূলত সামরিক শাসনের কারণে মধ্যবিত্ত চেতনাশ্রয়ী এসব নাট্যকাররা শ্রেণিগত অবস্থানের কারণে হলেন সংক্ষুব্ধ এবং সমাজবিমুখ। বাধ্য হলেন আঙ্গিক নিরীক্ষায়, কৌতুকে-রূপকে এবং অনুবাদে।[৪৩]

এ অধ্যায়ে উল্লিখিত নাটকগুলো ছাড়াও স্বাধীনতাপূর্ব কালে বাংলাদেশে প্রগতিশীল ও উদার গণতান্ত্রিক চেতনাসংশ্লিষ্ট আরো অনেক নাটক রচিত হয়েছে। তবে সেগুলো বিষয়গত দিক থেকে ছিল গতানুগতিক। শিল্পমান বিবেচনায়ও তা ততটা সফল ছিল না। সমকালীন জীবনও তাতে অনুপস্থিত ছিল।[৪৪] স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের নাটকেও আমরা উল্লিখিত অনেক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি। তবে আমরা গবেষণার বিষয় অনুসারে নিম্নবর্গের জীবনসংশ্লিষ্ট নাটকগুলোই পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করবো।

তথ্যনির্দেশ:

১. আসকার ইবনে শাইখ, *বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি*, সাত রং প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ ৮৭।
২. সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮,পৃ ৪৬।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৫০।
৬. জামিল আহমেদ, "নাটক ও নাট্যকলা", সিরাজুল ইসলাম (সম্পা): *বাংলাদেশের ইতিহাস*, (তয় খণ্ড) বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০, পৃ ৪৯৯।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯৯।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯৯।
৯. সুকুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪। ও
১০. জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০১।
১১. সুকুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪ ।
১২. জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০১।
১৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, "বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্যসাহিত্যের ধারা", রামেন্দু মজুমদার (সম্পা), *নাট্যপরিক্রমা: চার দশকের বাংলাদেশ*, নবযুগ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ, ৩০৪।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৪।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৪।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৪।
১৭. সুকুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪।
১৯. জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০৩।
২০. প্রাগুক্ত, পৃ ৫০৬।
২১. সুকুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, ২২৭।
২২. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩১।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩১।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩২।
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩১।
২৬. জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০২।
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৫০২।
২৮. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, *মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ ২৪।
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ ২৪।
৩০. রাহমান চৌধুরী, *রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ ৩৩।
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩।
৩২. সুকুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৭।
৩৩. সুকুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৮।
৩৪. রাহমান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫।
৩৫. সুকুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৯)
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৩।
৩৭. রামেন্দু মজুমদার, সম্পা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৬।

৩৮. প্রাগুক্ত, ৩০৬।
৩৯. প্রাগুক্ত, ৩০৬।
৪০. প্রাগুক্ত, ৩০৬।
৪১. জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০২
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ ৫০৪।
৪৩. সুকুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৬।
৪৪. রাহমান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের নাটকে শাহরিক নিম্নবর্গ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নাটকে শাহরিক নিম্নবর্গ

রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে আর্থ-সামাজিক মুক্তির আশা এবং গণতান্ত্রিক চেতনা সঞ্চারিত হয়, অচিরেই তা প্রশ্নবিদ্ধ হয় পড়ে। দেশের আর্থিক অবস্থার ক্রম অবনতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অবশ্যম্ভবী ফলরূপে দেখা দিল গণরোষ। দেশব্যাপী নৈরাশ্য ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়া হলো প্রবল।[১] পুঁজির অসম বণ্টন, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ, নেতৃত্বের নৈতিক অবক্ষয়, দৈশিক প্রেক্ষাপটে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যার ফলে মানুষের যাপিত জীবনে অস্থিরতা, হতাশা, সম্পর্কের পারস্পরিক দূরত্ব বাড়তে থাকে দিনের পর দিন। বৃটিশ ও পাকিস্তান শাসিত বাংলায় যে উপনিবেশিক শাসনকাঠামো ছিল, স্বাধীনতার পরও তার কোনো মূলগত পরিবর্তন ঘটেনি। উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ, উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত, শোষক-শোষিত, বিত্তবান-বিত্তহীন সমাজের বিভাজিত ও বৈষম্যমূলক এই আর্থ-সামাজিক কাঠামোই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শহরেও এই বৈষম্য প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়। দ্রুত নগরায়ণের ফলে শ্রমিক শ্রেণির ঢল নামে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সরকার পাকিস্তানি শিল্পপতিদের ফেলে যাওয়া কারখানা, ব্যাংক বীমা, ব্যাপকভাবে জাতীয়করণ করে।[২] কিন্তু তাতে জাতীয় অর্থনীতির কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেনি। শহরে শ্রমজীবী মানুষের হার বাড়লেও তাদের জীবন যাপন দিনে দিনে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এরপর ব্যক্তি উদ্যোগে শিল্পায়নের সুযোগ সৃষ্টি হলে বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পায়। কাজের আশায় গ্রাম থেকে বহু বেকার শহরে এলেও কাজ পায় না। আবার যারা কাজ পায়, তারা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়। ক্রমে শহরের সামাজিক স্তরবিন্যাসে শোষক-শোষিত রূপটি প্রবলভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ঢাকা শহরে শুধু রিক্‌শানির্ভর জনসংখ্যা শহরের মোট জনসংখ্যার এক ষষ্ঠাংশ।[৩] এর পাশাপাশি পোশাকশিল্প শ্রমিক, যাদের অধিকাংশ নারী; তারাও শহুরে নিম্নবর্গের একটা বড় অংশ। আমাদের গবেষণায় শহরের নিম্নবর্গ বলতে মূলত শ্রমিক শ্রেণির পাশাপাশি ভিক্ষুক, পতিতা, ছোট দোকানদার, রিক্সাচালক, টোকাই প্রভৃতি মানুষকে বোঝানো হয়েছে। এদের জীবন বাংলাদেশের নাটকে কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এ অধ্যায়ে তা বিশ্লেষণ করে দেখব।

'আমি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, বাবা প্রিন্সিপাল থাকার কারণে সব সময় দেখেছি সমস্যা হলে সবাইকে ডেকে একটা মীমাংসা করে দেন। তো সেখান থেকেও পেতে পারি বা মধ্যবিত্ত মন বলে যে, সব কিছুর পর যদি ভালোভাবে থাকা যায় তো সেটাই ভালো। আর ভালো নাটক না হয়ে উঠলে তো আমি কিছু করতে পারবো না। আমি যা পারি সেটাই করি। এর চেয়ে ভালো তো পারি না। কী করবো বলো'[৪]– বক্তব্যটি আবদল্লাহ আল মামুন (১৯৪২-২০০৮) দিয়েছিলেন তাঁর নাটকে সমস্যা দানা বাধার পর নাটকে শেষে যে কোনো ভাবে মিল ঘটানোর তাগিদ কেন?[৫]– এমন প্রশ্নের উত্তরে। এই সরল স্বীকারোক্তি থেকে আবদুল্লাহ আল মামুনের নাটকে মধ্যবিত্ত চেতনার ব্যাপক প্রভাব অনুভূত হয়। সে কারণে তাঁর নাটকে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনের রূপায়ণ ঘটে বাস্তব আর কল্পনার সংমিশ্রণে। আমৃত্যু ঢাকার *থিয়েটার* নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সংগঠনই তাঁর নাট্যচিন্তার প্রথম প্রকাশস্থল। দলটির স্লোগান হলো:

> যে ধরনের নাটকে সমসাময়িক জীবন আছে, জীবনের আধুনিক বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু মধ্যযুগীয় দার্শনিক তত্ত্বের উৎপাত নেই, আমরা সেই ধরনের নাটক প্রযোজনায় আগ্রহী। কেননা আমরা বিশ্বাস করি আমাদের চারপাশের আবহ সবসময়ই নাটকীয় উপাদানে সমৃদ্ধ এবং এদের বাদ দিয়ে যত্র তত্র নাটকের অনুসন্ধান করা অযথা সময় ও শক্তির অপচয়।[৬]

উপর্যুক্ত নাট্য চেতনার কারণে তাঁর নাটকে সমকালীন জাতীয় জীবনের নানা অবক্ষয়, মূল্যবোধের সংকট, চেতনার অবনমনই বেশি ফুটে উঠেছে। চরিত্রের মাধ্যমে তিনি মূলত সময়কে ধরতে চেয়েছেন। এ কারণেই 'সমাজের সুস্থবোধ আর সুনীতির ধ্বংসোন্মুখকালে ব্যক্তির অসহায়ত্ব নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি লিখলেন *সুবচন নির্বাসনে* (১৯৭৪)। জাতীয় দুর্যোগকালে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা টাকার মালিকদের অমানবিকতা প্রত্যক্ষ করে লিখলেন *এখন দুঃসময়* (১৯৭৫)। আবার মোসাহেবদের তোষামেদিতে যখন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙে যাওয়ার উপক্রম তখন সমাজসচেতন দৃষ্টিতে লিখলেন *সেনাপতি* (১৯৮০)। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্দশা ও অবমূল্যায়ন প্রত্যক্ষ করে রচনা করলেন *এখনও ক্রীতদাস* (১৯৮৪), আধুনিক যুগেও নারীর অসহায়ত্ব দেখে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ চিত্তে লিখলেন *কোকিলারা* (১৯৯০), ধর্মান্ধদের ঐক্য ও মৌলবাদী ফতোয়ার মাধ্যমে মানবাধিকার লংঘন কালে এর স্বরূপ উন্মোচন করে রচনা করলেন *মেরাজ ফকিরের মা* (১৯৯৭)।[৭] ফলে তাঁর নাটকে নিম্নবর্গের জীবনের বিস্তৃত ও গভীর বিশ্লেষণাত্মক কোনো উপস্থাপন নেই। যে নিম্নবর্গীয় চরিত্রগুলো তিনি তুলে এনেছেন তা মূলত সময়কে তুলে ধরার প্রয়োজনে।

সুবচন নির্বাসনে তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলোর একটি। এ নাটকে তিনি মূলত তুলে ধরেছেন স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের মূল্যবোধ, নৈতিকতা, মানবিকতা এবং চেতনার অবক্ষয়কে। ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থা সৎ ব্যক্তিকে বিবরবাসী করেছে আর অন্যায়, অবৈধ, অসামাজিক কার্যকলাপে নিমগ্ন বিশেষ শ্রেণি নিজেদের স্বার্থেই তারুণ্যকে ঠেলে দিয়েছে উচ্ছৃঙ্খলতা, ভোগবিলাসিতা ও ক্ষমতা-লালসার পঙ্কিল আবর্তে।[৮] তাই নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র নিম্নমধ্যবিত্ত স্কুলমাস্টার এখন অসহায়, পরনির্ভরশীল। চেতনা ও অস্তিত্বের অসারতা তাকে করছে ক্ষত-বিক্ষত। বিধ্বস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতায় আদর্শসম্পর্কিত বুলি ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। তাই আদর্শবান শিক্ষক হয়ে এখন খন্দকার আসামির কাঠগড়ায়। তিনি তার তিন সন্তানকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা সমকালের প্রেক্ষাপটে প্রশ্নবিদ্ধ। 'সততাই মহৎ গুণ'[৯]– এই শিক্ষা মনে রেখে তার বড় ছেলে খোকন চাকরি খোঁজে। কিন্তু পায় না। দুর্নীতির কাছে তার নৈতিকবোধের পরাজয় হয়। কারণ তার চেয়ে খারাপ ফলাফল নিয়েও শুধু ঘুষ দেয়ার কারণে চাকরিটা পায় তার এক বন্ধু। এই অসততার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আসামি হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় খোকনকে। পরিণতির জন্য সে তার বাবাকে দায়ী করে। শিক্ষকের চেতনাজগৎ ছেলের এই প্রতিক্রিয়ায় হয়ে পড়ে দোদুল্যমান। ঠিক একইভাবে শিক্ষক খন্দকার দোষী সাব্যস্ত হয় ছোট ছেলের কাছেও। কারণ বাবা তাকে শিখিয়েছিল 'লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে'[১০]– কিন্তু এই কথার সত্যতা সে পায়নি। বরং কোনো লেখাপড়া না শিখে গুণ্ডামি-মাস্তানি করে সে গাড়ি কিনেছে। সে দেখেছে তার বড় ভাই সৎ পথে থেকে কিছু করতে পারেনি। তাই অসৎ পথে যেতে তার কোনো অনুশোচনা বোধ হয়নি। ছোট ছেলের পর মেয়েও খন্দকারের শিক্ষাকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করে। তিনি মেয়েকে শিখিয়েছিলেন, 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'[১১]– বাবার এই শিক্ষানুযায়ী মেয়ে বানু চেষ্টা করেছিল স্বামীর ঘরকে সুখময় করে তুলতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। স্বামীর বসের লাম্পট্য সে মেনে নিতে পারেনি। এ কারণে স্বামীর ঘর করা হয় না তার। পিতার দেয়া শিক্ষাই তার সংসার-জীবনের বড় বাধা হয়ে উঠেছে। মাস্টারের এতদিনের শিক্ষা-দীক্ষা, আদর্শ আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। আসামির কাঠগড়ায় মাস্টার তাই তার অসহায় উক্তি:

'তবে কি সত্যি মানবতার মাথা হেঁট হবার সময় এসেছে? যদি তাই হয়, তবে সত্যিই আমি অপরাধী। সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে শাস্তি আমার পাওনা, যেমন শাস্তি পেয়েছে আমার খোকন। আমার নিষ্ঠাকে বুকে বেঁধে সে এগিয়ে গিয়েছিল প্রতিবাদের দুঃসাহসে। তার সততার দাম কেউ দেয়নি। সততাই অপরাধ। সততা গুণ নয়– সততা নির্বুদ্ধিতা। আসলে ওরা কেউতো অপমানিত হয়নি। অপমানিত হয়েছি আমি। অপমানিত হয়েছে সেই সত্য যে সত্য যুগের পর যুগ পেরিয়ে আমার এই বুকে বাসা বেঁধেছিল। প্রমাণ হয়েছে আমি অপরাধী। আমাকে শাস্তি দিন। প্রমাণ করুন সত্য অচল হয়ে গেছে। জ্বলছে শুধু মিথ্যার হুতাশন। আমি অপরাধী, দয়া করে আমাকে আপনারা শাস্তি দিন।'[১২]

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো কিছুই পুঁজিকেন্দ্রিক ক্ষমতার বাইরে নয়। সততা, নীতি, ধর্ম, আইন ইত্যাদি বিষয়ের রূপ-রীতি কী হবে, প্রচলিত নীতিবোধ টিকে থাকবে কি-না বা তার কতটুকু পরিবর্তন হওয়া দরকার– সব কিছু নির্ধারিত হয় উৎপাদন কাঠামোর কেন্দ্রে থাকা ব্যক্তি-গোষ্ঠীর দ্বারা।

পুঁজিবাদী সমাজে শিক্ষক আদর্শ, ন্যায়, নীতি, সততার প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত বা সম্মানিত হলেও প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ কোনো ক্ষমতা তাদের নেই। উৎপাদনের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও প্রত্যক্ষ নয়। তাই অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিবেচনায় শিক্ষকের অবস্থান নিম্নবর্গের কাতারেই। *সুবচন নির্বাসনে* নাটকের শিক্ষক সততা, নীতি, আদর্শ সম্পর্কে যে ধারণা লালন করে, সন্তানদের যাপিত জীবনের পরাজয়, নৈতিক স্খলনের মাধ্যমে সমাজে তার অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। নীতির যে শক্তি তার মধ্যে ছিল, আর্থ-সামাজিক বঞ্চনার মধ্যে যা তাকে মানসিক শান্তি এনে দিত, সেই নীতিবোধের পরাজয়ের কারণে শেষ পর্যন্ত সব দিক থেকে সে হয়ে পড়ে অসহায়। অর্থনীতি, সমাজনীতি সব কিছু থেকে সে হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতা এবং অসহায়ত্বের কারণে শেষ পর্যন্ত মাস্টার হয়ে ওঠে নিম্নবর্গের প্রতিনিধি। তবে নাটকটিতে নাট্যকার নীতিবোধের বিপর্যয়ের কোনো কারণ তুলে ধরেননি। শুধু ভঙ্গুর সমাজব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক অধঃপতনই উপস্থাপন করেছেন। ফলে তৎকালীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর কোনো স্পষ্ট প্রকাশ আমরা এ নাটকে পাই না।

এখনও ক্রীতদাস আবদুল্লাহ আল মামুনের রচিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাটক বলে অনেকে বিবেচনা করেন।[১৩] প্রচ্ছন্ন কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে হলেও *এখনও ক্রীতদাস* নাটকের প্রেক্ষাপট মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক। তবে যুদ্ধোত্তরকালে শাহরিক জীবনের নিরঙ্কুশ বন্ধ্যাত্ব ও ক্ষয়ই এই নাটকের মর্মমূলে গ্রথিত। নগরে বাস করে নগর সভ্যতার বৈষম্য ও পীড়নে যারা পেষিত, সেই সব অন্ত্যজ বস্তিবাসীদের জীবনোৎসারিত চিৎকার ধ্বনিত হয়েছে এই নাটকে।[১৪] বস্তিবাসী মানুষের প্রতিদিনকার জীবনযাপনের মধ্যে ধ্বনিত হয় যে আনন্দ-বেদনা, গ্লানি, ক্লান্তি, প্রতিবাদ, হিংসা, ঈর্ষা, জৈবিকচেতনা– নাট্যকার তা-ই তুলে ধরেছেন *এখনও ক্রীতদাস* নাটকে। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র বাক্কা মিয়া। পঙ্গু এক ট্রাক ড্রাইভার সে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে গিয়ে সে তার পা হারায়। আজ সে স্ত্রী কান্দুনির রোজগারের ওপর নির্ভরশীল। মেয়ে মর্জিনাও তার কোনো কথা শোনে না। গলাচিপা বস্তির ঘরে শুয়ে সে চারপাশ দেখে আর রাগে ফুসতে থাকে। কিন্তু তার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। কান্দুনি ও মর্জিনা দু'জনই নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। অভাবের সংসারে খাবার নিয়ে তাদের প্রায় প্রতিদিন ঝগড়া:

বাক্কা: আমি খামু কী? (কান্দুনি দাঁড়ায়)
বাক্কা: আমি কি আল্লার ফেরেশতা? আমার ক্ষিদামিদা কিচ্ছু নাই? (কান্দুনি কথা বলে না। ট্রেন আসার শব্দ পাওয়া যায়)
বাক্কা: ডগমগাইয়া বর লুকের বাড়িতে বান্দিগিরি করতে চললি। তর সোয়ামী হারামী খাইবো কী? বুইরা আঙুল?
কান্দুনি: বাক্কা মিয়া–[১৫]

এভাবে প্রতিদিন ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মর্জিনা ও কান্দুনির সাথে বাক্কা মিয়ার ঝগড়া বাধে। এর কোনো প্রতিকার সে করতে পারে না। বস্তির কুজোবুড়োও তাকে উপদেশ দেয় পঙ্গুত্বের কারণে: অই বাক্কা আইজকা কেমুন আছস? এত কইরা কইলাম তরে লাল গাইয়ের সাদা বাছুরের চোনার লগে নিশিন্দা পাতার রস মিলাইয়া নাভীর চাইরমুরা ঘষতে থাক। কবে বালা হইয়া যাইতি?[১৬]

এই উপদেশও তার পছন্দ নয়। আবার কেউ যদি তাকে সাহায্যও করতে চায় সেটাকে বাক্কা মিয়া ঠাট্টা মনে করে–

হারেস: তুমাগো এই গলাচিপা বস্তির পোলাপানগুলা এমন পোংটা হইছে– আর হালার পেরা জন্মাইতাছেও রাইতদিন সমানে– এর থনে আমাগো হারগিলা বস্তি বহুত ইস্ট্যানডার– আরে, তুমার আবার কি হইলো? বাঁশ ধইরা খারাইয়া রইছো ক্যান? হইছে কি? ও বাক্কা মিয়া– (এগিয়ে এসে বাক্কা মিয়াকে ধরে নিয়ে যেতে যেতে) খামাখা মিয়া কষ্ট করতাছো– আহ আহ– যেই কাম তুমি পারবা না– কোনদিন যা তোমারে দিয়া সম্ভাব হইবো না– আরে মিয়া এক ঠ্যাং লইয়া কেউ খারাইতে পারে?
বাক্কা: সর সর তুই– (হারেস বাক্কাকে ছাড়ে না) শুয়োর, তুই আমারে টিটকারী মারস? ছাইরা দে আমারে। তর আদর সোহাগের গুষ্টি কিলাই আমি। ঠ্যাং আমার একখানই থাউক আর চোদ্দখানই থাউক হেতে তর কি?[১৭]

বাক্কা মিয়া ও পারিপার্শ্বিক চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট প্রতীয়মান বস্তির মানুষের জীবন। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে লাগে বড় ঝগড়া। তবে তারা একেবারে হীনমন্য, স্বার্থপর নয়। অভাব আছে বলে তাদের লোভের মাত্রা বেশি। অন্যের সুখে তারা চোখ টাটায়। এই পরশ্রীকাতরতা ও দুর্বলতার কারণে গলাচিপা বস্তির সাধারণ, সহায়-সম্বলহীন মানুষের কাছ থেকে নিজ স্বার্থ হাসিলের সুযোগ খোঁজে আবদুল মালেক কাজী। বিশেষ করে অসহায় নারীদের কাজের লোভ দেখিয়ে সে পাচার করে, দেহ ব্যবসা করায়। তারই লালসার শিকার হয় মর্জিনা: 'বাবাগো আমারে নষ্ট কইরা দিছে। আমি পইচা গেছি। আমি বেহুশ হইয়া গেছিলাম। অরা আমারে'[১৮]– মেয়ের এই আর্তনাদ সে শুধু শোনে অসহায়ের মতো। শারীরিক অক্ষমতার কারণে সে প্রতিবাদটুকুও করতে পারে না। বস্তির মানুষের অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে কাজী তার ক্ষমতা বিস্তার করে চলে। সামান্য কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে বস্তির মেয়েদের সে ব্যবহার করে। প্রশাসন এ ব্যাপারে থাকে নিশ্চুপ। বরং তারা কাজীর মতো ক্ষমতাবানদের অন্যায়, অত্যাচার, অবৈধ ব্যবসা– এসব দেখেও না দেখার ভান করে। ফলে ফাইটারের মতো ছিন্নমূল মানুষরাই মারা যায়। আর বাক্কার মতো নিম্নবর্গের মানুষ, যারা কাজীর মতো মানুষের বিচার চেয়ে পায় না, কিংবা চোখের সামনের অন্যায়, অত্যাচার দেখেও কিছু করতে পারে না, তারা মূলত আবেগ এবং ক্ষোভের মাধ্যমেই নিজেকে প্রকাশ করে। জীবন-বঞ্চনা থেকে বাস্তবে রেহাই পায় না বলে অনেক সময় কল্পনায় তারা এর থেকে পরিত্রাণ চায়, কিংবা শত্রুর ওপর প্রতিশোধ নেয়। তাই শেষ দৃশ্যে সে কাজীর লোকজনের হাতে গুলি খেয়ে বাক্কা মিয়া মারা যাবার পরেও নাট্যকার আবদুল্লাহ আল মামুন নাটকটির যবনিকা না টেনে কাল্পনিক আবহে বাক্কার প্রতিশোধস্পৃহাকে তুলে ধরেন। তাই মৃত্যুর পরেও সুস্থ মানুষের মতো সে ঝাপিয়ে পড়ে শত্রুর ওপর। এতদিনের শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে মেতে ওঠে:

বারে বারে কি আমি গুল্লি খামুরে? একবার ঠ্যাং-এ একবার সিনায়? একবার মারবো খানেরা, একবার মারবি তরা? এই খেইল কবে ফুরাইবো? কবে?[১৯]

এই বক্তব্যে মধ্য দিয়ে নাট্যকার স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। দেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও বাংলাদেশের আশি ভাগ মানুষ জীবন-জীবিকার প্রশ্নে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পায়নি।[২০] বেঁচে থাকার তাগিদে তারা এই বন্দিত্ব বয়ে বেড়াচ্ছে দিনের পর দিন।

নিম্নবর্গ যাপিত জীবনের বঞ্চনা থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তার প্রতিবাদ কোনো সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ নয়, অধিকাংশই তাৎক্ষণিক আবেগের। ফলে জীবনযাপন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানোর জন্য যে সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা দরকার, তা তারা করতে পারে না। তাই তাদের প্রতিবাদও হয় ক্ষণস্থায়ী এবং জীবন যাপনের তাগিদে উচ্চবর্গের ওপর নির্ভরশীল বলে তারা শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও দীর্ঘসময় একজোট হয়ে প্রতিবাদ করে যেতে পারে না। ব্যক্তিকভাবে সবাই ক্ষুব্ধ হলেও শুধু সুদীর্ঘ ঐক্যের অভাবে তা প্রচলিত সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন আনতে পারে না। নাট্যকার তাই মনে করেন:

আসলে কাজী আবদুল মালেকেরা কখনো মরে না। মরে বাক্কা মিয়ারা। তবু এই বাক্কা মিয়ারাই ভবিষ্যতের হাতে একটা স্বপ্ন রেখে যায়। স্বপ্ন প্রতিরোধের, প্রতিশোধের এবং চূড়ান্ত প্রতিবিধানের।[২১]

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নাট্যকার যেন প্রচ্ছন্নভাবে শোষকশক্তির অবিনশ্বরতাকেই স্বীকার করে নেন। নিম্নবর্গের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ কিংবা প্রতিশোধ তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর নাটকে কোনো পরিণতি আনতে পারে না। শুধু সংশয়ী সংগ্রাম, আংশিক প্রতিরোধ কিংবা খণ্ডিত প্রতিশোধকে হয়তো গ্রাহ্য করে, কিন্তু চূড়ান্ত প্রতিবিধান কখনোই নয়।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

মূলত ১৯৭৫-পরবর্তী বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের অবমূল্যায়নের যে ধারা শুরু হয়েছিল বাক্কা মিয়ার উচ্চারণ-আচরণ তার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ। তবে মুক্তিযুদ্ধ এর কেন্দ্রীয় বিষয় নয়। দারিদ্র্যকেই এই নাটকের কেন্দ্রবিন্দু করতে চেয়েছেন নাট্যকার।[২৩] বাক্কা মিয়াকে কেন্দ্র করে তাই উঠে আসে বস্তিবাসীর নানা কথকতা, কান্দুনি, হারেসের মতো মানুষের জীবন। তবে তাদের জীবনে কোনো ক্ষোভ নেই। তারা জীবিকা এবং জৈবিকতার তাগিদকেই শুধু বোঝে। বাক্কার মতো তাদের ভেতরে কোনো টানা-পড়েন নেই। সব কিছুকেই তারা যেন মেনে নিয়েছে।

সেনাপতি নাটকটি মধ্যবিত্ত জীবনাদর্শ এবং নীতিকে উপজীব্য করে রচিত হলেও এর মধ্যে পাওয়া যায় শ্রমজীবী মানুষের চিত্র। শ্রমজীবী মানুষের একতাবদ্ধ হওয়াটাকে মালিকপক্ষ সব সময় ভয় পায়। তাই তারা শোষিতগোষ্ঠীর ঐক্যে ভাঙন ধরানোর সুযোগ খোঁজে। এই কাজের জন্য মালিকদের পছন্দ সুবিধাবাদী বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি। কারণ এই শ্রেণির কাছে ব্যক্তিগত সুখ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র আব্বাস আলী তালুকদার। শিক্ষিত হওয়ার পরেও এতদিন সবার কাছে সে অপমানিত হয়েছে শুধু অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে। এই অপমান সে মেনে নিতে পারেনি। তাই ভোল পাল্টিয়ে সে হয়ে ওঠে মালিকের বিশ্বস্ত কর্মচারী। কথা দিয়ে সে মালিকের মন জয় করে। আবার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য লোভ দেখিয়ে খুব সহজে শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ তৈরিতেও সে সক্ষম হয়। কূটকৌশলের কারণে শ্রমিকদের একপক্ষ তার অনুগত হয়ে মালিকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করা থেকে নিজেদের বিরত রাখতে চায়। ফলে শ্রমিকরা দুপক্ষ হয়ে যায়:

সিধুভাই: আমি জোড় হাত করে বলছি সর্দারকে তোমরা অমান্য করো না ভুল বুঝো না। একবার যদি নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির শুরু হয় তাহলে তোমাদের সর্বনাশ হবে।[২৪]

কিন্তু একথা শ্রমিকদরে মধ্যে একতা ফিরিয়ে আনতে পারে না। কারণ একপক্ষ তাদের দাবিদাওয়া মালিকের কাছে বলতে চায় আর সে সুযোগ করে দেয় তালুকদার। চেতনাগতভাবে শ্রমিকরা পরনির্ভরশীল। বিশেষ করে তালুকদারের মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে তারা নিজেদের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করে। একারণে তারা তালুকদারের 'সিস্টেম, এস্টাবলিশমেন্ট'[২৫] শব্দ দুটো না বুঝলেও তার কথায় হাততালি দেয়। শ্রমিকদের মধ্যে বিভক্তির সুফল বরাবরই ভোগ করে মালিকপক্ষ। বিভেদ বাড়িয়ে দিতে তারা নানা কৌশল অবলম্বন করে। *সেনাপতি* নাটকে রহিম মোল্লাকে হত্যা করে তালুকদার গোলযোগ বাড়িয়ে দেয়। লাশ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে তৈরি হয় বিভেদ ও সিদ্ধান্তহীনতা। তারা বুঝতে পারে না লাশ নিয়ে তারা কী করবে কিংবা কে বা কারা রহিম মোল্লাকে হত্যা করেছে, লাশ কোথায় রেখেছে? এই বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে দেখা দেয় অনৈক্য:

২য় শ্রমিক: সব ফালাইয়া এই একখান প্রশ্ন বারে বারে ওঠে ক্যান? রহিম মোল্লা মরছে সেই জন্য আমরা দুঃখিত।
সর্দার: দুঃখিত। মারছ তো তোমরাই।
২য় শ্রমিক: না। রহিম মোল্লার মাথা ফাটাইছ তুমি সর্দার।
সর্দার: আমি?
২য় শ্রমিক: হ। আমি নিজের চক্ষে দেখছি। প্রমাণ করতে পারবা ডাণ্ডাবাজিটা তুমি করো নাই। সুতরাং এই সব পুরানা গীত আর গাইও না। তা ছাড়া মানুষ মরলে যা যা করতে হয় রহিম মোল্লার জন্য সব করা হইছে। সে তরিকা মতো কাফন পাইছে, জানাযাও পাইছে–
সিধু ভাই: (সোজা ২য় শ্রমিককে চেপে ধরে) জানলে কী করে? তুমি কী করে জানলে কাফন পেয়েছে? জানাযা পেয়েছে? কালার বাপ– বদমাইসি ছাড়ো। রহিম মোল্লার আত্মার দোহাই, মিথ্যের বেসাতি এবার ছাড়ো। তুমি ভাল করেই জানো রহিম মোল্লা কাফন পায়নি। জানাযা পায়নি।
২য় শ্রমিক: আমি জানি পাইছে। তালুকদার সাব পরিষ্কার বলছে কাফন হইবো, দোয়া দরুদ হইবো–[২৬]

অবশেষে তালুকদারের স্ত্রী মেরির কাছে শ্রমিকরা আসল ঘটনা জানতে পারে। শেষে আক্রমণ করে প্রতিশোধ নেয় তাদের সঙ্গে প্রতারণার।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজের সর্বত্রই রয়েছে ক্ষমতার চর্চা। কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন মাত্রায় রয়েছে তার বিস্তার। মালিক তথা শাসকপক্ষের কাছাকাছি অবস্থান করে বলে তালুকদার শ্রমিকদের তুলনায় বেশি ক্ষমতাবান। ঠিক একইভাবে তালুকদারের সঙ্গে ২য় শ্রমিকের সম্পর্ক আছে বলে অন্যান্য সাধারণ শ্রমিকের ওপর তার কর্তৃত্ব একটু বেশি। তবে উচ্চবর্গের সঙ্গে সম্পর্কই ক্ষমতা নির্ধারণ করে না। নিম্নবর্গের পারস্পরিক একাত্মবোধও উচ্চবর্গীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উৎসাহিত করে। সর্দারের ক্ষমতা মূলত তাদের ভেতরকার একতার কারণে। অন্য শ্রমিকরা তার নির্দেশ মেনে চলে। ফলে শ্রমিক হয়েও সর্দার অন্যদের তুলনায় উচ্চবর্গ। উচ্চবর্গের প্রতি নিম্নবর্গ আস্থাশীল। যাপিত জীবনে বঞ্চিত হতে হতে তাদের চেতনাজগতে বিচারের মানসিকতার চেয়ে মেনে নেয়ার মানসিকতাই সহজে গড়ে ওঠে। এই কারণেই তারা ২য় শ্রমিক ও সর্দার কারো কথাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। আবার তালুকদারের স্ত্রী মেরি ওই দুজনের চেয়ে ক্ষমতাকাঠামোর কাছাকাছি বলে তার কথাই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয় শ্রমিকদের কাছে। তালুকদারের স্ত্রী হওয়ার কারণে তার কথাকে শ্রমিকরা অবিশ্বাস করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে মধ্যবিত্তের প্রতারণা, শঠতা পরাজিত হয়। নাটকটির পরিণতি সূত্রে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, নিম্নবর্গের ঐক্যবোধে সহজে চিড় ধরানো যায়। কিন্তু একবার যখন কোনোভাবে সত্যটি তাদের কাছে উন্মোচিত কিংবা আবিষ্কৃত হয়, তখন তারা প্রতিবাদ করতে, প্রতিশোধ নিতে মেতে ওঠে। সহজে তখন তাদের বিরত করা যায় না।

মেহেরজান আরেকবার নাটকটি রচিত এবং প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৯৭ সালে। নাটকটি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের বাংলাদেশে ধর্মীয় লেবাসধারীদের স্বরূপকে উন্মোচন করে। রাজাকার-আলবদরদের বিরুদ্ধে ছিন্নমূল, শ্রমজীবী ও নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতিরোধ এই নাটকের মূল উপজীব্য।

অতি নিম্নমানের হোটেল সোনার বাংলার মালিক হরমুজ আলী। এই হোটেলেই রাঁধুনীর কাজ করে মেহেরজান, তার মেয়ে পরী এবং পুত্রবধূ সখিনা। এখানে প্রায় রাতে খেতে আসে ট্রাকড্রাইভার শিকদার। সেই সূত্রে তাদের পারস্পরিক পরিচয়। নিম্নবর্গ জ্ঞাতিগোষ্ঠী, স্বশ্রেণির মানুষের প্রতি বিশ্বাসী ও সহমর্মী। মূলত শ্রেণিগত ঐক্যের কারণে তারা ব্যক্তিগত আবেগগুলো ভাগাভাগি করে নিতে চায় কিংবা না চাইলেও অন্যের মধ্যে তা আলোড়িত হয়। ফলে শিকদারের বাড়ির কথা মনে পড়লে মেহেরজানেরও নিজেদের বাড়ির কথা মনে পড়ে:

মেহেরজান: বাড়ি থাকলেই বাড়ির কথা মনে পড়ে। আমাগো মতন পোড়া কপাল নিকি? রাইতের আন্দারে নদীতে বাড়ি-ঘর ভাইঙ্গা গেল। লগালগ এক রাতের মইদ্যে দ্যাশেই পরদেশি হইয়া গেলাম। য্যান কোনো কালেই আমরা এই দ্যাশের মানুষ আছিলাম না। কেউ কোনো জিগাইল না কোহান থিকা আইলাম।[২৭]

বর্তমান জীবনের করুণ দশাই তাদের জীবনে এই হাহাকার নিয়ে আসে। নিম্নবর্গকে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। জীবনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণে প্রতি মুহূর্তে তাদের মেনে নিতে হয় দাসত্ব। ইচ্ছার অপূর্ণতায় নিজস্ব চাওয়া বলে তাদের কিছু থাকে না। তাদের একমাত্র আনন্দ অতীতের সুখময় মুহূর্তগুলো মনে করা। তাই একজন আনন্দ-স্মৃতিগুলো বলা শুরু করলে অন্যরাও বলতে আরম্ভ করে। ফলে সখিনাও মনে করে তার বাপের বাড়ির কথা, বিশেষ করে বরুই খাওয়া। কারণ আর্থ-সামাজিক কারণে তার জীবনে আহামরি কোনো ঘটনা নেই বলে বরুই খাওয়ার মতো ঘটনাই হয়ে ওঠে আনন্দের। সখিনার বাপদাদার ভিটা লুট করে নিয়েছে জোতদাররা। কিন্তু সেই কষ্ট সে মনে করতে চায় না। আনন্দের স্মৃতিচারণেই যেন তার সুখ:

মেহেরজান: অহনতরি বাপের বাড়ির সাধ তুমার যায় নাই বউ? কবেই তো বাড়ি-ঘর জমি জিরাত জোতদারগো প্যাটে ঢুইক্যা গেছে। কিন্তু কি করতে পেরেছে তোমার বাবা ভাইয়ে? উল্টা জোতদারেরা ত্যাগো মাডার কেসে ফাসাইয়া যাবজ্জীবন জ্যালে হান্দাইয়া দিছে। খবরদার বরইয়ের লিগা তুমি শিকদার ভাইরে দিগদারি করবা না।

শিকদার: আরে করবার দ্যান ভাবি। এট্টু দিকদারি করুক না। আমার কাছে সোয়ামিও ফেরত চায় নাই, বাপ ভাইও ফেরত চায় নাই। চাইছে সামান্য কয়ডা বরই।
মেহেরজান: ভুইলা যাইতে হইব। ব্যাবাক ভুলতে হইব। এই দ্যাশের বরইয়ের উপরে কাকপক্ষীরও যে আবদার আছে, আমাগো সেইডাও নাই। অচিন এক দ্যাশের বাসিন্দা হইয়া গেছি আমরা।[২৮]

নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় তারা। একটি দেশের অধিবাসী হিসেবে তার যে দাবি থাকতে পারে, এই বিষয়টা নিম্নবর্গের চেতনায় বেশির ভাগ সময় থাকে অনুপস্থিত এবং যাপিত জীবনের প্রতারণা, বঞ্চনা থেকে তারা শুধু প্রতিবাদী বা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে না। কখনো কখনো হতাশা, অসহায়ত্ব, পরনির্ভরশীলতা, নিয়তির কাছেও আত্মসমর্পণ করে। মেহেরজান তাই সব কিছু যেন স্বাভাবিকভাবেই মেনে নেয়। হরমুজ আলী হোটেলমালিক হলেও চেতনা এবং স্বার্থসংশ্লিষ্টতার কারণে নিম্নবর্গের সঙ্গেই তার বেশি সখ্য। নিজের অবস্থান ধরে রাখতে পারে বলে কর্মচারীরা মেহেরজানকেই বেশি মান্য করে। মেহেরজানও সবকিছু ঠিকভাবে চালিয়ে নিতে পারে। তাই দ্বিতীয় দৃশ্যে হাজী সাহেবের আগমনে হরমুজ আলী খাবার ঠিক মতো ব্যবস্থা করতে না পারার কারণে যত ভীত হয় মেহেরজান ততটাই ঠাণ্ডা মাথায় তার কাজের কথা জিজ্ঞাসা করে। নিম্নবর্গের মানুষ ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত বলে আধ্যাত্মিক, পারলৌকিক কথা বলে তাদের খুব সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাই হাজী ইসলামী কথা বলে তার আধিপত্য বজায় রাখার জন্য। অর্থনৈতিক সচ্ছলতাও উচ্চবর্গের ক্ষমতার বড় একটি কারণ। এর প্রভাবে হাজী এলাকায় ক্ষমতা বিস্তার করে। হরমুজের হোটেল থেকে সে অবৈধ কার্যক্রম চালাতে চায়। হরমুজ আলীও হোটেল ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় হাজীর কথা মেনে চলে। এমন কি সখিনা এবং পরীর ওপর হাজীর চেলাদের অপমানও সে সহ্য করে। কিন্তু শিকদার মেনে নিতে পারে না। হাজীর ট্রাক ড্রাইভার হলেও সে মালিকের কোনো অন্যায় সহ্য করে না। বরং প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে:

হরমুজ: খাইতে পার। কিন্তু জানে বাঁচবা না। জানে বাঁচতে হইলে হাজী সাবের টেরাকে খ্যাপ মারতে হবে। হাজী সাবের পাও চাটতে হবে। হোটেল চালাইতে হবে। হোটেলে রান্দাবারা করতে হবে। রান্দাঘরে হাজীর গুণ্ডাদের ঢুকতে দিতে হবে।
শিকদার: না। হবে না। আমি, এই শিকদার, হাজীর গোলাম না। গোলামি করি না আমি। হাজীর টেরাক চালাই। পাও চাটি না। তুমি হরমুজ আলী, তুমিও হাজীর গোলাম না। তুমি নিজের গাইটের পয়সা দিয়া হোটেল চালাও। তোমার হোটেলে মেহেরজান বিবি তার মাইয়া আর পোলার বউ নিয়া রাতদিন খাটে। তারাও কারও গোলাম না। যার যার মতন সবেতেই স্বাধীন।[২৯]

এর মধ্য দিয়ে নিজের ক্ষমতা ও শক্তির ওপর শিকদারের আস্থা প্রকাশ পায়। সে একেবারে অসহায় নয়। আর কোনো পথ না পেলে সে প্রতিহিংসামূলক পথ অবলম্বনের পক্ষপাতী। এর পাশাপাশি পুত্রবধূকে বাঁচানোর জন্য মেহেরজানের আকুতিও শিকদারকে প্রতিবাদী করে তোলে–

আমাগো বাঁইচা থাকার ব্যবস্থা আমাগোই করতে হবে। আর যদি মরতে হয় তাইলে মাইরা মরুম।[৩০]

শিকদারের এই বক্তব্য সবার মধ্যে জাগিয়ে তোলে সাহসী চেতনা। ফলে মাস্তানরা রান্নাঘরে বসে তাদের কাজ সমাধা করতে চাইলে বাধা দেয় মেহেরজান। কিন্তু হাজীর হুকুম বলে আবার না করতে পারে না হোটেলমালিক হরমুজ। তবে শিকদার ছেড়ে কথা বলে না। গুণ্ডাদের তর্কের একপর্যায়ে হাজী উপস্থিত হলে সে ঘটনাক্রমে ঘুষি মেরে হাজীর দাঁত উপড়ে ফেলে। এই মারের প্রতিশোধ এবং স্বার্থ উদ্ধারের জন্য গুণ্ডারা হরমুজ আলীকে ধরে নিয়ে যায়। হোটেলের কর্মচারীরা বাধা দিতে পারে না। কিন্তু শিকদার নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে চলে আসে হরমুজের খোঁজ জানতে। বন্ধুর প্রতি আত্মিক টান এবং কর্তব্যবোধের বিবেকীয় সমর্থনের কারণে সে হাজীর তথা উচ্চবর্গের ভয়কে উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়।

হাজী হরমুজরে ধইরা নিয়া গেছে খবরডা পাইয়া আর থাকতে পারলাম না।[৩১]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীরা নিম্নবর্গের কাতারে। আর্থ-সামাজিক কারণে তাদের অসহায়ত্ব বেশি। এই বৈষম্যমূলক কাঠামো সমাজে দৃশ্যমান বলে মাস্তানরা অবলীলায় সখিনা এবং পরীকে ভোগ করার বাসনা ব্যক্ত করে। কিন্তু পারে না মেহেরজানের প্রতিরোধের কারণে:

শ্যাষ কইরা ফালামু। কেউরে আর বাঁচতে দিমু না। খেল পাইছো জানোয়ারের বাচ্চারা? মাইয়া মানুষ পাইলেই– আর না। এইবার শ্যাষ কইরা দিমু এই খেইল।[৩২]

মেহেরজানের এই শক্তির পেছনে নাট্যকার তুলে ধরেছেন আল্লার ওপর তার আস্থাকে। নিম্নবর্গ অলৌকিক শক্তির প্রতি আস্থাশীল। বর্তমান জীবনের দুর্দশা, বঞ্চনার জন্য সে নিজের ভাগ্যকে দোষ দেয়, খোদার কাছে ফরিয়াদ জানায়। স্রষ্টার ওপর অকৃত্রিম, সরল এই বিশ্বাস সংকটের চরম মুহূর্তে তাদের যেমন শক্তিমান করে তেমনি বিপরীতভাবে বলা যায়– এটি তাদের ব্যক্তিক, মানবিক শক্তির প্রতি আস্থাহীন করে তোলে। নিজের শক্তিকে তারা মনে করে আল্লার অপার করুণা। এই বিশ্বাসের কারণে সামষ্টিকভাবে তারা অনেক কিছু অর্জনে সমর্থ হলেও ব্যক্তিকভাবে কোনো ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করতে কতটুকু সাহস ও যোগ্যতা রাখে তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

দুর্বৃত্ত কর্তৃক অপমানের পর মেহেরজান সখিনাকে তার প্রেমিক হিটলারের সঙ্গে চলে যেতে দেয়। কারণ সে বুঝতে পারে হাজীর পোষা মাস্তানদের হাত থেকে সখিনাকে রক্ষা করা তার একার পক্ষে সম্ভব না। হিটলার যাওয়ার আগে একটা স্টেনগান দিয়ে যায় মেহেরজানকে। এই স্টেনগান মেহেরজানের সাহসকে আরো বাড়িয়ে দেয়। ঘটনাক্রমে হাজী জানতে পারে শিকদার মুক্তিযোদ্ধা। তাই বর্তমান ও অতীত উভয়কালের অপমানের বদলা নিতে মিথ্যার পথ বেছে নেয় সে। ঢাকায় থেকেও সে হরমুজসহ বাকিদের বলে ঈদের দিন সে গ্রামে যাচ্ছে। হাজী নেই ভেবে শিকদার চলে আসে হোটেলে এবং ধরা পড়ে হাজীর হাতে। কিন্তু সে দমে যায় না। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও শিকদার যে সাহস দেখায় তা অবিশ্বাস্য:

আর কত আনন্দ করবা? কইরা লও। যত রকমের আনন্দ আছে দুনিয়ায়, কইরা লও। তোমাগো মতন রাক্ষসেরা এক যুদ্ধে খতম হয় না। যুদ্ধ আরো লাগব। আবার যুদ্ধ হবে। এইবার যুদ্ধ হবে সব রকম বর্ণচোরাদের লগে। টুপি পিন্দা, তসবি টিপা, মসজিদের ভিতরে দল পাকাইয়া আর বেশি দূর যাইতে পারবা না। দ্যাশের মানুষ বহুত সইয্য করছে। আর করবে না। যার যার পায়জামা লুঙ্গি চাইপা ধইরা রেডি হইয়া যাও। যদি পলাইয়া বাঁচতে পার। আমারে জ'ব দিবা? দাও। এই তোমার শেষ আনন্দ। খতম তারাবি। সাইরা ফেল।[৩৩]

১৯৭৫ সাল পরবর্তী বাংলাদেশে সুবিধাবাদী রাজনীতি এবং রাজনীতিকদের ব্যাপকভাবে উত্থান ঘটতে থাকে। ইসলামের নামে স্বাধীনতার শত্রুদের দেশের নাগরিকত্ব ও রাজনৈতিক অধিকার দেয়া হয়। পরাজিত রাজাকার আলবদররা আবার দেশে তাদের অপচেষ্টার বিস্তার ঘটাতে থাকে। অর্থনৈতিকভাবে খুব শক্তিশালী হওয়ায় রাজনীতিতেও তাদের ব্যাপক ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। তাদের কাছে সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধারা হয়ে পড়ে অসহায়। এই সত্যটি নাট্যকার *মেহেরজান আরেকবার* নাটকে তুলে ধরেছেন একটা তাৎক্ষণিক আবহে। উল্লেখ্য যে, ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে জোরালো অবস্থান থাকার কারণে তাদের কাছে শিকদারের মতো মুক্তিযোদ্ধারা নিম্নবর্গই হয়ে পড়ে। তবে তার মৃত্যু মেহেরজানকে যেন সমাধানের পথ দেখিয়ে যায়। তাই হাজী ও তার গুণ্ডারা পরীর সম্মান নষ্ট করতে চাইলে মেহেরজান আর একমহূর্তও দেরি না করে। স্টেনগান দিয়ে ঝাঝরা করে দেয় হাজীর বুক। প্রতিশোধ নেয় এতদিনের অপমানের। নিজের জীবনের বিনিময়ে রক্ষা করে পরীর সম্মান। নিম্নবর্গের নারী হলেও আত্মসম্মানবোধ তাদের প্রবল। ফলে মেয়ের সম্মান বাঁচানোর জন্য মৃত্যুকেই সে গ্রহণ করে। নাটকগুলো থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, নাট্যকার নাটকের শেষে প্রায়ই

ক্ষেত্রে এক অতিমানবীয় ও অসংলগ্ন দৃশ্যের অবতারণা করেন। এক্ষেত্রে রামেন্দু মজুমদারের বক্তব্য: 'আবদুল্লাহ আল-মামুনের সংলাপ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও সুসংগঠিত। সোশাল স্যাটায়ার রচনায় তাঁর পারদর্শিতা স্বীকৃত। কিন্তু তাঁর অনেক নাটকেরই সমাপ্তি বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।'[৩৪] নিম্নবর্গের জীবন উপস্থাপনে কোনো সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ তাঁর নাটকে লক্ষ করা যায় না। সমাজের উপরি তল থেকে তিনি যা দেখেছেন তাই রূপায়ণ করেছেন। এই বক্তব্যে সত্যতা প্রকাশ পায় *কোকিলারা* নাটকেও।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় নারী মাত্রই নানা শৃঙ্খলে আবদ্ধ। দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থান, সামাজিক বিধি-নিষেধ, ধর্মীয় বিধান– নারীকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে। বাংলাদেশের আইনে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের কথা উল্লেখ থাকলেও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সমাজের প্রত্যেকটি স্তর ও শ্রেণিতেই নারীর হীন-দুর্বল-শোষিত-পেষিত-নির্যাতিত-অপচিত অবস্থা এখনো বিদ্যমান।[৩৫] স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার সংগঠনে নারীর এই বিপর্যস্ত অবস্থানটিকে স্পষ্ট রূপ দিতে অবদুল্লাহ আল মামুন রচনা করেছেন *কোকিলারা* নাটক। বলা যায়, এটি বাংলাদেশের নারীদের জীবনালেখ্য। তিনটি নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার বাংলাদেশের প্রতিটি নারীর জীবনচিত্র তুলে ধরেন। তবে তিন জনের শ্রেণিগত অবস্থান আলাদা। প্রথম যে নারী চরিত্র আমরা এ নাটকে পাই, সে নিম্নবিত্তের। ধনীলোকের বাড়িকে কাজ করে সে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু সেটি বাধাহীন হয় না আনু নামের এক রাজনৈতিক কর্মীর জৈবিক লালসার কারণে। বিয়ে করার লোভ দেখিয়ে সে কোকিলাকে ভোগ করে। বিষয়টি জানাজানি হলে বাড়ির গৃহকর্ত্রী কোকিলাকেই দোষারোপ করে তাড়িয়ে দেয়। শেষে বাধ্য হয়ে ট্রেনের চাকার তলে পড়ে আত্মহত্যা করে কোকিলা। দ্বিতীয় কোকিলা এক সহজ-সরল গৃহবধূ। শিক্ষিত কিন্তু স্বামীর প্রতি তার অতি ভক্তি। পচিশ বছর দাম্পত্য জীবনের পর সে জানতে পারে স্বামীর ব্যভিচারের কথা। এই চরিত্রহীনতার ধিক্কার জানালে স্বামী অপমান করে। শেষ পর্যন্ত সেও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আর তৃতীয় কোকিলা উচ্চবিত্ত, আইনজীবী। সে এই দুই কোকিলার আত্মহত্যার বিচার চেয়ে প্রত্যাখাত হয়। তবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর সার্বিক অবস্থার উপস্থাপন যেন নাট্যকারের উদ্দেশ্য নয়, পুরুষের ভোগোপকরণ হিসেবে নারীর ব্যবহৃত ও শোষিত হবার ক্ষেত্রটিই কেবল উন্মোচন করেছেন নাট্যকার।[৩৬] এ কারণে নাটকটির তিন নারী চরিত্রের কেউই স্পষ্টভাবে প্রতিবাদী নয়। তাই তাদের কেউ আল্লার কাছে বিচার চেয়ে আত্মহত্যা করে, কিংবা বিচার না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। এর মধ্য দিয়ে নারীর চেতনাজগতের নিম্নবর্গত্ব উন্মোচিত হয়। চরিত্রগুলো যেন মেনে নিয়েছে তার আসলে করার কিছু নেই। দৈব কোনো শক্তি এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে পারে অথবা সেই শক্তিটি আসলে পুরুষের পক্ষে। প্রথম কোকিলার সংলাপ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়:

> প্রথম কোকিলা: আমি যদি কোনো নেক বাপ-মা'র নেক পয়দা হই, আমি যদি কোনো সতী হই, তাইলে সে আমারে ধোকা দিয়া বাঁচতে পারব না। আল্লার দুনিয়ায় আল্লায় এত পাপ সইব না।[৩৭]
>
> অথবা
>
> তদ্দিনি আমার বোঝা সারা এই দুনিয়াটা আল্লায় বানাইছে কেবল পুরুষ গো লিগা। এই হানে মাইয়া মানুষের বাঁচনের কোনো পথ নাই।[৩৮]

এই সত্য সে জেনেছে তার বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। সমাজের কাছে সে বিচার পাবে না জেনেই তাকে আল্লার কাছে বিচার চাইতে হয়। দ্বিতীয় কোকিলা পুরো মধ্যবিত্ত। প্রথম প্রথম প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত সে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে মেনে নিয়ে সতীনের সঙ্গে অবহেলিতভাবে হলেও থাকতে চায়। এর কারণ মধ্যবিত্তীয় মর্যাদাবোধ এবং স্বামী-পরিত্যক্তা নারীর প্রতি সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণ। ফলে স্বামী তাকে তাড়িয়ে দিতে চাইলেও সব কিছু মিটমাট করে সে স্বামীর কাছে থাকতে চায়। অর্থাৎ সমাজবাস্তবতার কারণে তাকে স্বামীর অন্যায় মেনে নিতেই হয়। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

তাতেও যখন স্বামী নামক পুরুষটির মন গলে না তখন আত্মহত্যা ছাড়া কোকিলার আর কিছু করার থাকে না। কিছু করতে না পারাটাই তাকে নিম্নবর্গ করে তোলে। ঠিক একই অবস্থা তৃতীয় কোকিলার ক্ষেত্রেও। পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় লৈঙ্গিক পরিচয়ই ক্ষমতার নির্ধারক। ফলে উচ্চবিত্ত হলেও তার কথা কেউ শোনে না। কিংবা অপরাধী প্রমাণিত হবার পরও পুরুষ হওয়ার কারণে কোনো সাজা হয় না তার। এই বাস্তবতায় তৃতীয় কোকিলা অসহায় হয়ে পড়ে। এই অসহায়ত্বের কারণে তার সমস্ত ক্ষোভ, ঘৃণা পুরুষের দিকে বর্ষিত হলেও নাট্যকার নির্যাতিত হবার দুটো ঘটনার সঙ্গে পুরুষের শক্তিশালী সহযোগী হিসেবে নারীর অবস্থান তুলে ধরেছেন।[৩৯] উল্লেখ্য, প্রথম কোকিলার পরিণতিতে গৃহকর্ত্রীর রোষ এবং দ্বিতীয় কোকিলার পরিণতিতে রীতার প্রবঞ্চনা অন্যতম ভূমিকা রাখে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুঁজিই নিয়ন্ত্রণ করে সব কিছু। নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠাও তার বাইরে নয়। বিষয়টি কোথাও উপস্থাপিত হয়নি নাটকটিতে। নাট্যকারের শ্রেণিবিভাজনের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত লৈঙ্গিক। ফলে নারীর বহুপ্রান্তিক শোষিত হওয়ার চিত্র এ নাটকে নেই। তবে নাটকটির একটি সার্থকতা এখানে যে, দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থায় নারীমাত্রই যে শ্রেণি-অবস্থানেরই হোক না কেন, পুরুষতান্ত্রিক চেতনাবলয় থেকে সে মুক্ত এবং স্বাধীন নয়। বরং স্পষ্টভাবেই অবরুদ্ধ, প্রতারিত এবং বঞ্চিত।[৪০]

বাংলাদেশের নাট্যধারায় মামুনুর রশীদ (১৯৪৮-) বহুলাংশে ভিন্নমাত্রিকতায় বিশেষায়িত। কেবল সমতল ভূমি নয়; নদী, সাগর, পাহাড়, বনাঞ্চল ঘেরা গোটা বাংলার মানচিত্রে বসবাসরত বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত এবং সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামই তাঁর নাটকের বিষয়-আশয়। কেবল স্বদেশই বলি কেন; সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, বিশ্বায়ন, তৃতীয় বিশ্বের অবস্থানও তাঁর নাট্যবিষয়ের অন্তর্গত হয়ে যায়।[৪১] মার্কসবাদকে আদর্শ ও জীবনদর্শন হিসেবে গ্রহণ করার ফলে তাঁর নাটকে শ্রেণিবিভাজিত সমাজের প্রতিচ্ছবিই উঠে আসে বেশি। স্পষ্ট হয় ক্ষমতার সূত্রে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের সম্পর্কের রূপরেখা। বাংলাদেশের বেশির ভাগ নাট্যকার কোনো না কোনো নাট্যদলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকেন এবং ঐ দলের আদর্শটি তিনি তার নাটকে কিংবা তাঁর আদর্শটি ঐ দলের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তিনি তুলে ধরেন। একথা বিদিত যে, মামুনুর রশীদ নাট্যজীবনের শুরু থেকেই *আরণ্যক* নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত। বলা যায়, তাঁর মাধ্যমেই দলটি বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে স্বতন্ত্র জায়গা পাকাপোক্ত করতে পেরেছে। তাই মামুনুর রশীদের নাটককে ব্যাখ্যা করতে হলে *আরণ্যক* নাট্যদলের প্রতিষ্ঠার কারণ উল্লেখ করতে হয়:

> বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বল্পকাল পরেই যুদ্ধপ্রত্যাগত একদল মধ্যবিত্ত তরুণ যুদ্ধের অভিঘাতজাত নতুন চেতনাকে ধারণ করে *আরণ্যক* প্রতিষ্ঠা করে। দেশের কৃষক-শ্রমিকের মতো তাদেরও প্রত্যাশা ছিল এই মুক্তিযুদ্ধের পরিণতিতে ঘটবে সত্যিকার বিপ্লব; যার ফলে ভূমির পুনর্বণ্টন হবে, সামন্তবাদী কাঠামো পরিবর্তিত হবে এবং দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে দেশেরই জনগণ। কিন্তু যখন তারা দেখলো তাদের প্রত্যাশা প্রত্যাশাতেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে, গ্রামীণ সমাজকাঠামোর পরিবর্তন হয়নি, দেশের অর্থনীতি বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণে রয়ে গেছে এবং স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করে একচেটিয়া মুনাফা লুটেছে সংখ্যালঘু মুৎসুদ্দীরা তখন তারা কিছু একটা কিছু করতে চাইলেন। তাদের এই রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মাধ্যম হিসেবে তারা বেছে নিলেন নাটককে।[৪২]

বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, *আরণ্যক* মূলত নাটকের মধ্য দিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং জনগণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। মামুনুর রশীদের নাটকেও এই বক্তব্যের প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি রাজনীতি-সচেতন, সমাজ-সচেতন এবং শ্রেণি-সচেতন নাট্যকার।[৪৩] স্বাভাবিকভাবেই তাই তাঁর নাটকে নিম্নবর্গের সংগ্রামী জীবনই উপস্থাপিত হয়। উচ্চবর্গের শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে সংগ্রাম এবং বিপ্লবের কোনো বিকল্প নেই। এই চেতনাটি তাঁর নাটকে ধ্বনিত হয় বার বার। মামুনুর রশীদের নাটক সম্পর্কে নাট্যসমালোচক বিশ্বজিৎ ঘোষের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: 'মানুষের শ্রেণি সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাসকে নাট্যরূপ দেয়াই

মামুনুর রশীদের নাটক সমূহের কেন্দ্রীয় বিষয়। শোষিত, বঞ্চিত মানুষকে অধিকার সচেতন ও প্রতিবাদী হয়ে উঠতে তাঁর নাটক পালন করেছে বলিষ্ঠ ভূমিকা।'[৪৪] তাঁর নাটকে আমরা এক দিকে দেখি উচ্চবিত্ত তথা শাসকগোষ্ঠীকে, বিপরীতে শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত নিম্নবর্গের মানুষকে।

শ্রেণিবিভক্ত সমাজে উচ্চবর্গ সব সময় চেষ্টা করে তাদের দ্বারা পরিচালিত এবং প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে। এর মধ্য দিয়ে তারা বিলাসী ও সুবিধাবাদী জীবনের প্রবহমানতা ধরে রাখতে চায়। কিন্তু নিম্নবর্গের মানুষ বেঁচে থাকার অনিবার্য তাগিদে উচ্চবর্গের সেই আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করে; কখনো শাসনব্যবস্থার ভিত কাঁপিয়ে দেয়। মামুনুর রশীদের নাটকে বিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান। শহরবাসী বিচিত্র পেশার মানুষের রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর নাটকে। তাদের বেশির ভাগই নিম্নবর্গের। এক্ষেত্রে নাট্যকারের বক্তব্য হলো:

> অনুন্নত বিশ্বে দারিদ্র পীড়িত দেশের অধিকাংশ মানুষ শুধু এই প্রিয় জীবনটাকে বাঁচাবার তাগিদেই এক মানবেতর জীবন-যাপন করে; প্রতি মুহূর্তে নিজের জীবনকে ধিক্কার দেয় কিন্তু মৃত্যুর মুহূর্তে সে বাঁচবার জন্যে আকূল চেষ্টা করে হয়তো বা এই আশায় যে পরবর্তী মুহূর্তটিতে হয়তো সে জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদ পাবে। শুধু জীবনের তাগিদেই বেঁচে থাকা অধিকাংশ মানুষ যে এই অবস্থাকে মেনে নিচ্ছে না, তারাও জীবন দিতে চায় মহান আদর্শের জন্য; এবং যা সম্ভব শুধু মাত্র তাদের ঐক্যের মাধ্যমেই, সেই সমভাবনা প্রতিফলিত করার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হচ্ছে *ওরা কদম আলী* (১৯৭৯)।[৪৫]

শহরের ছিন্নমূল মানুষের জীবনের রূপায়ণ *ওরা কদম আলী*। এই নাটকের মাধ্যমেই মামুনুর রশীদ বাংলাদেশের নাট্যজগতে সফলভাবে প্রবেশ করেন। *পশ্চিমের সিঁড়ি* (১৯৭২) ও *গন্ধর্ব নগরী* (১৯৭৪) আগে রচিত হলেও মূলত *ওরা কদম আলী* নাটকের মাধ্যমেই মামুনুর রশীদ তাঁর নাট্যসত্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। বিষয় ও বক্তব্যের বলিষ্ঠতার কারণে নাট্যাঙ্গনে নাটকটি ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়। এই নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় নাট্যকারের বলেন: *ওরা কদম আলী* নাটকে আমাদের শোষণমূলক সমাজের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। প্রতিক্রিয়াশীলদের বিশাল সাহিত্য কর্মের বিরুদ্ধে *ওরা কদম আলী* বিষয়বস্তুগত কারণেই জনগণের ব্যাপক সমর্থনে ধন্য হয়েছে। এর সবটুকু প্রাপ্তিই খেটে খাওয়া এদেশের মানুষের।[৪৬]

তবে খেটে খাওয়া সব শ্রেণির মানুষের কথা এ নাটকে উঠে আসেনি। কাহিনী গড়ে উঠেছে রাজধানীর লঞ্চঘাটকে কেন্দ্র করে। এর চরিত্রগুলো নিম্নবর্গ, পতিত, ছিন্নমূল শ্রেণি থেকে গৃহীত। নাট্যকারের বক্তব্য: 'ওরা কদম আলী নাটকে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের একটি অতি সাধারণ চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছি যেখানে বোবা কদম আলী, নায়েব আলী ব্যাপারী, তাজু, সর্দার, রাবেয়া, চা-ওয়ালা, বইওয়ালা, এরা কতগুলো সামাজিক সম্পর্ক, বিভিন্ন ধরনের দ্বান্দ্বিক অবস্থান তাদের সমাজে। বোবা কদম আলীর লড়াই আপাতদৃষ্টিতে শিশু তাজুকে নিয়ে হলেও তা আসলে এই সমাজের একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত চেহারা– যে যুদ্ধ ক্রমাগত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।'[৪৭] বোঝাই যায়, নাট্যকার শ্রেণিবিভাজিত সমাজের দু'প্রান্তের মানুষকে হাজির করতে চেয়েছেন এই নাটকে।

সদরঘাটে আশ্রয় নেয়া উদ্বাস্তু, নিম্নবর্গ এবং ক্ষমতা বিস্তারে সচেষ্ট একদল মানুষের ঘটনাসূত্রে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়েই এই নাটকের কাহিনী। এই ঘাটেই থাকে আলীমুদ্দি, রাবেয়া, কদম আলীসহ নিম্নবর্গের আরো মানুষ। এখানেই তারা নানা কাজকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে। একদিন সকালে সেখানে পদ্মার পারের সাপের চর থেকে আসে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান তাজু। স্ত্রী দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের যন্ত্রণায় প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে দেখে স্বামী রিক্সা আনতে গিয়ে আর ফিরে আসে না। স্ত্রী গর্ভযন্ত্রণায় কাতরাতে থাকলে ঘাটবাসী রাবেয়া কালাচানের মায়ের ঘরে তাকে নিয়ে যায়। কিন্তু নবজাতক এবং মা– কাউকে তারা বাঁচাতে পারে না। এতিম হয়ে যায় তাজু। তাকে কেন্দ্র করেই কাহিনী পরিণতির দিকে যায়। সদর ঘাটে আশ্রয়-নেয়া বেশির ভাগ মানুষই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে

আগত। বেঁচে থাকার তাগিদে তারা হয়েছে ছিন্নমূল। প্রতিদিনের জীবন-বঞ্চনায় তারা জর্জরিত। তবু তাদের চেতনা থেকে সহকারিতা ও সাহায্যপরায়ণতার বাসনা পুরোপুরি লোপ পায় না। তাই সদ্য অনাথ হওয়া তাজুকে তারা, বিশেষ করে বোবা কদম আলী ও রাবেয়া আদর-যত্ন দিয়ে বাবা-মায়ের স্মৃতি ভোলাতে চায়। এক সময় তাজু তার বাবা-মায়ের কথা ভুলেই যায়। অনাথ ছেলেটিকে নিজের কাজে লাগানোর জন্য তৎপর হয়ে ওঠে নায়েব ব্যাপারী– ঘাটের ইজারাদার, লঞ্চ ও হোটেলের মালিক। অনাথ শিশুদের খুব কম মজুরিতে হোটেলের কাজে ব্যবহার করা যায়। তাই তাজুকে কেড়ে নিয়ে তার কাজে লাগানোর মানসে নানা ছল ধরে। কিন্তু বোবা কদম ও রাবেয়ার জন্য তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত নায়েব ব্যাপারী শক্তি প্রয়োগ করে। ঘাটের ডাক নিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে চুক্তির চেয়েও বেশি পয়সা আদায় করে সে। ঘাটের ছিন্নমূল মানুষগুলো, বিশেষত সর্দার আনিস এবং আলিমুদ্দিকে নিজের দলে ভেড়াতে চায় নায়েব। স্বার্থের বিবেচনায় ছিন্নমূল ওই মানুষগুলো তার কথা মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারে নায়েবের জোচ্চুরি-প্রতারণা, তখন তারাই জোট বাধে নায়েবের বিরুদ্ধে। নিম্নবর্গ প্রয়োজনে যে কোনো সময় যে জ্বলে উঠতে পারে এটি তার সাক্ষর বহন করে।

নায়েব এখানে আধিপত্যবাদী, উচ্চবর্গ। কিন্তু স্বার্থের জন্য নিম্নবর্গের সঙ্গে মিশতে তার বাধে না। তাই ফুটপাতের চায়ের দোকানে বসে চা-অলা, বই বিক্রেতা-হকার, ছিন্নমূল নারী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির মানুষের সঙ্গে আড্ডা দেয়, নানান গল্পগুজব করে। সামান্য সুযোগ ও কূটবুদ্ধির কারণে নায়েব আলী ওই সব মানুষের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হতে পেরেছে। বোবা কদম আলীকে নায়েব সহ্য করতে পারে না। কারণ তার জন্যই সে তাজুকে নিয়ে যেতে পারছে না। তাই সুযোগ বুঝে নায়েব বোবা কদমের ব্যবসার সম্বল হাড়ি-পাতিল নিয়ে যায়। কদমও একগুঁয়ে। এই কাজের প্রতিশোধ হিসেবে সে নায়েবের হিসাবের খাতা নিয়ে আসে। হাড়ি-পাতিল ফিরিয়ে না দিলে কদম সেই খাতা পুড়িয়ে ফেলতে চায়। শেষ পর্যন্ত নায়েব তার কৃতকর্মের জন্য কদমের কাছে মাফ চেয়ে খাতা উদ্ধার করে। আবার সারেং মজুরি চাওয়ায় নানারকম অভিযোগ তুলে তাকে বেতন না দিয়ে মারধর করে তাড়িয়ে দেয় নায়েব। কিছু করতে না পেরে সে ঘাটের ছিন্নমূল মানুষকে তার দুঃখের কথা বলে। ফলে নায়েব সারেং ও কদমের প্রতি হিংস্রাত্মক হয়ে ওঠে। আবদুল্লাহ, মনিরুদ্দি এবং সর্দারকে সে নির্দেশ দেয় সারেং এবং কদমকে মারার জন্য। এক রাতে রাবেয়া তাজুকে একা রেখে কদমকে খুঁজতে গেলে আবদুল্লাহ তাজুকে তুলে নিয়ে যায়। আর ব্যাপারী তার এত দিনের অচরিতার্থ কামনা পূরণের জন্য রাবেয়ার কাছে আসে:

নায়েব আলী: কতক্ষণ পর তো নিজেরেও খুঁইজা পাবি না।
রাবেয়া: কি কন ব্যাপারি সাব?
নায়েব আলী: ল–
রাবেয়া: কই যামু?
নায়েব আলী: ঘাটে নাও বান্দা আছে, ল।
রাবেয়া: না।
নায়েব আলী: ব্যাপারি অত কাঁচা কাম করে না। তর ভাতার কদম আলী নাই– তোর লাং সর্দার মাল খাইয়া বেহুঁশ অইয়া রইছে। ল–[৪৮]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় নারী মাত্রই নিম্নবর্গ।[৪৯] কারণ ক্ষমতাসূত্রে সে পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে। আবার অর্থনৈতিক দুর্বলতাও তাকে আরো বেশি নিম্নবর্গ করে তোলে। রাবেয়া নারী এবং শোষিত। এ কারণে নায়েব তাকে সহজলভ্যই মনে করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাবেয়ার প্রতিরোধে হার মানতে হয় নায়েবকে। দা দিয়ে ব্যাপারির কান কেটে দেয় রাবেয়া। রাবেয়ার ওপর এই অপমান ছিন্নমূল মানুষকে একতাবদ্ধ করে। এমন কি সর্দারও, যে নায়েবের কথা মতোই এতদিন কাজ করেছে, সে-ও নায়েবের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়। রাবেয়ার প্রতিরোধ তাকেও সাহসী করে তোলে:

সর্দার: তর হাতে রক্ত ক্যান? কার রক্ত?
রাবেয়া: ব্যাপারির?
সর্দার: ব্যাপারির?
রাবেয়া: হ। ব্যাপারি আইছিল আমারে লইয়া যাইতে, আমি–
সর্দার: ইজ্জত বাঁচাইছস? সাবাস।[৫০]

রাবেয়াকে অপমান করার কারণে নায়েবের ওপর সর্দার প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়। তাই সারেঙের সহযোগিতায় তাজুর অপহরণকারী নায়েবের অর্থভোগী আবদুল্লাহকে ধরে। শাস্তি দেয় নিজের ইচ্ছে মতো:

সর্দার: তরে আমি খুন কইরা নদীতে ভাসাইয়া দিমু। বেঈমান। মনে নাই এই ঘাটে প্রথম যহন আইছিলি। তিনদিন না খাইয়া রাস্তায় পইড়া আছিলি। কোন বাপ তরে বাঁচাইছে– কেডা তরে নম্বর লইয়া দিছিলো? ভুইলা গেছস, না? ক অহনও– এই এই পোলা কার? তর আমার, আমাগো মতো মাইনষের পোলা– যার মা নাই, বাপ কোনহানে কেউ জানে না। আইজ তরে আমি খুন করুমই। ওই আমার কিরিচ লইয়া আয়।
আবদুল্লাহ: কইতাছি, কইতাছি। ব্যাপারি নিতে কইছিলো।
সর্দার: ব্যাপারি নিতে কইছিলো, শূয়র–
(সর্দার আবদুল্লাহকে মাটিতে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে চেপে ধরে। কদম আলী বাধা দেয় এবং বোঝায় মারতে যখন হবে তখন ওকে মেরে কি লাভ, মারতে হবে ব্যাপারিকে।)[৫১]

রাবেয়ার প্রতিরোধ এবং বোবা কদমের উপলব্ধি তাদের কাছে একটি উন্মোচিত করে– তাদের আসল শত্রু ব্যাপারি। তাই তারা ব্যাপারির বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়। নিম্নবর্গের আন্দোলন, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ বেশির ভাগ সময় কোনো সচেতন পন্থা অবলম্বন করে অগ্রসর হয় না। তাৎক্ষণিক আবেগ এবং স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্য দিয়ে তারা জমায়েতে সংগঠিত হয়। এজন্য খুব দ্রুত তারা একজোট হতে পারলেও শেষ পর্যন্ত তা তাদের জন্য কোনো দীর্ঘমেয়াদী সুফল নিয়ে আসে না। এর কারণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বৈষম্য-বঞ্চনামূলক কাঠামোর উৎসটি তাদের কাছে অজ্ঞাত। চোখের সামনে যাকে দেখছে তাকেই তারা মনে করছে আসল শত্রু। কিন্তু যে সামাজিক কাঠামোর কারণে ঐ ব্যক্তি তাদের শোষণ-নিপীড়ন করছে, তার কোনো খোঁজ তারা রাখতে পারে না। ফলে প্রতিরোধ কিংবা প্রতিশোধ ক্ষমতার ক্ষুদ্র স্তরে শুধু সাময়িক অভিঘাতই হানতে পারে।

ঘাটের নিম্নবর্গের মানুষের একতাবদ্ধ হওয়ার ঘটনার পরে তাজুর হারিয়ে যাওয়া বাবা ফিরে আসে। তার এতদিন নিরুদ্দেশ থাকার কারণ সম্পর্কে বলে:

কই আর যামুরে ভাই। একটা রিকশার লাইগা ট্র্যাফিক সাবের হাতে-পায়ে পর্যন্ত ধরলাম, তবুও দিলো না। হের পর তার বিনা হুকুমে জোর কইরা একটা রিকশা আনবার গেলাম। ট্র্যাফিক পুলিশ রিকশাআলারে বাইরাইল। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। রাগের মাথায় হেরেও মাইরা বইলাম। হের পর চার পাঁচজন পুলিশ বন্দুক দিয়া দিলো দাবাড়। হেগো হাত থিকা বাঁচনের লাইগা দৌড় দিলাম। একটা ট্রাক আইয়্যা পড়লো আমার উপর। হের পরে কিছু মনে নাই।[৫২]

এখানে নিম্নবর্গের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবিশ্বাস্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় শহর হয়ে ওঠে সব কিছুর কেন্দ্র। ফলে গ্রামের মানুষ শহর ও তার অধিবাসীর তুলনায় নিজেকে ছোট মনে করে। আবার পুলিশ বা প্রশাসন সম্পর্কে তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি কাজ করে। কিন্তু তাজুর বাবার মধ্যে তা দেখা যায় না। শহুরে পুলিশের হাত-পায়ে ধরাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হলেও একজন অচেনা রিক্সাওয়ালাকে মার দেয়ার প্রতিবাদে গ্রাম থেকে সদ্য আগত তাজুর বাবার পুলিশের প্রতি সহিংস হয়ে ওঠা গ্রামীণ নিম্নবর্গের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বেমানান। নাট্যকার এখানে প্রতিবাদকেই মুখ্য করে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু চরিত্রের সমাজবাস্তবতাকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্বকে অস্বীকার করে গেছেন। ফলে তাজুর বাবার প্রতিবাদ আরোপিত হয়ে ওঠে।

তাজুকে নিয়ে তার বাবা চলে যায়। ফলে এতদিন তাজুকে নিয়ে মেতে থাকা ঘাটের গরীব, নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যে শূন্যতা বোধের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে কদম সহ্য করতে পারে না। তাকে সান্ত্বনা দেয় সর্দার:

ওই, ওই কদম কান্দস ক্যান, কান্দস ক্যান? হাস, প্রাণ খুইলা হাসি দে। তাজু চইলা গেছে– হের কাম হে কইরা গেছে। বছরের পর বছর এই ঘাটে আমরা কি করছি– কাম করছি? পয়সা কামাইছি– আর রাইত ভইরা মদ খাইছি। নিজেরা নিজেগো চিনতে পারি নাই। বুঝতে পারি নাই, কেডা আমাগো আপন, কেডা আমাগো পর। তাজু আমাগো চিনাইয়া দিয়া গেছে, বুঝাইয়া দিয়া গেছে। আইজ থিকা এই ঘাটে আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেইলা কাম করুম আর আমাগো ইজ্জতের উপর হামলা আইলে জান দিয়া রুখুম।[৫৩]

তাজুর চলে যাওয়া লঞ্চঘাটের ছিন্নমূল মানুষকে জীবনোপলব্ধির মুখোমুখি দাঁড় করায়। রাবেয়ার অপমান তাদের একতাবদ্ধ করেছিল আর তাজুর চলে যাওয়া তাদের অধিকার সচেতন করে তোলে। ঘাটে এতদিনের অত্যাচার অবিচার মুখ বুজে সহ্য করলেও স্নেহ ভালোবাসা থেকে তাদের মধ্যে জেগে ওঠে প্রতিবাদী চেতনা। ফলে পুলিশ ঘাটে কদম আলীকে খুঁজতে আসলে নিম্নবর্গের সবাই বলে 'আমি কদম আলী'।[৫৪] বোবা কদম তখন আর ব্যক্তি থাকে না। সে হয়ে ওঠে ঘাটের এতদিনের শোষিত, নির্যাতিত মানুষের প্রতিবাদের ভাষা। প্রতিবাদের ভাষা এক। কোনো একক ব্যক্তির মাধ্যমে প্রথমে তা শুরু হয়। পরে তা সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এতদিন নিজেদের ওপর অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে তারা। কিন্তু স্নেহের ধনের ওপর কোনো আঘাত তারা মেনে নেয়নি। এই যে অকৃত্রিম ভালোবাসা, নিম্নবর্গের মধ্যে তা অপ্রতুল নয়। পারস্পরিক সম্পর্কের নানা সঙ্কট থাকলেও স্নেহ-মমতার স্বার্থে তারা একতাবদ্ধ হতে দ্বিধাবোধ করে না। প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সবাই হয়ে ওঠে কদম আলী।

ওরা আছে বলেই(১৯৮১) নাটকটি *ওরা কদম আলী'র* মতোই। এর কাহিনী কমলাপুর রেল স্টেশনের ভাসমান মানুষকে কেন্দ্র করে সংঘটিত। নাট্যকার বলেছেন, '*ওরা আছে বলেই* নাটকে ছিন্নমূল ও ব্যাপক সংগ্রামী মানুষদের সাথে আমলাতন্ত্রের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।'[৫৫]
এ নাটকে আমলাতন্ত্র ও ক্ষমতাসূত্রে উচ্চবর্গের প্রতিনিধি স্টেশনমাস্টার, সেনিটারি ইনস্পেক্টর, পয়েন্টসম্যান, সেনিটারি কর্মচারী হাসেম। স্টেশনে থাকা বাকি সবাই ছিন্নমূল জনগোষ্ঠী। নিম্নবর্গের প্রতিনিধি তারা। আমলাতন্ত্রের সঙ্গে ভাসমান মানুষের দ্বন্দ্বের শুরু হয় রেলওয়ে এক কর্মকর্তার আগমন উপলক্ষে তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করার ঘটনার মধ্য দিয়ে। রেলওয়ে কর্মকর্তাকে তোষামোদ করার জন্য রেলওয়ের সেনিটারি ইন্সপেক্টর ক্ষমতা দেখায় কাওছার, আজি, কালা, গংগারামদের মতো উদ্বাস্তু মানুষের ওপর কর্তৃত্ব ফলিয়ে। ক্ষমতার শক্তি প্রকাশে সে আনন্দ লাভ করে। এজন্য নিম্নবর্গ অনেক সময় তার কাছে মানুষ বলে বিবেচিত হয় না। তাই গংগারাম হঠাৎ গান গাইলে বলে:
এই শূয়োরের বাচ্চা গান গাস! কুত্তা কোথাকার! হারামি, লাথি দিয়ে তোর–[৫৬]

এই গালি তাদের মধ্যে তেমন কোনো ক্ষোভের সৃষ্টি করে না। কারণ জীবনের শুরু থেকেই বেঁচে থাকার তাগিদে তারা তাদের থেকে উপরস্থ মানুষের তিরস্কার, বঞ্চনা, শোষণ, নিপীড়ন সহ্য করে আসছে। ফলে এগুলো তাদের গা-সহা হয়ে গেছে। কিন্তু সব সময় তারা চুপ থাকে না। প্রতিবাদও করে মাঝে মাঝে। সেনিটারি ইন্সপেক্টরের নিম্নোক্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে সেই ধারণাই স্পষ্ট হয়:
বেশি কিছু বলাও যায় না স্যার, শালারা হঠাৎ করে আবার একাট্টা হয়ে যায় কিনা স্যার[৫৭]

'হঠাৎ করে একাট্টা হওয়া'র বৈশিষ্ট্যকে রেলস্টেশনের আমলা তথা উচ্চবর্গরা ভয় পায়। এবং এর মধ্য দিয়ে দিয়ে নিম্নবর্গ নিজেদের স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করে। প্রতিদিন অপর তথা উচ্চবর্গের কথা মতো উপস্থাপন করলেও তারা নিজেদের স্বকীয় চেতনাকে একেবারে লুপ্ত হতে দেয় না। সময় সময় প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গ সেটা জানিয়েও দেয়। ফলে সেনিটারি ইন্সপেক্টরের ভয় একেবারে অমূলক নয়।

Dhaka University Institutional Repository

একদিন শিশুপুত্র নিয়ে সেখানে আসে আসিয়া। শ্রেণিগত একাত্মতার কারণে খুব তাড়াতাড়ি সে মানিয়ে নেয় স্টেশনের উদ্বাস্তু মানুষ ও তাদের জীবন যাপনের সঙ্গে। আর আসিয়া তাদের জীবনে নিয়ে আসে আনন্দ। রাত-দিন গালাগালি মারামারি করে যে আনন্দকে তারা হারাতে বসেছিল তা-ই আবার সে ফিরিয়ে নিয়ে আসে তাদের মধ্যে। রেলকর্মকর্তা আসবে বলে উদ্বাস্তু এই মানুষদের উচ্ছেদ করতে চায় স্টেশন মাস্টার। কারণ 'স্টেশন নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখতে হবে।'[৫৮] এর মধ্যে একদিন হাসেম আসিয়াকে দেখে তাকে নিয়ে যেতে চায়। কারণ সে-ই একদিন এক সায়েবের বাসায় আসিয়ার কাজ জোগাড় করে দিয়েছিল। আসিয়া যেতে রাজি হয় না। কাওসার, তার মা, সালাম, আজি– ছিন্নমূল এই মানুষরা আসিয়াকে সমর্থন করে। ব্যর্থ হয়ে হাসেম রেগে চলে যায়। তাদের উচ্ছেদ করার জন্য পুলিশ এসে নির্মমভাবে লাঠি চার্জ করে। এই ঘটনায় কাওসারের মা মারা যায়। ডেডবডি নিয়েও দেখা দেয় দ্বন্দ্ব:

স্টেশন মাস্টার: আমি বুঝি আমার স্টেশন। ডেডবডি নিয়ে যাও এখান থেকে।
সালাম: কই লইয়া যামু হেইডা কন?[৫৯]

পুঁজিতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর কারণে ক্ষমতার রয়েছে নানান স্তর। শাসকগোষ্ঠী মূল শক্তি নিজেদের হাতে রেখে ক্ষমতাকে বণ্টন করেন শাসন-সূত্রে তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মাঝে। নাটকটিতে ক্ষমতার গতি-প্রকৃতির সেই বহুমাত্রিক রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে। পুঁজি নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্র হয়ে ওঠে সকল ক্ষমতার উৎস। প্রশাসন, পুলিশ, বড়ো আমলা, ছোট আমলা বিভিন্ন শ্রেণির মাধ্যমে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটি তার কর্তৃত্বকে দৃঢ় ও শঙ্কাহীন করে। আবার মাস্তান-গুণ্ডাদের বেআইনি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেও রাষ্ট্র তার ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করতে চায়। কালার মধ্য দিয়ে ক্ষমতার বেআইনি রূপটি ফুটে ওঠে। নাটকটিতে ক্ষমতার দুটো দিকই নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন। রেলওয়ে কর্মকর্তা, স্টেশন মাস্টার, সেনিটারি ইনস্পেক্টর, পয়েন্টসম্যান প্রত্যেকে রাষ্ট্রের কর্মচারী। চাকরিতে অবস্থান অনুযায়ী প্রত্যেকের রয়েছে ক্ষমতার তারতম্য। আবার কালা স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে সুবিধা পায় বলে উচ্চবর্গের পক্ষে কাজ করে। নিম্নবর্গের লোক হওয়ার পরও সে-ই স্টেশনমাস্টারের কথা মতো কালার মায়ের লাশ নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর থেকে কালাকে স্টেশনের অন্যান্য বাস্তুহীন মানুষ আর নিজেদের লোক ভাবে না। কালার কার্যকলাপ তাকে আলাদা করে দেয়।

সালাম: জীবনে এই রকম দুঃখ তো আমাগো আছে। তাই বইলা আমরাও অই রহম আনছি নিহি!
কালা: অন নাই। আপনারা ভালা মানুষ।
সালাম: গেরামের ঐ মেম্বার আর এই হাসেম মিয়া এক মানুষ না? তবুও তার কাম তোমার করতে অইবো?
কালা: না কইরা করমু কী? খামু কই? সবখানেই তো অরা আছে।
সালাম: তাইলে আমাগো বাঁচতে অলি অগো লগে টক্কর দিয়া বাঁচতে অইবো না?
কালা: কেমন? অগো কতো শক্তি, অগো লগে মানুষ আছে, পুলিশ আছে।
সালাম: তর গতরে শক্তি আছে না? আর আমারে দেহস– শুকনা মানুষটা, কারখানার বহুত বড় বড় লোহার রড দুই হাতে দিয়া বেকা করি। আয় এক লগে লইরা দেহি! আয়!–[৬০]

এই সামান্য কথায় তাদের মধ্যে মিল, একতা তৈরি হয়ে যায়। মাতৃশোকে কাতর কাওসারকে কারখানায় কাজ পেতে সহায়তা করে সালাম। পারস্পরি কষ্ট-বেদনা তাদেরকে একাত্ম করে তোলে। আজি এবং কাওসার আসিয়াকে বুবু ডাকে এবং তারা সিদ্ধান্ত নেয় ফুলুরি ভেজে জীবিকা নির্বাহ করবে। কাজও শুরু করে তারা। কিন্তু সেনিটারি ইন্সপেক্টর, পয়েন্টসম্যান লাথি মেরে ভেঙে দেয় তাদের সব জিনিসপত্র:

সেনিটারি: শুয়োরের বাচ্চাদের শখ কত? একেবারে সংসার সাজিয়ে বসেছে। এই ব্যাটা! শালারা হাড়ি-পাতিল তুলছিস না কেন?[৬১]

এর কোনো প্রতিবাদ না করে আজি স্টেশন থেকে চলে যেতে চায়। বার বার এই অপমান সে আর সহ্য করতে পারে না। কিন্তু সেনেটারি, পয়েন্টম্যান তাদের হাড়িপাতিলের মতো ক্ষুদ্র অবলম্বনটুকুও যখন কেড়ে নেয় তখন তারা প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়। পয়েন্টসম্যান ডেকচি নিয়ে চলে যাওয়ার সময় কাওসার আটকায়। কালাও এতদিনের ভুল বুঝতে পারে। স্টেশনের ক্ষমতাবানদের নির্দেশ মতো কাজ করার কারণে নিজের মনুষ্যত্ববোধ অনেকটা বিসর্জন দিলেও মায়ের কাছ থেকে ছেলে কেড়ে নেয়ার মতো নির্মম বিষয়টা সে মেনে নিতে পারেনি। তাই সে পয়েন্টসম্যানের গলা টিপে ধরে আসিয়ার হারিয়ে যাওয়া ছেলের খবর জানতে চায়। এই ঘটনার পর আসিয়া কালাকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করে। সারা জীবন অবহেলা, বঞ্চনা, ধিক্কারের মধ্যে বড় হওয়ার কারণে স্নেহ-মমতার এই সম্বোধন তার বোধকে নাড়া দেয়। ফলে সালাম মিয়া তাদের একতাবদ্ধ হওয়ার কথা বললে কালাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়:

সালাম: কিরে কালা– মুখ নিচু করে রাখছস ক্যান? ও শরম করে, না?
কালা: হ মিস্ত্রি ভাই।
সালাম: আমারে তুই একদিন মারছিলি? আমার পিডে এখনো তার দাগ আছে।
কালা: আমারে আপনি মাপ কইরা দেন–
সালাম: আইজ মাফ করনের কথা নাই। তুই মানুষ হইতে চাস মানুষ-অ। তাইলেই আমি খুশি। আমরা যদি আমাগো শত্রু চিনবার পারি, বন্ধু চিনবার পারি, তাইলে আমাগো কোনো দুঃখ থাহে? ঐ– তগো অহন কেমন মনে অয়রে? একলা মনে অয়?
আজি: না মিস্ত্রি ভাই–
কাওছার: মনে অয় আমরা সবগুনি একগুষ্টি–[৬২]

যে কালা এত দিন স্টেশনমাস্টারের কথা মতো কাজ করে এসেছে, নিজের বেঁচে থাকার কথা চিন্তা করে স্টেশনের অন্য সব মানুষের ক্ষতিসাধনও করেছে, সে আজ আসিয়া এবং সালাম মিয়ার সামান্য কিছু কথায় সচেতন হয়ে উঠেছে। সামান্য ঘটনাই নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে বিভেদ কিংবা একতা তৈরি করতে পারে। বঞ্চিত জীবনের স্বরূপটি যখন তাদের সামনে কেউ উন্মোচিত করে তখন তারা ক্ষোভে ফেটে পড়ে, একতাবদ্ধ হয়। তাই কালার এই আকস্মিক পরিবর্তনও খুব অযৌক্তিক মনে হয় না। *ওরা কদম আলী*'র মতো শোষিত মানুষের হঠাৎ প্রতিবাদী হয়ে ওঠা কিংবা খুব দ্রুত ভাল হয়ে যাওয়া, সচেতন হওয়া ইত্যাদি ঠিক একই ভাবে এই নাটকেও দেখা যায়। কালার মতো শক্তিশালী লোক তাদের সাথে যোগ দেয়ায় তারা হঠাৎ সাহসী হয়ে ওঠে। নিম্নশ্রেণির মানুষের সম্মিলিতভাবে সাহসী হওয়া উচ্চবর্গের প্রতিনিধিদের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। তাদের একাত্মতাকে উচ্চবর্গ সব সময় ভয় পায়। আসিয়া এই নাটকে নিম্নবর্গের একতাবদ্ধ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে। একরাতে তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে যেতে চায় সেনিটারি ইন্সপেক্টর। কালা বাধা দেয় এবং তার সাহসের কারণে সবাই একজোট হয়ে সেনিটারিকে মারে। নাটকটির পরিণতি থেকে নিম্নবর্গের জমায়েত বা সংগঠিত হওয়ার স্বরূপটি প্রতিফলিত হয়। এতদিন তারা পাশাপাশি থাকলেও জীবন-বঞ্চনার অবসানে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়নি। কিন্তু আসিয়ার অপমান তারা সহ্য করে না। কারণ সে-ই তাদের অবহেলিত জীবনে বুলিয়ে দিয়েছে স্নেহ-মমতার পরশ। তাই কোনো যুক্তি, আইনের তোয়াক্কা না করে তারা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। কালার সংলাপের মধ্য দিয়ে সেটি স্পষ্ট প্রতীয়মান:

শালার সেনিটারি, এতদিনে পাইছি তোমাগো। তোমাগো হাড্ডি গুড়া করুম শুয়োরের বাচ্চা! এতদিন জেল খাটছিলাম বিনা দোষে। আর অহন জেল খাটুম তগো মাইরা–[৬৩]

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রেলস্টেশনে ক্ষমতার প্রতিনিধিরা ক্ষেপে যায়। তারা পুলিশ পাঠায় কালাকে ধরার জন্য। প্রশাসন বরাবর উচ্চবর্গের অনুশাসন মেনে চলে। কালাকে না পেয়ে পুলিশ গংগারামকে মারে। পালাতে গিয়ে গুলিতে মারা যায় সে। আজি এবং কাওসারকেও পুলিশ ধরতে যায়। সেই

সুযোগে পয়েন্টসম্যান আসিয়াকে জোর করে নিয়ে যেতে চায়। এবার আর আসিয়া চুপ থাকে না। মুহূর্তেই সে পয়েন্টসম্যানকে মাটিতে চেপে ধরে। প্রতিবাদী হয়ে ওঠে সে:

কুত্তার বাচ্চা! শুয়োরের বাচ্চা! হারামি! তগো লাইগা আমি গেরামে থাকতে না পাইরা টাউনে আইছিলাম। হুনছি– টাউনে আইন আছে, কানুন আছে, বিচার আছে! আমারে যারা আশ্রয় দেয় তাগো তরা কাইরা লস আমাগো কাছ থিকা। আমাগো এক বেলা খাওনের সুযোগটা পর্যন্ত দিবার চাস না! তরে আমি খুন করুম–[৬৪]

শেষ পর্যন্ত আজি, কাওসার আর আসিয়াকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। অন্যদিকে কালা ও সালাম মিয়ার নেতৃত্বে সব কুলি মজুর একত্রিত হয় গংগার লাশের জন্য। তারা সিগন্যাল দখল করে, ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয়। উপায় না দেখে অবশেষে কর্মকর্তা আসে তাদের সঙ্গে সাজানো আলোচনার জন্য:

ওদের ডাকুন। আমি আলোচনায় বসবো। এই ফাঁকে ম্যাসেজটা ওয়ারলেসে পাঠিয়ে দিন। পুলিশ ফোর্স ততক্ষণে পজিশন নিয়ে নেবে।[৬৫]

উচ্চবর্গের এই ষড়যন্ত্র সহজ-সরল নিম্নবর্গের মানুষগুলো ধরতে পারে না। আলোচনা চলে পুলিশ আসার আগ পর্যন্ত। পর্যাপ্ত রক্ষীবাহিনী চলে আসলে স্টেশনের মানুষের ওপর তারা নির্বিচারে গুলি চালায়। কিন্তু নিম্নবর্গ সংখ্যায় বেশি। জেগে উঠলে তাদের কাছে মৃত্যু তুচ্ছ:

সেনি. ইন্সপেক্টর: সব শালাকে শেষ করে দিন।
কুলি: কয়জনরে শেষ করবা তোমরা–
আসিয়া: আমরা হাজারে হাজার!
কালা: আমরা লাখ লাখ!
সবাই: আমরা কোটি কোটি![৬৬]

পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোয় শাসকশ্রেণি অর্থাৎ উচ্চবর্গ নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে নানা পথ বেছে নেয়। শিক্ষাব্যবস্থা, সংবাদপত্র, আইন, পুলিশ-প্রশাসন ইত্যাদি মূলত শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতেই তারা গড়ে তোলে।[৬৭] ফলে শাসক বলা মাত্র নিম্নবর্গের ওপর কোনো ন্যায্য কারণ ছাড়াই পুলিশ অত্যাচার চালায়, হত্যা করে। নাটকেও সেই বক্তব্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। মামুনুর রশীদের নাট্যদর্শন তাঁর সামসময়িক দেশ-কাল ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত হয়েছে। তাই তাঁর কাছে সামন্ততন্ত্র, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ, সামরিকতন্ত্র, পুঁজিবাদী আগ্রাসন, সাংস্কৃতিক লেজুড়বৃত্তি ইত্যাদি বিষয় গভীর তাৎপর্যের। তাঁর নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় মানুষ; নিম্নবর্গের মানুষ।[৬৮] মূলত তাদের জীবনকেই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন, নিরাবেগীয়ভাবে নয়, মমতার দৃষ্টিতে। ফলে নিম্নবর্গের পরাজয় তাকে ব্যথিত করে, আবার তাদের মিলিত শক্তির উত্থানের সম্ভাবনাও তাঁকে উজ্জীবিত করে।[৬৯] মামুনুর রশীদের প্রায় সব নাটকের মতোই উক্ত নাটক দুটিতেও ব্যক্তির জাগরণ-শক্তি সমষ্টিতে সঞ্চার ও সমষ্টির একক শক্তিতে উত্তরিত হবার স্বপ্নছবি চিত্রিত হয়েছে। এই সমষ্টি স্পষ্টভাবেই শ্রমজীবী তথা নিম্নবর্গ।

নিদারুণ দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যেই নিম্নবর্গের মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম চলে। তাদের অস্তিত্ব-সংকটের কেন্দ্রে রয়েছে অর্থনৈতিক দুর্বলতা। তাই অর্থ-মূল্যে ক্ষুদ্র যে কোনো কিছুই তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি করে। আবার শ্রেণিগত ঐক্যের কারণেই কোনো তুচ্ছ ঘটনায় হঠাৎ তারা একাত্ম হয় প্রতিবাদে, প্রতিরোধে, কখনো-কখনো প্রতিশোধে। তবে সামষ্টিকভাবেই শুধু নয়, ব্যক্তিগত ভাবেও তারা নিজের অবস্থার জানান দেয়, অধিকার আদায়ে সরব হয়। আবদুল্লাহ আল মামুন এবং মামুনুর রশীদ উভয়ের নাটকে রূপায়িত শাহরিক নিম্নবর্গের জীবন বিশ্লেষণে এই সত্যটি প্রতিভাত হয়।

তথ্যসূত্র নির্দেশ:

১. রাহমান চৌধুরী, *রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ ৩৩২।
২. মেহেদী হাসান, *বাংলাদেশের কথা সাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন*, মনন প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ২৯।
৩. রংগলাল সেন, বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ ১৭২।
৪. বিপ্লব বালা ও হাসান শাহরিয়ার, "আলাপনে আবদুল্লাহ আল মামুন", হাসান শাহরিয়ার (সম্পা), 'থিয়েটারওয়ালা', ১০ম বর্ষ: ৩য়-৪র্থ যুগ্ম সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৮, পৃ ১০৪।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪।
৬. রামেন্দু মজুমদার, *বিষয়: নাটক*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ ৩৬।
৭. সৌমিত্র শেখর, "আবদুল্লাহ আল মামুনের নাটকে সমসময়", রামেন্দু মজুমদার (সম্পা), 'থিয়েটার', ৩৮তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ ৮৫।
৮. সেলিম মোজাহার, *স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮,পৃ ৭২।
৯. আবদুল্লাহ আল মামুন, *নির্বাচিত নাটক*, 'সুবচন নির্বাসনে', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা), নালন্দা, ঢাকা, ২০১১, পৃ ১৮।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ ৩০।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ ৫০।
১৩. আবদুল্লাহ আল মামুন, *নির্বাচিত নাটক*, রামেন্দু মজুমদার (সম্পা), "ভূমিকা", প্রাগুক্ত।
১৪. সেলিম মোজাহার, প্রাগুক্ত, পৃ ৯০।
১৫. আবদুল্লাহ আল মামুন, *নির্বাচিত নাটক*, 'এখনও ক্রীতদাস', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৮-১৫৯।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৯।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৪।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৬।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ ২০৮।
২০. অনুপম হাসান, "আবদুল্লাহ আল-মামুন: মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিষয়ক নাটক" হাসান শাহরিয়ার (সম্পা)' 'থিয়েটারওয়ালা', ১০ম বর্ষ: ৩য়-৪র্থ যুগ্ম সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৮, পৃ ৭৩-৭৪।
২১. আবদুল্লাহ আল মামুন, *নির্বাচিত নাটক*, 'এখনও ক্রীতদাস', প্রাগুক্ত, পৃ ২১১।
২২. সেলিম মোজাহার, প্রাগুক্ত, পৃ ৯১।
২৩. শফি আহমেদ, " সমকাল ও আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক" হাসান শাহরিয়ার (সম্পা), 'থিয়েটারওয়ালা', প্রাগুক্ত, পৃ ৫১।
২৪. আবদুল্লাহ আল মামুন, *নির্বাচিত নাটক*, 'সেনাপতি', প্রাগুক্ত, পৃ ১২২।
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১১০।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৯-১৪০।
২৭. আবদুল্লাহ আল মামুন, *নির্বাচিত নাটক*, 'মেহেরজান আরেকবার', প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৩ ।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৩।
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬৭।
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬৮ ।
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭৭।
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮১।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯০।
৩৪. রাহমান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪২।
৩৫. সেলিম মোজাহার, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৩।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১১৪।
৩৭. আবদুল্লাহ আল মামুন, *নির্বাচিত নাটক*, প্রাগুক্ত, 'কোকিলারা', পৃ ২৯৫।
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৩০০।
৩৯. সেলিম মোজাহার, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৪।
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ ১১৪।
৪১. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, "বাংলাদেশের নাটকের বিষয়: রূপ ও রূপান্তর", রামেন্দু মজুমদার (সম্পা) 'থিয়েটার', ৩৯তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই ২০১০, পৃ ১৬১।
৪২. মামুনুর রশীদ, "মুক্তনাটক: জাতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা", রামেন্দু মজুমদার (সম্পা), *নাট্যপরিক্রমা: চার দশকের বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩২।
৪৩. অরাত্রিকা রোজী, *বাংলাদেশের নাটক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ ৪০।
৪৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ, "বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্যসাহিত্যের ধারা", রামেন্দু মজুমদার (সম্পা), *নাট্যপরিক্রমা: চার দশকের বাংলাদেশ*,প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৪।
৪৫. মামুনুর রশীদ, *ওরা কদম আলী*, "ভূমিকা", মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮১।
৪৬. মামুনুর রশীদ, *ওরা কদম আলী*, প্রাগুক্ত।
৪৭. মামুনুর রশীদ, *ওরা কদম আলী*, প্রাগুক্ত।
৪৮. মামুনুর রশীদ, *নির্বাচিত নাটক*, 'ওরা কদম আলী', মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ ৫৪।
৪৯. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস", *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ ২০।
৫০. মামুনুর রশীদ, *নির্বাচিত নাটক*, 'ওরা কদম আলী', মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ ৫৫।
৫১. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬।
৫২. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭।
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮।
৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮।
৫৫. মামুনুর রশীদ, *ওরা আছে বলেই*, "ভূমিকা", মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৪।
৫৬. মামুনুর রশীদ, *নির্বাচিত নাটক*, 'ওরা আছে বলেই',প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬।
৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬।
৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৭০।
৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪।
৬০. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭।
৬১. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৪।
৬২. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৮-৮৯।
৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৩।
৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৯।
৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১০২।
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪।
৬৭. হীরেন্দ্রনাথ গোহাঁই, "ভারতে আধিপত্যের রূপরেখা", শোভনলাল দত্তগুপ্ত (সম্পা), *আনতোনিও গ্রামশি বিচার-বিশ্লেষণ*, ২য় খণ্ড,পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০ পৃ ৪৩।
৬৮. সেলিম মোজাহার, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২।
৬৯. সেলিম মোজাহার, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের নাটকে গ্রামীণ নিম্নবর্গ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নাটকে গ্রামীণ নিম্নবর্গ

প্রচলিত ক্ষমতা কাঠামোয় উন্নয়ন সূচকের সূত্রে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় বিশ্বের কাতারে। আর 'তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে উন্নয়নের অর্থ হল– বর্ধিত কৃষি উৎপাদন, শিল্প উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি, বিদেশে রপ্তানি ও মোট জাতীয় উৎপাদনে বৃদ্ধি। বহুবর্ণা পোস্টার যেমন পর্যটকদের বিভ্রান্ত করে তেমনিভাবে এই সব তথ্য ও উপাত্ত বাস্তব চিত্রটার ওপর উজ্জ্বলতার প্রলেপ এনে দেয়। যদিও সরকার বিদ্যুৎ সরবরাহ, উচ্চফলনশীল বীজ, সেচ, সার এবং আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করছে। তবুও বাস্তব চিত্রটা হলো– প্রতি বছর আরো অধিক সংখ্যক কৃষক ভূমিহীন হয়ে পড়ছেন। গরিব আরো গরিব হওয়ার বিপরীতে মুষ্টিমেয় ধনীরা আরো ধনী হয়ে ওঠাই এই উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য।'[১] বাংলাদেশের নাটকে গ্রামীণ নিম্নবর্গের আলোচনায় এই ভূমিহীন, গরিব কৃষকের জীবনই প্রধানভাবে আলোচ্য। দেশের অর্থনীতিতে কৃষির প্রধান ভূমিকা থাকলেও কৃষকের জীবনের কোনো উন্নয়ন ঘটেনি। বরং দিনে দিনে তারা নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়েছে কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন এক গোষ্ঠীর ওপর। দেশের জমির বেশির ভাগ মুষ্টিমেয় মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকায় কৃষকরা হয়ে উঠেছে তাদের ইচ্ছার অধীন। এই অধীনতার মধ্যেও বাংলার কৃষকরা বিদ্রোহ করেছে অধিকার আদায়ের জন্য। তবে শুধু জমির মালিকের শোষণ নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও বাংলার কৃষককে সামলে উঠতে হয়। জীবন যাপনের অনিবার্য তাগিদে নিজেকেই তার বেছে নিতে হয় নতুন নতুন পথ। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় প্রচলিত সমাজকাঠামোকে অস্বীকার-বৃত্তি। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্রের বক্তব্য হলো:

> বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। বাঙালি সংস্কৃতি ও রাজনীতির ধারক ও বাহক তারা। সাম্রাজ্যবাদ, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধাক্কা শেষ পর্যন্ত তাদের সামলাতে হয়। এই মোকাবিলার অভিজ্ঞতা কেবল আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে না। চৈতন্যের জগতেও নানা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষমতাকেন্দ্রের বিরুদ্ধে বাঙালি কৃষক সমাজ প্রতিস্পর্ধী হয়। পরিস্থিতি বিশেষে কৃষকরা সমঝোতা করে, আবার অবস্থামাফিক নানা ইঙ্গিত ও প্রতীকের মাধ্রমে ঐ সব ক্ষমতার নিদর্শনকে তারা নাকচ করে দেয়, নিজস্ব সংস্কৃতির নানা প্রকাশভঙ্গিতে উচ্চকোটির নিরঙ্কুশ সামাজিক আধিপত্যে বিপর্যয় আনে।[২]

এই বক্তব্যের সত্যতা বাংলাদেশের নাটকেও লক্ষ করা যায়। উচ্চবর্গের শোষণ শাসন, অন্যায়, অবিচার অত্যাচার, নিপীড়ন ইত্যাদি বাংলাদেশের কৃষকরা সব সময় শুধু সহ্য করে যায়নি, মাঝে মাঝে, কিংবা বাঁচার তাগিদেই শেষ মুহূর্তে তারা বিদ্রোহে গর্জে উঠেছে।

কৃষক বিদ্রোহের আলোকে রচিত বিখ্যাত নাটক সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫-) কাব্যনাট্য *নূরলদীনের সারাজীবন* (১৯৮২)। ইতিহাসের আলোকে নাট্যকার বর্তমানকে দেখে নিতে চান পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে। নাট্যকারের বক্তব্য:

> যে জাতি অতীত স্মরণ করে না, সে জাতি ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে না। এই কাব্যনাট্যটি লিখে ফেলবার পর আমার আশা এই যে, এই মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন এমন সব গণনায়কদের আমরা ভুলে গিয়েছি তাদের আবার আমরা সমুখে দেখব এবং জানব যে আমাদের গণ-আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের ও অনেক বড় মহিমার– সবার ওপরে, উনিশ শো একাত্তরের সংগ্রাম কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।[৩]

উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ মূলত নূরলদীনের মতো গণনায়কদের আত্মোৎসর্গেরই ফসল। এই উপলব্ধির পাশাপাশি সমাজের শ্রেণিসত্যকেও নাট্যকার স্পষ্টভাবে এ নাটকে চিহ্নিত করেছেন। নাটকটি তাই নিম্নবর্গের জীবন-চিত্রের প্রতিফলন হয়ে ওঠে। একদিকে ডিমলার জমিদার গৌরমোহন চৌধুরী, খাজনা আদায়কারী দেবী সিং এবং কোম্পানি অন্যদিকে সাধারণ কৃষক। অর্থাৎ সামন্তপ্রভু-ক্ষেতমজুর, ধনী-গরিব, শোষক-শোষিত, শাসক-শাসিত, উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ। উচ্চবর্গ তথা শাসক বা জমিদার কখনো তার অধীনস্তদের জীবন নিয়ে ভাবে না।

তার চাই নিজস্ব চাওয়ার পূর্ণতা। তাই কৃষকরা খাজনা দিতে না পারলে খাজনাআদায়কারী দেবী সিংয়ের নির্যাতন তাদের সহ্য করতে হয়। জমিদারের পাশাপাশি আছে মহাজনের সুদের খড়্গ। আর সবার ওপরে কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্য। আর্থিক শোষণের সঙ্গে আছে সামাজিক শোষণ– ঘরের নারীর ওপর পাশবিক নির্যাতন। সব কিছু মিলিয়ে কৃষকের জীবনে দুর্বিষহ অবস্থা। এই অবস্থায় বিদ্রোহ, প্রতিরোধ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। নূরলদীন তাই কৃষক হয়েও স্বশ্রেণির কাছে হয়ে ওঠে নবাবের সমতূল্য। প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজেদের মতো করে নিম্নবর্গ যে একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে– নাটকটি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বঞ্চনার সামাজিক সত্যে তাদের কাছে উন্মোচিত হয়– দেশ, ধর্ম, ভাষা কিংবা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে নয়, শোষকরা একাত্ম হয় মূলত ক্ষমতা আর শোষণের স্বার্থে। সব কিছুর ঊর্ধ্বে এদের একটাই সাম্য; এরা শোষক।[৪] তাই শোষকের বিপরীতে জীবনযাপন ও প্রবহমান দৃশ্যমানতার সূত্রে ঠিক একই ভাবে তারাও নিজেদের একাত্ম ভাবে:

কালা ধলায় একজোটেতে কবচ করে জান,
এক জোটেতে গোরা সাহেব, হিন্দু মুসলমান।
তফাত করি না দেখিবেন উয়ার মধ্যে ভাই,
যে করিছে শোষণ হামাক শোষণকারী তাঁই।
চামড়া কালা, চামড়া ধলা, তফাত কোনো নাই,
যে মারিছে জানে হামাক জানের শত্রু তাঁই।
কালায় কালা, ধলায় ধলা উপরতলায় এক,
উপর তলায় এক জাতি যে খেয়াল করি দ্যাখ।
খেয়াল করি দ্যাখরে আমার লেঙ্গুটিয়া ভাই
আরেক জাতি আমরা হনু গরীব বলিয়াই।[৫]

এই বোধ তারা কোনো তত্ত্বের আলোকে উদ্ভাবন করেনি। নিজের জীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে তারা উপলব্ধি করেছে; এবং নূরলদীনের মতো একজন সাধারণ কৃষকের নেতৃত্ব তারা মেনে নিয়েছে প্রচলিত ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য নয়, জমিদার, কোম্পানি, দেবী সিংয়ের নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ শত্রু থেকে মুক্তি পেলেই যে শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না, তার জন্য সমাজকাঠামোরও পরিবর্তন দরকার, এই বোধ তাদের চেতনায় আসে না। তাই তাদের বিদ্রোহ যতটা না সচেতন বোধের, তার চেয়ে বেশি তাৎক্ষণিক আবেগ এবং ফলাফল লাভের আশায়। এই সত্যের পাশাপাশি নাট্যকার খুব সার্থকভাবে নিম্নবর্গের বিদ্রোহাত্মক প্রবণতাকে এই নাটকে উপস্থাপন করেছেন। যা মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে নিম্নবর্গের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্য। নিম্নবর্গের তাত্ত্বিকরা মনে করেন: 'এক মাত্র একটি মুহূর্তেই শাসককূলের মানসপটে নিম্নবর্গ আবির্ভূত হয় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে। সেই মুহূর্তটি হল বিদ্রোহের মুহূর্ত। নিম্নবর্গ যখন বিদ্রোহী, তখনই হঠাৎ শাসকবর্গের মনে হয়, দাসেরও একটা চেতনা আছে, তার নিজস্ব স্বার্থ আর উদ্দেশ্য আছে, কর্মপদ্ধতি আছে, সংগঠন আছে।'[৬]

নিম্নবর্গীয় বিদ্রোহের স্বরূপটি *নূরলদীনের সারাজীবন* নাটকে স্পষ্ট প্রতীয়মান। নিম্নবর্গ উচ্চবর্গের নির্দেশ-মতো চললেও শোষণের চরম মুহূর্তে তারা অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একতাবদ্ধ হয়। সবার অংশগ্রহণ সেখানে থাকে স্বতঃস্ফূর্ত। তাই নূরলদীনের আহ্বানে সবাই একাত্ম হয়ে যায়। নিজের জীবন বিপন্ন হতে পারে জেনেও তারা পিছিয়ে আসে না। মানবমনের নানা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গ-জীবনের এই সত্যটি নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন। ইতিহাস ও কালের সীমা ভেঙে দিয়ে বাংলার এক কৃষক মুক্তি সংগ্রামকে সমন্বিত করেছেন আবহমান মুক্তিসংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ধারাবাহিকতার সঙ্গেই।[৭] তবে জাতীয় উন্মাদনা এখানে রোমান্টিক ভাবাবেগ দ্বারা দুর্বল নয়, সংগ্রামী মানুষের

আত্মবোধের দ্বারা আলোড়িত। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং মানবপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাটকে জাতীয়তাবোধের প্রকাশ ঘটায় নাট্যকারের বিশ্লেষণাত্মক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।[৮]

এখন দুঃসময় (১৯৭৫) নাটকে আবদুল্লাহ আল মামুন স্বল্পায়তনে নিম্নবর্গের জীবনকে তুলে ধরেছেন। '১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের বন্যার পটভূমিকায় লেখা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমাদের দেশের মানুষ যেমন দুর্যোগ কবলিত মানুষকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, অপরদিকে বন্যার সুযোগে ধূর্ত ব্যবসায়ী, মজুতদাররেরা মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে তাদের লোভ-লালসা চরিতার্থ করে। সেই দিকটাই আবদুল্লাহ আল মামুন তাঁর এ নাটকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন।'[৯]

বন্যা গ্রামের নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনে নিয়ে আসে চরম বিপর্যয়। সংকটময় মুহূর্তে মানুষ সবচেয়ে বেশি পরনির্ভরশীল হয়। তাই বন্যা গরীবদের জন্য কষ্টের হলেও উচ্চবর্গের কাছে তা ক্ষমতা এবং উদ্দেশ্য হাসিলের একটি সুযোগ। বিস্তৃত পানির মাঝে জরিনা খাবারের আশায় কান্নাকাটি করে। তার কান্না একজন বন্যার্ত ছাড়া আর কেউ শোনে না। কিন্তু সে কিছু করতে পারে না। কারণ তার নিজেরই রয়েছে ক্ষুধা–

বন্যার্ত: কান্দিস নারে। আর কান্দিস না। গেরামের মানুষ বেবাক গিয়া উঠেছে বড় রাস্তায়। তর এই কান্দন কেডা হুনব?
জরিনা: আমার ইচ্ছা আমি কান্দুম। তোমার কী? যাও তুমি নিজের কাম করগা।
বন্যার্ত: কাম? কাম আছে তগো বাড়িতে? করাইবি কাম? নগদ টেকা দিতে অইব না। খালি একবেলা খাওন দিবি। আছে কাম?
জরিনা: আমারে আর জ্বালাইয়ো না। যাও তুমি।
বন্যার্ত: দুনিয়া ভর কত কাম। খালি কাম নাই আমাগো গেরামে। কেউ কামলা নেয় না।
জরিনা: তোমার কতা হুনলে গাও জ্বলে। এই বানের মইধ্যে তুমার কাম দিব কে? কী কাম দিব?
বন্যার্ত: তয় ক্ষিদা লাগে কেন? কাম নাই, ক্ষিদা কেন? (একটু হেসে) জরিনা তর কাছে খাওন আছে কিছু?[১০]

ক্ষুধা এবং অসহায়ত্ব দুজনকে কাছাকাছি আনলেও তাদের একতা কোনো প্রতিকারের পথ বের করতে পারে না। এই দুর্বলতাই আরো বেশি সুযোগ করে দেয় মুন্সি আর বেপারির মতো ব্যবসায়ীদের। খাবারের লোভ দেখিয়ে মুন্সি জরিনাকে নিয়ে আসতে চায় বেপারির কাছে। কারণ এই দুর্যোগে বেপারিকে খুশি করতে পারলে সে তার অর্থনৈতিক স্বার্থকে হাসিল করতে পারবে। তাই সে জরিনার কাছে সে মিথ্যা স্নেহ-মমতার কথা বলে। মিথ্যা গল্প দিয়ে সে বিশ্বাস করাতে চায় জরিনাকে। ক্ষুধার জ্বালায় ভালমন্দ জ্ঞান লোপ পায় জরিনার। তাই মুন্সির কথা সে সহজে বিশ্বাস করে:

মুন্সি: জরিনা– আমার লগে যাইবি এক জায়গায়?
জরিনা: কোহানে চাচা?
মুন্সি: মেলা ভাত আছে। পাতিল উপচাইয়া পরতাছে। খইয়ের মতন ফুটতাছে। হাজারে হাজারে, লাখে লাখে।
জরিনা: যামু চাচা যামু। তুমি আমারে পথ দেখাও। খইয়ের মতন ফুটতাছে? হাজারে হাজারে, লাখে লাখে? একবার হুন চাচা, আমাগো বাড়িতে বাবায় ব্যাপার দিছিল– ভাতের ডেকচি বইছিল এক, দুই, তিন, চাইর– পাঁচ– ছয়– সাত– (নিশিতে পেয়েছে যেন জরিনাকে)
মুন্সি: আয়
জরিনা:আষ্ট[১১]

মন্ত্রমুগ্ধের মতো জরিনা খাবারের লোভে চলে যায় মুন্সির পিছনে। বান আসতে পারে ভেবে বেপারি আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গলাকীর্ণ এক পাহাড়ি টিলার মতো জায়গায়। সেখানে জরিনাকে পাশবিক নির্যাতন করে তারা। বেপারির পাহারাদার সোনা চিনলেও তাকে রক্ষায় সে এগিয়ে আসে না। বরং সে গালাগাল করে জরিনাকে বেপারির কাছে আসার জন্য। কারণ সে চাকর। বেপারির দয়ার ওপরেই

তাকে বেঁচে থাকতে হয়। তাই বেপারি অপরাধ করলেও তার রাগ হয় নির্যাতনের শিকার হওয়া জরিনার ওপর।

সোনা: (চাপা গর্জন) বেহায়া– বেশরম–
জরিনা: (চাপা হাসি) হিঃ হিঃ হিঃ– মরদের তেজ কত?
সোনা: আস্তা বাজাইরা!
জরিনা: মুখ খারাপ করিস না সোনা।
সোনা: আমার নাম ধইরা তুই আমারে ডাকিস না।[১২]

সোনা একসময় ভালবাসতো জরিনাকে। তাকে নিয়ে সে সংসার পাততে চেয়েছিল। কিন্তু জরিনার বাবা, বিশেষ করে জীবন ও প্রেম সম্পর্কে জরিনার অনভিজ্ঞতার কারণে সোনার সাধ পূরণ হয়নি। তাই প্রথমে জরিনার ক্ষতি তার মধ্যে কোনো কষ্ট তৈরি করে না। কিন্তু পরে যখন সে শোনে জরিনার কষ্টময় জীবন তখন মালিকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অঙ্গিকার করে:

সোনা: ক্যান তুই এই হানে মরতে আইলি জরিনা– ক্যান আইলি?
জরিনা: তিন দিন তিন রাইত মাচার উপরে বইসা আছিলাম। কেউ আমারে একটা দানা খাইতে দেয় নাই। মুন্সি গিয়া কইল, 'জরিনা যাইবি এক জায়গায় – মেলা ভাত আছে– ভরা পাতিল উপচাইয়া পরতাছে– সাদা সাদা ভাত– হাজারে হাজারে লাখে লাখে–' স্বপনের মইদ্যে চইলা আইলাম হের লগে। কিন্তু অহন যে এই ভাত আর গলা দিয়া নামে না সোনা![১৩]

বেঁচে থাকার তাগিদে সে নৈতিকতা বিসর্জন দিয়েছে কিন্তু তার বিবেককে সে বিসর্জন দিতে পারেনি। তাই কৃতকর্মের জন্য সে অনুতপ্ত। আবার সোনাও জরিনার কষ্টটাকে অনুভব করতে পেরেছে; আর জরিনা পেরেছে সোনার আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তুলতে। কিন্তু তারা দু'জন বেপারির বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না। সেই শক্তি বা ক্ষমতাও তাদের নেই। তাই শেষ পর্যন্ত তারা আহ্বান করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়– বান। বান আসার শব্দে সোনা সাহস ফিরে পায় বেপারি বিরুদ্ধে কথা বলার।

জরিনা: আয় আয় পাহাড় ডিঙ্গাইয়া আয়– মেঘের সমান উঁচা হইয়া আয়– আয়– আয়– (নেপথ্যে শব্দ ও ধ্বনি। যেন অনেক দূরে মানুষের কোলাহল। সঙ্গে জলকল্লোল। সোনা যেন মুহূর্তে সচল হয়ে ওঠে।)
সোনা: জরিনা– আইয়া পড়ছে– কালনাগিনী ফণা তুলছে। ওই শোন বনবাদাড় ভাইঙা ছুইটা আইতাছে। চক্ষু দিয়া আগুন ঝরতাছে, লকলক করতাছে জিহ্বা– (হঙ্কার) পাহারাদার জাগো– (মুহূর্তে জাগে বেপারি। হকচকিয়ে যায়)
বেপারি: কী কী হইছে রে, অই হালার পো চিল্লাস ক্যান?
সোনা: আইসা পড়ছে বেপারি। আর চিন্তা নাই।
বেপারি: নৌকা আইসা পড়ছে! কদ্দূর আইলো রে?
সোনা: নৌকা না বেপারি। বান– বান আইসা পড়ছে।[১৪]

বেপারি প্রথমে ভয় পায় না। কারণ সে পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু টিলায় তার আবাস গেড়েছে। কিন্তু সোনা তাকে বানের পানির ভয় দেখায়। মজাও পায়। ওদিকে গ্রামের মানুষ ক্ষেপে ওঠে। তারা মুন্সিকে ধাওয়া করে। কিন্তু বেপারি তাকে রক্ষা করে না নিম্নবিত্ত, ক্ষুধার্ত মানুষের ভয়ে।

বেপারি: ক্যান তুমারে ধাওয়া করছে ক্যান?
মুন্সি: আমার কাছে অগো খাওন চায়– পরনের কাপড় চায়।
বেপারি: তুমার কাছে চায় ক্যান?
মুন্সি: কয় আমার কাছে খাওন আছে, কাপড় আছে– বেপারি আমারে একটু তুমার লগে জাগা দেও– তুমার কাছে বন্দুক আছে– অরা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবো না। বেপারি–
বেপারি: মাথা খারাপ! আমি তুমারে জাগা দেই আর পাবলিক আইসা আমার কপালে ইট মারুক।[১৫]

নিম্নবর্গের ঐক্যশক্তির ভয়ে বেপারি মুন্সিকে আশ্রয় দেয় না। শেষ পর্যন্ত পাবলিক তথা নিম্নবর্গের হাতেই মারা যায় সে। এত দিনের সহযোগীর মৃত্যু বেপারির মধ্যে কোনো কষ্টের প্রতিক্রিয়া তৈরি

Dhaka University Institutional Repository

করে না। বরং মালের নৌকা না আসাই তার সবচেয়ে বড় কষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। বানের পানি বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে। শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন বাঁচাতে তৎপর হয় বেপারি। সে সোনাকে ডিঙি আনতে বলে। রাজি হয় না দেখে টাকার লোভ দেখায়। তাতেও কাজ নাহলে বেপারি জরিনাকে দিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কোনো কিছুর বিনিময়ে সোনাকে বশে আনতে পারে না। অবশেষে বেপারি বন্দুকের ভয় দেখায়। তাতেও কাজ হয় না দেখে শেষ পর্যন্ত গুলি করে। কিন্তু এবার আর সোনা মুখ বুজে সহ্য করে না। মৃত্যুর আগে সে বেপারিকে বানের পানিতে ফেলে দিয়ে এতদিনের অপমান-শোষণের প্রতিশোধ নেয়।

সোনা: জরিনা– বেপারি আমারে গুলি কইরা মারলো। আর আমি বেপারিরে বানের পানিতে ডুবাইয়া মারলাম। সমানে সমান তাই না রে। আর কোনো চিন্তা নাই জরিনা... বেপারি ডিঙি পায় নাই, তুই পাবি। তুই চইলা যা জরিনা।[১৬]

নাট্যকার এই নাটকে 'বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত গ্রামীণ মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশা, বন্যাকে উপলক্ষ্য করে এক শ্রেণির মানুষের লোভের স্বরূপ অঙ্কন করেছেন। শহরের কতিপয় নাগরিকের লোক-দেখানো ত্রাণ সংগ্রহ, সেখানে নিজেদের স্ত্রী-পুত্রদের অন্তর্ভুক্ত করা, ত্রাণ না দিয়ে আত্মসাৎ করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এই নাটকে।'[১৭] পাশাপাশি উঠে এসেছে নিম্নবর্গীয় মানুষের বিপর্যস্ত জীবন। মূলত মুন্সি ও বেপারি মিলে এই নাটকে যে শোষণের শৃঙ্খল তৈরি করে, সেখানে গ্রামের মানুষের খাবার, জমি, নারীর সম্ভ্রম– সব কিছু বাধা পড়ে। শোষকের কাছে তারা অসহায়– আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় তাদের থাকে না। শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক শক্তি তাদের সাহস যোগায় প্রতিশোধ নিতে।

মামুনুর রশীদের নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনার উৎস ও চরিত্রসমূহ অত্যন্ত বাস্তবঘনিষ্ঠ। সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর দেশীয় আমলা, মুৎসদ্দি, পুঁজির যাতাকলে-পিষ্ট দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ তাঁর নাটকের বিষয়।[১৮] শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ও ক্ষমতার সূত্রে আধিপত্যহীন মানুষের জীবনযাপনের সংগ্রাম এবং শেষ পর্যন্ত তাদের জয়ই তুলে ধরেন নাটকে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত তিনি একমাত্র নাট্যকার, যিনি স্পষ্টভাবেই নাট্যদর্শন হিসেবে মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছেন। নাটককে শ্রেণিসংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরার ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর রচিত নাটক প্রত্যন্ত জনপদে মানুষের চেতনাকে শাণিত করেছে সকল অন্যায়, শোষণ, বঞ্চনা ও কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে।[১৯] ফলে তাঁর নাটকে শোষক ও শোষিতের পারস্পরিক দ্বন্দ্বই হয়ে ওঠে প্রধান। ক্ষমতাবান ও আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর জীবনাচরণ ও চেতনা আমরা পাই মেম্বার, অসৎ আমলা, ইজারাদার, রেল স্টেশন মাস্টার, কিংবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে। বিপরীতে শোষিতের প্রতিভূ হিসেবে পাই একজন অতি সরল একগুঁয়ে নিরীহ দরিদ্র মানুষ, যে শোকে, আঘাতে প্রতিবন্ধী। সবাই তাকে কম বেশি পছন্দ করে।[২০] ঐ চরিত্রের আহ্বানেই নিম্নবর্গ তথা শোষিত শ্রেণি জেগে ওঠে এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মামুনুর রশীদের নাটক সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'মামুনের নাটকে যে বৈচিত্র্য, সেটা নানামুখী। তিনি বিষয় নিয়ে আসেন প্রত্যাশিত অপ্রত্যাশিত বিভিন্ন জায়গা থেকে। নদীর ব্যস্তঘাট, রেলওয়ে স্টেশনের জীবন, সমতট, অববাহিকা, সাঁওতাল পরগণা, স্তব্ধ গ্রাম, উৎসব, লেবেদেফের কলকাতা, অলৌকিক পাথর, শিল্পায়নের উদ্যোগ সব জায়গাতেই তিনি শিল্পায়নের খোঁজ পান। নিয়ে আসেন বিভিন্ন ধরনের সব চরিত্র। কিন্তু তারা প্রায় সবাই সাধারণ মানুষ। কেউ-কেউ প্রান্তিক জন। বোবা-কালা, সঙ, যাত্রাদলের লোক, কৃষক, মেম্বার, চেয়ারম্যান, টাউট, দেহ বিক্রয়ে বাধ্য তরুণী সবাই আসে।'[২১] বলার অপেক্ষা রাখে না, চরিত্রগুলো মূলত নিম্নবর্গের। শ্রেণিদ্বন্দ্বের আলোকে মামুনুর রশীদ তাদের জীবনকে তুলে ধরেছেন।

ওরা কদম আলী, *ওরা আছে বলেই* নাটকের মতো মামুনুর রশীদের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটের নাটকেও একজন শোষিত নিপীড়িত একগুঁয়ে সরল, দরিদ্র মানুষ থাকে। তার সাহসী পদক্ষেপের মাধ্যমে পুরো

শ্রেণি হয়ে ওঠে প্রতিবাদী ও প্রতিশোধপরায়ণ। তাঁর নাটকে শোষিতের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য কোনো রাজনৈতিক শক্তি, প্রচারণা আত্মত্যাগ ও সচেতনতার দরকার হয় না; নাটকের দ্বিতীয়ার্ধে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক দ্বন্দ্ব একটি টার্নিং পয়েন্টের কাজ করে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়।[২২] তাত্ত্বিকরা নিম্নবর্গের সংগ্রামে বা কোনো ঘটনার অংশগ্রহণে যে স্বতঃস্ফূর্ততার কথা বলেছেন, মামুনুর রশীদের নাটকে তা স্পষ্ট।

উপর্যুক্ত বক্তব্যের প্রতিফলন পাওয়া যায় *ইবলিশ* (১৯৮৩) নাটকে। গ্রামের মানুষের ওপর উচ্চবর্গের শোষণ, নির্যাতন এবং শেষে নিরুপায় হয়ে নিম্নবর্গের প্রতিরোধ দেখানো হয়েছে এই নাটকে। *ইবলিশ* নাটকের কাহিনী গড়ে উঠছে একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে। ফজল শিকদার, মুনশী ও একাব্বর মেম্বার শোষকশ্রেণির প্রতিনিধি। তবে মুনশী সরাসরি শোষক নয়, শোষকের দয়ার ওপর নির্ভরশীল বলে সে তাদের পক্ষেই কাজ করে। মুন্সির ছেলে রফিক গ্রামের শোষিত, নিম্নবর্গ মানুষের পক্ষে। বাবা ধর্মপরায়ণ হলেও সে তা নয়। মুনশী ধর্মের প্রতি অন্ধবিশ্বাসী এবং কুসংস্কারারচ্ছন্ন। আর রফিক শহরে লেখাপড়া শিখে গ্রামে ফিরে এসে সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করে। মুনশী সেটা পছন্দ করে না। নাটকের শুরুতে যাত্রা গান দেখে ফিরে আসার সময়ে শিকদার ও মেম্বারের কথোপকথনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় উচ্চবর্গ সস্তা বিনোদনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে এবং দমিয়ে রাখতে চায়:

শিকদার: কি মেম্বার, কি সমস্ত পাট্টি আনছো, কি সব বই করে।
মেম্বার: আরে বই দিয়া কি অইবো? নাইচটা দেখছেন, নাইচ?
শিকদার: আরে এই সমস্ত নাইচ দেখলে তো পোলাপানগো মাথা খারাপ অইবো।
মেম্বার: খারাপ হওনডাইতো দরকার, হোনেন, যাত্রাপাট্টি যে কয় দিন গেরামে আছে গেরামে শান্তিও আছে, যাত্রা পাট্টিও নাই, শান্তিও নাই। যাউকগা লন লন বাড়িতে লন।[২৩]

সাধারণ মানুষ সহজে সব কিছু মেনে নিলে আধিপত্যবাদীদের পথ সুগম হয়। এজন্য সস্তা-স্থূল বিনোদনের মধ্য দিয়ে তাদের যাপিত জীবনের বঞ্চনা থেকে ভুলিয়ে রাখা হয়। তবে নিম্নবর্গ একবারে ভোলে না। গরীবুল্লা, মেরাজুল প্রভৃতি চরিত্রের কথার মাধ্যমে উচ্চবর্গের প্রতি তাদের ঘৃণা স্পষ্ট। নাটকে দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব শুরু হয় একটি বিলকে কেন্দ্র করে। দশ বছরের চুক্তিতে সেটা ইজারা নিয়েছে শিকদার। গ্রামের সাধারণ মানুষ কারো নেতৃত্ব ছাড়া স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে একে অপরের কথায় চলে যায় মাছ ধরতে সেই বিলে। শিকদারের লোকেরা বাধা দিলে তারা মারামারি করে এবং পুলিশ এসে রফিক মজনুসহ কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যায়। থানায় নিয়ে বেশ মারধর করে তাদের। উচ্চবর্গের ক্ষমতা রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে পুলিশ তথা প্রশাসন। নিম্নবর্গের উত্থানকে ঠেকিয়ে রাখতে বিভিন্ন বিদ্রোহের মুহূর্তে কাজে লাগানো হয় তাদের। অত্যাচার-নির্যাতনের মধ্য দিয়ে মূলত ক্ষমতার শক্তি সম্পর্কে একধরনের ভীতি নিম্নবর্গের চেতনায় গ্রথিত করা হয়, যেন ভবিষ্যতে তারা উচ্চবর্গের ক্ষমতাকাঠামো কেন্দ্র করে আবার কোনো বিদ্রোহে সংগঠিত হতে না পারে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিশেষ করে মজনুর ওপর অত্যাচারটা বেশি হয়। তাই থানা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং প্রলাপ বকতে থাকে:

মজনু: ছাইড়া দে– আগুন, আগুন জ্বলতাছে, বুকে, মাথায় সব জায়গায় আগুন জ্বলতাছে।
রজব: হুজুর থানা থিকা ফিরাই কিমুন জানি করতাছে? দেহেন মাইরা কিছু রাহে নাই সারাডা শইলে মাথায় কত পানি ঢাললাম কিছুতেই কিছু অয়না। হুজুর, আপনে একটা উপায় করেন হুজুর, আমাগো কি সর্বনাশ অইয়া গেল হুজুর।

মজনু: সর্বনাশের কি দেখছস? তোরা চোহে দেহস না? কিমুন আগুন জ্বলতাছে? চকে আগুন জ্বলে, নদীতে আগুন জ্বলে, আকাশে আগুন জ্বলে, আমি জ্বলতাছি, তুই জ্বলতাছস আমরা সবাই জ্বলতাছি।[২৪]

এই প্রলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে প্রতিশোধস্পৃহা। মেম্বারের সহায়তায় রফিক ছাড়া পায়। মেম্বার এখানে দায়িত্ব-সচেতন। কারণ রফিক মুনশীর ছেলে এবং শিক্ষিত, সচেতন। সে এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে শোষক শ্রেণির উপকার কিংবা ক্ষতি দু'টোই করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু মজনুর সে ক্ষমতা নেই। তাই তাকে ছাড়া পেতে হয় টাকার বিনিময়ে। হাতে তখন টাকা না থাকলে মজনু কাগজে টিপসই দিয়ে টাকা নেয় শিকদারের কাছ থেকে। পুলিশের অত্যাচারের কারণে তার কাছে মুক্তিই তখন একমাত্র কাম্য হয়ে ওঠে। আর এই সুযোগটা কাজে লাগায় শিকদার। কিছুদিন পর সেই টিপসই-দেয়া কাগজের জোরে মজনুর বাড়ি-ঘর দখল করে শিকদার। অন্যদিকে রফিক পিতৃপেশা ত্যাগ করে শৈশবের বন্ধু আবদুল্লাহর তাঁত কারখানায় কাজ নেয়। গ্রামের কর্মহীন মানুষকে তার সঙ্গে আসতে উদ্বুদ্ধ করে। এ নিয়ে বাবার সঙ্গে তার বিরোধ সৃষ্টি হয়। গ্রামের মানুষ কাজ পেলে শিকদার বা একাব্বরের কাছে যাবে না। নিম্নবর্গ সচ্ছল হলে তাদের ক্ষমতা থাকবে না। এই ভয়ে তারা সংঘাতের পথ বেছে নেয়। নানা ফন্দি করে আবদুল্লাহর তাঁত তুলে দেয়ার। গ্রামের লোককে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সাধারণকে তারা টলাতে পারে না। কারণ এই কাজের মাধ্যমে এখন তাদের দুবেলা খাবার জুটছে। অবশেষে বিরোধ চরমে ওঠে – শিকদার, মেম্বার, মুনশী একদিকে, অন্যদিকে আবদুল্লাহ রফিক, মজনু। মুনশী ধর্ম রক্ষা ও নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে মেম্বার ও শিকদারের কথায় রফিকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করে। কারণ সে-ই গ্রামের লোককে প্ররোচিত করছে কারখানায় কাজের জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই রফিকের পথ অনুসরণ করে, কাজ নেয় আবদুল্লাহর তাঁত কারখানায়। ফলে শিকদার আর জমি চাষের লোক পায় না। তাই সে কৌশলে এবং ক্ষমতার বলে সুতা আনা বন্ধ করে দেয়। এর বিরুদ্ধে এক হয় গ্রামের মানুষ। তাদের নিবৃত্ত করতে না পেরে গরীবুল্লাহকে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় কারখানায়। গরীবুল্লাহ নিম্নবর্গের হয়েও স্বার্থের কারণে স্ব-শ্রেণির মানুষের সর্বনাশ করে। গরীবুল্লাহকে ধরে ফেলে মজনু। অবশেষে সব ফাঁস হয়ে যায়। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তারা। মেম্বারকে ধরতে না পারলেও তারা গরীবুল্লাহরই বিচার করে।

মজনু: আয় শুয়োরের বাচ্ছারা, আমার ভিটা দখল দিছিলি, অহন আমি আমার ভিটা দখল লইছি, মসজিদ বাড়িতে এদ্দিন বিচার করছস তরা, এখন তগো বিচার করুম আমরা, কার কি শালিস আছে দে।
মেরাজুল: খালি জুতার মালা পরাইছস ক্যা, আরেকটু সুন্দর কইরা সাজাইয়া দেই (চুন দিয়ে মুখে ছবি আঁকে)
মজনু: বিচার তো আমরা কোনদিন পাই নাই, আইজ বিচার করুম– বিচার (আতশী আসে) আতশী তুই বাদি অইয়া যা, জসিম– এর বিচার করুম আমরা যেমনে যেমনে তরে অপমান করছে, আইজ হেইরকম কইরা অপমান করুম।[২৫]

আবারও পুলিশ দিয়ে দমন করতে চায়। কারণ পুলিশ হলো আইনের সেবক। তাদের দ্বারা নিম্নবর্গের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে বাধা দিলে তা আইনের সূত্রে কোনো অন্যায় বলে গণ্য হবে না। ক্ষমতার প্রান্তে থাকা গ্রামীণ মেম্বার, শিকদাররা এই বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত। তাই নিজেদের নিরাপদ রাখার স্বার্থে বারবার তারা পুলিশ দিয়ে নিম্নবর্গের ঐক্যবদ্ধ শক্তির ওপর দমন-পীড়ন চালায়। পুলিশের ভয়ে সবাই পালালে পাগলী ধরনের আতশী পালায় না। সেই তাঁত সচল রাখে। তখন তাকে ধরে নির্যাতন করা শুরু করে তারা:

একাব্বর: তর কোনো দোষ নাই, তর মইধ্যে একটা ইবলিশ আছে হেইডাই তরে দিয়া এই কাম করাইতেছে। হেইডারে আইজকা ছাড়াইয়া দিতে অইবো, ক রফিক্যা কই? মজনু কই, বুড়া বদমাইশ তর বাপজান কই?
আতশী: জানি না।
একাব্বর: জানস না ঐ মিয়া তালবেলেম, জিন ছাড়ানোর দাওয়াইডা আনো তো (তালবেলেম যায় না) কি অইলো খাড়াইয়া রইছ ক্যান? (তবু যায় না) ঐ ফকিরা তুইই লইয়া আয় যা (ফকিরা ছেকা দেবার গরম রড নিয়া আসে)[২৬]

আতশীর ওপর তারা এত পাশবিক নির্যাতন করে যে, তা দেখে মুনশীর সবচেয়ে অনুগত তালবেলেমও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এতদিন মুনশীর কথা সে মনে-প্রাণে মেনে চললেও আজ আর মানতে পারে না। আতশীর ওপর অত্যাচার তার মানবিকবোধকে জাগিয়ে তোলে। তাই মুনশীর কথায় সে আযান না দিয়ে গ্রামের মানুষকে জেগে ওঠার কথা বলে।

তালবেলেম: (প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে তালবেলেম)– না– না, আমি আযান দিমু না, আপনেগো কথায় আমি আযান দিমু না– জাগো, জাগোরে গেরামের মানুষ জাগো, মানুষ মাইরা ফালাইরো, তোমরা জাগো।[২৭]

যাপিত জীবনের বঞ্চনা, শোষণ, নির্যাতনই শেষ পর্যন্ত তাদের একতাবদ্ধ করে তোলে। প্রশাসন, পুলিশ সব কিছু তাদের বিরুদ্ধে কাজ করে দেখে তারা নিজেরাই সংকট, বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথ বেছে নেয়। এজন্য তাদের দীর্ঘমেয়াদী কোনো পরিকল্পনা বা কোনোরকম রাজনৈতিক সচেতনতার প্রয়োজন হয় না। আবেগ, বিশ্বাস, মানবিক চেতনাকে নাড়িয়ে দেয়ার মতো কোনো ঘটনাই তাদের একাত্ম হতে অনুপ্রাণিত করে। একতাবদ্ধ জাগরণকে তারা স্মরণীয়ও করে রাখতে চায়। কারণ এই ঘটনাই ভবিষ্যতে শাসকগোষ্ঠীর বঞ্চনা-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

রফিক: মেম্বর সাব চিহ্ন তো আপনার একটা আছে আর দরকার নাই, সিকদার সাব যুদ্ধ শুরু অইছে, কোন সময় যুদ্ধে আপনারা জিতবেন, কোন সময় আমরা, এইবার আমরা জিতছি তার একটা চিহ্ন থাকা দরকার, লন–[২৮]

ওরা কদম আলী, *ওরা আছে বলেই* নাটকের মতো এই নাটকের শেষেও নাট্যকার সবাইকে জেগে ওঠার আহ্বান করেন। তবে এনাটকে বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত শোষক বা মালিকশ্রেণির বিপক্ষে নয়। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের বিরোধই হয়ে ওঠে নাটকের মূল বিষয়। এই বিরোধে সাধারণ মানুষ তাঁতশিল্পের পক্ষে। অর্থাৎ, নিম্নবর্গের মানুষ এক শোষণের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য আরেক শোষণকে গ্রহণ করে নিল। কারণ, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোয় মালিকের কাছে মুনাফা লাভই আসল। এজন্য সে শ্রমিকের শ্রম শুষে নেয়। নাটকের আবদুল্লাহ তাঁতশিল্পের মালিক। ফলে শ্রেণিগত কারণেই কৃষক থেকে শ্রমিক হওয়া মানুষ তার দ্বারা শোষিত হবে। এই পরিণতির মধ্য দিয়ে শ্রেণিসংগ্রামে সচেতন একজন নাট্যকারের দুরদর্শী চেতনার অভাব পরিলক্ষিত হলেও নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে পেশাগত এই পরিবর্তন একবারে অমূলক নয়। বেঁচে থাকার তাগিদে সহজে এবং দ্রুত যে পথ পাওয়া যায় সেটাই তারা গ্রহণ করে। শিকদারের অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনার সঙ্গে তারা পরিচিত। এর থেকে মুক্তিলাভই তাদের বর্তমান জীবনের প্রেক্ষাপটে মূল চাওয়া। তাই রফিকের কথায় কোনো বাছবিচার না করেই তারা আবদুল্লার কারখানায় কাজ নেয়। তবে মালিক হওয়া সত্ত্বেও আবদুল্লাহকে শ্রমিকের বন্ধু হিসেবে উপস্থাপন করে পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে নাট্যকার নিজের অদুরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

নিম্নবর্গের মানুষ রাজনীতি সচেতন না হলেও সময়ের তাগিদে, নিজের জীবনের প্রয়োজনে তারা মাঝে মাঝে জেগে ওঠে, বিদ্রোহ করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বতঃস্ফূর্ততা দ্বারা তারা চালিত হয়। তাদের এই বিদ্রোহ, প্রতিরোধ, শাসন ক্ষমতার ভিত নাড়িয়ে দিতে পারলেও কিংবা অল্প সময়ের জন্য কায়েম করলেও সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা ও সচেতনতার অভাবে তা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। এই বিষয়টি মামুনুর রশীদের শাহরিক প্রেক্ষাপটের নাটক দু'টির মতো এনাটকেও বেশ ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে। ফলে বিষয়গত দিক থেকে নাটকটিকে গতানুগতিক ও বৃত্তাবদ্ধ বলা যায়।[২৯] *ইবলিশ* নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের সত্যতা স্বীকার করে জবাব দিয়েছেন: 'শুধু নাট্য রচনা নয়, সবক্ষেত্রেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এদেশের ভাগ্যহত মানুষ আর তাদের নিয়ে যারা ক্রমাগত এক মরণখেলায় মেতে উঠেছে তাদের কথা। তার মধ্যেই আবার ক্রমাগত মুখ্য হয়ে উঠছে সেই নাম না জানা চরিত্রগুলো যাদের আছে অন্তহীন শক্তি।'[৩০] বোঝা যায়, শুধু নাটক রচনা মামুনুর রশীদের লক্ষ্য

নয়, নিম্নবর্গের অন্তর্শক্তিকে জাগানোর মধ্য দিয়ে একটি আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনও তিনি প্রত্যাশা করেন।

অববাহিকা (১৯৮৬) নাটক সম্পর্কেও সেই একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন নাট্যকার:'বহুদিন ধরে আমার ইচ্ছে ছিলো অববাহিকার প্রাকৃতজনকে নিয়ে একটি নাটক লিখবো, যে নাটকে এই গাঙ্গেয় অববাহিকার প্রকৃতির সন্তানদের চরিত্র, সংগ্রাম, আশা, বেদনা থাকবে আর থাকবে একটি মেয়ে। এই মেয়েটিকে সবাই চেনেন, যে স্বজন হারানো বেদনায় উপর্যপুরি আঘাতে বোবা হয়ে গেছে। তবুও সে স্বপ্ন দেখে যোদ্ধারা একদিন ফিরে আসবে। অতীতে যেমন এসেছিল বহুবার।'[৩১] ফলে এই নাটকেও আমরা উপজীব্য হিসেবে পাই শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতদের টিকে থাকার সংগ্রামকে।

অববাহিকা নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে আন্ধার মানিক দ্বীপের মানুষের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। নদীর বুকে জেগে ওঠা চর আন্ধার মানিক। বছরের বছর সেখানকার মানুষের জীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসে বান। গ্রামের খেটে-খাওয়া কিংবা আধা খাওয়া মানুষের জীবনে দেখা দেয় আরো সংকট। এ নাটকে শোষক-শ্রেণির প্রতিনিধি জামান। মানুষের সরলতা আর অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নানাভাবে দ্বীপের চারপাশে বাঁধ দেয়া থেকে বিরত রাখে তাদের। গ্রামের মানুষ যেন কোনোভাবে প্রতারণা ধরতে না পারে এজন্য সেখানকার সচেতন, বিশেষ করে জোয়ান বয়সী লোককে কোনোভাবে গ্রামে থাকতে না দেয়ার পরিকল্পনা করে। তার এই চালাকি ভণ্ডামি ধরতে পারে না সাধারণ মানুষ। ছলনা ঢেকে নিজের ভালমানুষী তুলে ধরতে দ্বীপের মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করে সে। তাই সামান্য কোনো সমস্যা হলে দ্বীপের অধিবাসীরা ছুটে আসে তার কাছে। বেগুন গাছে পোকা লাগা, মায়ের পেটে বেদনা, বাতের ব্যথা ইত্যাদি সমস্যাও বাদ যায় না:

পণ্ডিত: আমাগো আরেকটা আবদার–
জামান: বলেন পণ্ডিত চাচা–
পণ্ডিত: আমাগো গেরামের ঐ মানু, হেডা অহন কোথায় আমরা জানি না– ঐ যে মানু–
জামান: আমি জানি এবং action নেয়া সারা। case put up হয়া গেছে– তোমরা চিন্তা কইরো না– সে আসবে– বহু পয়সা আমার পকেট থিকা খরচ অইছে–
হাজেরা: আপনেরে আল্লা হাজার বছরের পরমায়ু দিক–
তফাজ্জল: আমাগো বেগুন গাছে পোকা লাগছে–
আগর আলী: মায়ের প্যাটের বেদনাডা সারে না–
গ্রামবাসী: হেই যে বাতের ব্যথাডা সারে না।[৩২]

এর কারণ, তাদের ধারণা জামান মিয়া সবকিছু সমাধান দিতে পারে। জামান মিয়াও ভাব দেখায় সবকিছু সমাধানের। এখানে নিম্নবর্গের মানুষ উপকারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু কেউ কেন সামান্য উপকার করছে সেটা আবিষ্কার করতে চায় না। বরং নিজেদের ছোটোখাটো দাবি আদায়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। দাবি না মানতে চাইলে ক্ষেপেও যায়। টিউবওয়েল বসানোর কন্টাকটর রইজুদ্দি ফান্ড ছাড়া টিউবওয়েল বসাতে চায় না। তার পক্ষে সেটা সম্ভবও নয়। কিন্তু নিম্নবর্গের মানুষ সেটা মানতে রাজী নয়। ফান্ড থাকুক বা না থাকুক। তাদের টিউবওয়েল চাই। যদি সেটা না মানা হয় তাহলে তারা অত্যাচার করতেও দ্বিধা করে না। তাই রইজুদ্দিকে তারা আটকে রাখে। জামান মিয়া বিষয়টি জানার পর ফান্ডের নিশ্চয়তা দিয়ে তাকে ছাড়ায়। দ্বীপবাসী এই সব মানুষের ঐক্যের পেছনে কোনো নির্দিষ্ট সূত্র নেই। আছে জামান মিয়ার মতো লোকের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা। কিন্তু তারা বেঈমান নয়। জামান মিয়া উপকার করে বলেই তার প্রতি নিম্নবর্গের শ্রদ্ধা অকৃত্রিম।

নিম্নবর্গের চেতনাজগত বেশির ভাগ সময় আচ্ছন্ন থাকে উচ্চবর্গের চেতনা দ্বারা। শিক্ষা, আইন, ধর্ম, সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে তাদের বোধ আচ্ছন্ন হয়। ফলে শত্রু-মিত্র

সম্পর্কে খুব সহজে তারা স্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। কিন্তু একবার যখন চিনতে পারে তখন মিত্রের পক্ষাবলম্বন করে শত্রুদের হটাতে তারা একটুও পিছপা হয় না। জীবনকে তুচ্ছ করে তারা এগিয়ে যায়। এরকম বিদ্রোহের মুহূর্তে নিম্নবর্গের স্বকীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই নাটকে প্রতিবাদী চরিত্র মানুর মধ্য-দিয়ে বিষয়টি পরিস্ফুট হয়। দ্বীপবাসী মানুষকে সচেতন করার জন্য সে নানা চেষ্টা করতে থাকে। কারণ জামানের আসল চরিত্র এখন তার কাছে স্পস্ট। আন্ধার মানিক দ্বীপের অন্য অনেকের মতো সেও জামানের প্ররোচনায় বিদেশ যাওয়ার জন্য সাগর পাড়ি দিয়েছিল। সাগর দিয়ে গেলে আর ফিরে আসবে না জেনেই মূলত জামান সাগর পথেই তাদের বিদেশ যেতে প্ররোচিত করে। কারণ একটাই; জোয়ান মানুষগুলো চলে গেলে সে চরে একাধিপত্য বিস্তার করতে পারবে। অন্যরা ফিরে না এলেও মানু ফিরে আসে। তাকে আবার পাঠাতে চায় জামান। মানু এবার যেতে রাজি হয় না। গ্রামের মানুষ তার কাছে জানতে চায় এতদিন সে কোথায় ছিল। সে যখন তাদের কাছে ঘটনাটি বলতে চায় তখন:

(হঠাৎ তিনটি টর্চ লাইট জ্বলে ওঠে। একটি লাইট একেবারে মানুর মুখের উপর । ঢোকে জামান মিয়া ও সাথে দুজন)
তমিজ: কেডা? কেডা?
জামান: কেডা? মানু মিয়া না? বাঃ বাঃ– বেশ! গবেষণা শুরু করছো ভালাই– তা গভীর রাইত ছাড়া তো ইসব কাম জমে না–[৩৩]

অর্থাৎ জামানও একেবারে দুশ্চিন্তাহীন নয়। সে ভাল করেই জানে মানু যদি সত্যটা চরবাসীদের বুঝাতে সক্ষম হয় তাহলে তার আধিপত্য একদিন শেষ হয়ে যাবে। তাই মানু আসার পর থেকে সে তাকে সব সময় নজরে রাখে। মানু দ্বীপবাসী মানুষের ওপর জামান মিয়ার প্রভাব ও ক্ষমতা সম্পর্কে জানে। তাই সে সহজে তার সাগর পাড়ি দেয়ার কথা বলতে পারে না। এরকম পরিস্থিতিতে বান আসে, যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে তারা আগে থেকে পরিচিত। তাদের ঘর বাড়ি সব তছনছ হয়ে যায়। কিন্তু বেঁচে থাকার তাগিদ যায় না। প্রচণ্ড ক্ষুধার মাঝেও তারা আশায় থাকে আগের জীবনে ফিরে আসার। এমন সময় তাদের মাঝে রিলিফের খাবার নিয়ে আসে জামান মিয়া। মানু, মাজেদা, শহর আলী নিতে চায় না সে খাবার। ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যেও বিভেদ তৈরি হয়। এক সময় চরের বেশির ভাগ মানুষ মানু এবং মাজেদাকে 'কুসাইদ্যা' ভাবতে থাকে। তাদের কারণে বান হয়েছে বলে বিশ্বাস করে অনেকে।

তফাজ্জল: আসল কতা তো কই ই নাই, ব্যবাকে কইতাছে ঐ মানুই অইলো কুসাইদ্যা, গেরামে এতদিন ভালাই আছিলাম আমরা। ও আইলো আর সাথে সাথে বিরাট অমঙ্গল হইয়া গেল– গজব সাথে কইরা নিয়া আহে– আরেক কুসাইদ্যা অইলো ঐ বোবা মাইয়াডা– এই গেরামের উন্নতি অয় না তো ওর জন্যই–[৩৪]

এর মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গীয় মানুষের চেতনার কুসংস্কারচ্ছন্নতা ও খুব সহজে স্বশ্রেণির কাউকে অবিশ্বাস করার প্রবণতা প্রকাশ পায়।

ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় শাসনতন্ত্রের কেন্দ্র মূলত নগর। তাই প্রান্তিক মানুষের চেতনায় নগর-মানুষ সম্পর্কে একধরনের ভয়, শ্রদ্ধা, সমীহ, সর্বোপরি নতিবোধ কাজ করে। ফলে স্বভাবগতভাবেই তারা স্বীকার করে নেয় যে, উচ্চবর্গ বা শহরের সঙ্গে সম্পর্কিত কেউ তাদের চেয়ে বেশি জানে। এ কারণে মানুর চেয়ে জামান মিয়ার কথাই তারা খুব সহজে মেনে নেয়। কিন্তু তারা সবাই একবারে বিবেচনাহীন নয়। গ্রাম ছেড়ে শহরে থাকার কারণে কারো কারো জামানের প্রতি সন্দেহ জাগে। এর জন্য জামান আরো ক্ষেপে ওঠে মানুর ওপর:

জামান: খাড়াও, শেষ কতাডা তার আগেই অইয়া যাইক–
মানু: শেষ কতাডা কি এত তাড়াতাড়ি অয় মিয়া ব্যাটা– ঘটনার তো শুরু আমি করি নাই, আপনেও করেন নাই–

জামান: আমি করি নাই তবে তুমি করছো– আমার বাপ দাদায় যা করছে আমি তাই কইরা যাইতাছি– আর তোমার বাপ দাদায় যা করছে তুমি তা করো নাই, ফারাকটা অইলো একটাই–[৩৫]

শাসকরা ক্ষমতা ও শোষণের স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণি তথা নিম্নবর্গের পেশাগত পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারে না। মানুর প্রতি জামানের ক্রোধ তাই শুধু ব্যক্তিগত নয়, শ্রেণিগতও।

বানের পরে মানুর সাংগঠনিক দক্ষতায় গ্রামের অধিকাংশ মানুষ যখন বাঁধ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তখন উচ্চবর্গের প্রতিনিধি জামান আর কোনো উপায় না পেয়ে তার অনুসারী মোস্তফা, মালেক আসাদকে নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ফলস্বরূপ রাতে মাজেদাকে তুলে নিয়ে যেতে চায় মোস্তফা। কিন্তু রাখালের সাহসিকতায় ব্যর্থ হয় সে। পালিয়ে বাঁচেশেষ পর্যন্ত । এই ঘটনার পর জেগে ওঠে গ্রামের মানুষ। শহরের মতো পাগলের কাছেও তখন স্পষ্ট হয় উচ্চবর্গের চালাকি:

শহর: এইবার আমি বুইতাছিরে– আমরা কাইল সকাল থিকা বান দিতে যামু এই খবর জাইনা ফালাইছে অরা, তাই রাইতেই মোস্তফারে দিয়া মাজেদারে নিয়া লইতে চাইছিলো যাতে কাইল সকালে আমরা না যাই। রাখাল: জামান মিয়া কয় তার নাকি কোন স্বার্থ নাই– কোন কিছু নাই এর মইদ্যে– তা আমাগো বান্দ দিবার দেয় না কেন? ওঃ বান্দ দিলে তো আর বছর বছর বান আইবো না– ডুইবা যাইবো না আমাগো দ্বীপ।[৩৬]

জীবনাভিজ্ঞতায় তারা চিনতে পেরেছে শত্রুদের এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে তারা এগিয়ে গেছে জামান ও তার দলকে মোকাবেলা করতে। নাট্যকার মামুনুর রশীদ এ নাটকে মূলত নিম্নবর্গের প্রতিরোধকে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি এটি ভোলেননি যে, তাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ বা প্রতিরোধ বেশি দিন স্থায়ী হয় না। শহর আলী ও মানুর সংলাপের মধ্য দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট হয়:

শহর আলী: গাইথা ফালাই–
মানু: না! ওরে একলা গাথলে লাভ নাই, একজনরে গাঁথলে তার চাইর পোলা চাইর জামান মিয়া আইবো গেরামে–[৩৭]

নাট্যকার মূলত আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে নাটকের ঘটনাবিন্যাস করেছেন। তাই চরিত্রগুলোর বেশির ভাগেরই আচরণ হয়ে পড়ে অবিশ্বাস্য। তাঁর প্রায় সব নাটকে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, চিন্তা পড়ে থাকে বাস্তবের পিছনে। বাস্তবের সাথে সুসামঞ্জস্য রক্ষা না করেই তাঁর চিন্তা খেয়ালের বশে এগিয়ে যেতে থাকে।[৩৮] ফলে শোষিত মানুষের বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, প্রতিরোধ, বিজয় সবই উদ্দেশ্যপূর্ণভাবেই উপস্থাপিত হয়।

এখানে নোঙর (১৯৮৪) সামাজিক অনাচার ও অসঙ্গতির সফল চিত্রায়ণ।[৩৯] এর কাহিনী গড়ে উঠেছে জেগে-ওঠা চরকে কেন্দ্র করে। এ নাটকে চেয়ারম্যান, তহশিলদার, আমিন উচ্চবর্গীয় অর্থাৎ আধিপত্যবাদী। নিজের ক্ষমতাকে তারা আরও বিস্তৃত করতে চায়। তাই নদীতে জেগে-ওঠা নতুন চরকে নিতে চায় দখলে। প্রচলিত আইন অনুযায়ী তহশিলদারের মাধ্যমে জমির মালিকানা নথিভুক্ত করা হয়। চেয়ারম্যান এটা জানে বলেই কৌশলে তহশিলদারকে নিয়ে এসে জমির মালিকানায় নিজের বাধাকে অপসারিত করার আইনি পথ পরিষ্কার রাখে। কিন্তু নিম্নবর্গ অর্থাৎ হাফিজ, মন্টু, বৃদ্ধা, জব্বার, আলিমুদ্দি, সফুরা– এরা আইনের মারপ্যাঁচ অতো বোঝে না। কিংবা সেটা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনেও হয় না। তাই নদীতে বিলীন হওয়া তাদের আগের জমির মালিকানার সূত্রে তারা নতুন চরে আসে। এবং নিজেদের জমির স্বত্ব বুঝে নিতে চায়, ঘর-বাড়িও তোলে। চেয়ারম্যান আগে থেকেই চরে যে বেড়া দিয়েছিল তা অগ্রাহ্য করে একে একে নিজের আবাস খুঁজে নেয় সবাই। কারণ এটা তাদের কাছে বোধগম্য নয় যে, নিজেদের জমি ফেরত পেয়েছি, সেজন্য চেয়াম্যানের কাছে যেতে হবে কেন? প্রচলিত কাঠামোর বাইরে তাদের নিজস্ব একটা চিন্তা জগত রয়েছে। যেটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পারস্পরিক বিশ্বাস। তাই জমি ফিরে তারা একাট্টা। কোনো উপায় না দেখে

চেয়ারম্যান তাদের মধ্যে বিভেদ তৈরির পথই বেছে নেয়। যাপিত জীবনে নিম্নবর্গের মানুষ নানা সংকটে পতিত। তাই সামান্য কারণে তাদের মধ্যে বিবাদ বাধে। তা থেকে তৈরি হয় বিভেদ। এই বিবাদ কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নয়, জীবন যাপনের অনিবার্যতায়। কিন্তু উচ্চবর্গের কর্মকাণ্ড উদ্দেশ্যহীন নয়। তারা নিম্নবর্গের সরলতা ও সংকটকে কাজে লাগায় আধিপত্যকে অক্ষুণ্ন রাখতে। কাজ হাসিলের জন্য তাই চেয়ারম্যান মন্টুকে তার পক্ষে রাখতে চায়। লোভ, স্বার্থ এবং সরলতার কারণে সে-ও চেয়ারম্যানের কথায় সামষ্টিক মঙ্গলের চেয়ে নিজের দিকটাকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া শুরু করে। জমি বন্দোবস্ত নিতে চায় সে চেয়ারম্যানের কাছ থেকে:

মন্টু: আইলাম তো ফিরা–
চেয়ারম্যান: তাতো দ্যাখতাছি– ভালা করছস– নিজেগো জাগায় নিজেরা তো আইবিই–
মন্টু: হ, আবার বলে কি বন্দোবস্ত লাগবো–
চেয়ারম্যান: এই তো আইন কানুন জানস– ঘরবাড়ি তুলস নাই–
মন্টু: না–
চেয়াম্যান: আমার দেশের মানুষের নাহাল মানুষ অয় নাকি? সোনার মানুষ– এ্যা– তহশিলদার সাবের কাছে ক– তর জাগাজমির কতা– কাগজপত্র যা আছে দে– বন্দোবস্ত করবো পলট কইরা দিবো–[৪০]

বুর্জোয়া সভ্যতায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান অস্ত্র শিক্ষাব্যবস্থা। বিশ্বজনীনতা, আন্তর্জাতিকতা, বিশ্বমানবতা ইত্যাদি গালভরা বুলির আড়ালে এই ব্যবস্থায় শ্রেণিগত স্বার্থ ও লক্ষ্যই প্রচ্ছন্ন থাকে। তাই বুর্জোয়া তথা মালিক শ্রেণি প্রাতিষ্ঠানিক এই শিক্ষাকে কর্তৃত্বের উপায় হিসেবে নানাভাবে ব্যবহার করে। উচ্চবর্গের নির্মিত এই শিক্ষাকাঠামো মূলত পুঁজি নিয়ন্ত্রিত। অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল না হলে কারো পক্ষে এই ব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই নিম্নবর্গ প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক অবস্থান দুর্বল হওয়ায় তাদের অনেকে ইচ্ছা থাকলে বেশি দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে না। কিন্তু পারিপার্শ্বিক জীবনবাস্তবতা অবলোকনে সে শিক্ষার ক্ষমতা সম্পর্কে কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পারে। ফলে জমির অধিকার আদায়ে টিপসইয়ের গুরুত্ব নিয়ে মন্টুর মনে তেমন কোনো প্রশ্ন জাগে না।

এ নাটকে খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সফুরা। নাটকে তৃতীয় দৃশ্যে তার আগমন নতুন চরে আগত মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে আনন্দ ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আসে। বিশেষ করে ভাই হাফিজ বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও জামাই ছাড়া তার একা আসাটা মেনে নিতে চায় না। এটা নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার একটি দিক। স্বশ্রেণির নারীর স্বতন্ত্র উপস্থিতি তারা সহজে মেনে নিতে পারে না। ফলে সফুরাকে নিয়ে চর-দখলকেন্দ্রিক কাহিনী নতুন মোড় নেয়। চরে আসা মানুষ কোনো বন্দোবস্ত না-নিলে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা এবং খবরদারি করার যৌক্তিক কারণটুকু আর থাকে না। তাই চেয়ারম্যান তাদের কাছে জমি বন্দোবস্ত না-নেয়ার কারণ জিজ্ঞেস করে। কিন্তু চরের সাধারণ মানুষ জানায় যে, তাদের জমি ভেঙে নতুন চর জেগেছে এবং জাগছে। তাই সেখানে তাদের অধিকার আছে।

চেয়ারম্যান: এই জমি এহন কার? কোন দলিলপত্র কাগজে কাম অইবো না– এইডা অহন খাস জমি–[৪১]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষা প্রচলিত শাসনকাঠামোয় ক্ষমতা সৃষ্টিতে বড় একটি ভূমিকা পালন করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা নিম্নবর্গের ক্ষমতাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নস্যাৎ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। চরবাসী ছিন্নমূল মানুষ লেখাপড়া জানে না জেনেও চেয়ারম্যান জমি ফেরত পাওয়ার জন্য তাদের দরখাস্ত করতে বলে। এর মধ্য দিয়ে সে তাদের অধিকার-আদায়ের মনোবৃত্তিটা ভেঙে দিতে চায়। তহশিলদার যে চেয়ারম্যানের অনুগত, এটাও তারা অনুধাবন করতে পারে না। আবার একতাবদ্ধ হয়ে চেয়ারম্যানের জমি দখলের প্রতিবাদ করার যোগ্য নেতৃত্ব কিংবা ব্যক্তিক মানসিকতাও তাদের নেই। তাই তারা নিজের স্বার্থ অনুযায়ী চেয়ারম্যানের কাছে দাবি করে। মন্টু আগে থেকে নিজের স্বার্থ

হাসিলের জন্য চেয়ারম্যানের কথা মেনে নেয়। ফলে চরে আসা তার কাছের মানুষকে চেয়ারম্যানের কথা মেনে নিতে বলে। হাফিজ তা চায় না। ফলে তাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়। এক পক্ষ নিজের মতো চলতে চায়। বাকিরা চেয়ারম্যানের কথা মতোই চলে:

মন্টু: বেবাকে মিলে চেয়ারম্যানরে যেভাবে ক্ষেপাইয়া দিতাছো কামডা কিন্তু ভালা অইতাছে না– চেয়ারম্যানকে কইয়া বইলা একটা মীমাংসার মইদ্দে জিনিসটা করা ভালো আছিলো– না–
হাফিজ: এগুনি এহন মীমাংসার মইদ্যে আর অইবো না– বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, না? চেয়ারম্যান যহন এর মইধ্যে হাত দিছে তখন দেইখো গোলমালডা কোন জায়গায় গিয়া খাড়ায়–
জব্বার: গোলমাল অইলে– অইবো–
মন্টু: এই সব মাথা খারাপ মাইনষের লগে লগে মাথা খারাপ অওয়াডা ঠিক না–[৪২]

তাদের মধ্যকার এই বিভেদকে কাজে লাগাতে চায় চেয়ারম্যান। নাট্যকাহিনীর এই সংকটময় পরিস্থিতিতে আসে সফুরার আগের স্বামী আমিন। সে জমির মাপজোক করে। চেয়ারম্যান ও তহশিলদারের কথা মতো সে জমি মাপে। যারা চেয়ারম্যানের কথা মতো ঘর বেধেছিল তাদের ঘর ছাড়া বাকিদের ঘর ভেঙে দিতে চায়। ফলে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ছিন্নমূল মানুষেরা। হাফিজ সাধারণের পক্ষে, মন্টু চেয়াম্যানের পক্ষে। ঘটনাক্রমে আমিন সফুরাকে চিনে ফেললে হাফিজের কাছে এতদিনের গোপন কথা প্রকাশ হয়ে যায়। সে তার বোন সফুরাকে চরিত্রহীন ভাবতে শুরু করে:

হাফিজ: গেলি ব্যাটা– যা এহান থিকা– (আমিন ভয়ে চলে যায়) অহন আমি বুঝতাছি– বহুত কেলেঙ্কারি কইরা আইছস তুই ঢাকা শহরে– যা– যা এহান থিকা–
সফুরা: ভাইজান–
হাফিজ: তর মুখে ঐ ডাক আমি আর হুনবার চাই না– যা–[৪৩]

সম্পর্কের চেয়ে সামাজিক সত্যটাই বা নিগ্রহটাই নিম্নবর্গের কাছে কাছে বেশি প্রাধান্য পায়। কোনো বিচার না করে, সত্য না জেনে, সহজে বিশ্বাস করে হাফিজ। রাতে সফুরা বাইরে থাকলেও তাই তার কোনো মমতা জাগে না। এই সুযোগ কাজে লাগায় আমিন। সফুরার অসহায়ত্বকে সে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাতে চায়। কিন্তু দৃঢ় প্রতিবাদ করার কোনো ক্ষমতা সফুরার নেই। নিজের কলঙ্কিত ইতিহাস প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে চেয়ারম্যান একরাতে জব্বারকে খুন করে:

চেয়ারম্যান: ঐ শালা হাসেন– যা লইয়া যা– অরে জাগা মতো – যা তর জলমহাল দেইখা আয়– জলমহাল তো এই দিক না– ঐ দিক– যা– ধর ল্যাংড়া শালারে লইয়া যা–
জব্বার: আইজ আমি সব কইয়া দিমু– (হাসে চেয়ারম্যান। দূরে হাসেন জব্বারকে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ চিৎকার শোনা যায়) তোমরা দুনিয়ার মানুষ শুইন্যা রাখো ঐ ঐ চেয়ারম্যান–[৪৪]

কিন্তু একজন মানুষ হারিয়ে যাওয়া নিয়ে চরের মানুষের মধ্যে কোনো জিজ্ঞাসা তৈরি হয় না। সব কিছুই মেনে নিতে তারা যেন প্রস্তুত। কোনো মতে চর দখল করা যাচ্ছে না দেখে চেয়ারম্যান নতুন ফন্দি করে। একরাতে মন্টু ও হাফিজের ঝগড়ার সময়ে অন্ধকারে পেছন দিক থেকে সে-ই মন্টুর মাথায় আঘাত করে। কিন্তু চরের সাধারণ মানুষ হাফিজকে ভুল বোঝে। তাকেই দোষী মনে করে তারা:

সফুরা: ক্যান বাইজান– ক্যান? দোস্ত অইয়া দোস্তের মাতায় তোমার লাডি ওডে ক্যামনে?
হাফিজ: একটা কতা কইছস তো টুটি চাইপা ধরুম। কাইজার সুময় খাড়াইয়া আছিলাম মন্টুর সামনে– খালি হাতে আর মন্টুর মাথায় বাড়ি পড়ল পিছন থিকা অন্ধকারে। বুঝনের আগেই কাইজ্যার মধ্যে ফাল দিয়া পড়লো চেয়ারম্যান– চিককুর দিয়া গলা ফাডাইয়া বেক্কলের দলরে বুঝাইয়া দিল হাফিজ্যা মন্টুর মাথায় লাডি মারছে।[৪৫]

হাফিজ ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝলেও কেউ সেটা বিশ্বাস করতে চায় না। কারণ নিম্নবর্গের মধ্যে সেই বিবেচনা বোধটা নেই। তারা প্রায়ই সময় চালিত হয় উচ্চবর্গের চেতনা দ্বারা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, নিম্নবর্গ তার নিজের কথা কখনো বলতে পারে না।[৪৬] চেয়ারম্যান তাদের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে হাফিজকে তার দলে নিতে চায়।

হাফিজ: মন্টুর মাথায় লাডি মারছে কে? কন যদি বাপের বেটা হন বুকে হাত দিয়া কন– আমি না আপনে?
চেয়ারম্যান: হা-হা-হা- হেইডা তুইও জানস– আমিও জানি।
হাফিজ: তয়–
চেয়ারম্যান: তয় কতা হইলো, তর আমার জানাজানিতে কুন কাম অইবো না– গেরাম শুদ্ধা মানুষ জানে– (হাফিজ রাগে ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে) আগে বাড়িস না– মাথা ঠাণ্ডা রাখ। হাফিজ্যা, এইডা তুই বালো কইরাই জানস, অহন একমাত্র আমি তরে বাঁচাইতে পারি– বেহুদা আমার লগে দুশমনি করিস না। আমার পাট্টিতে থাক। ঘর দিমু– জমি দিমু– ভালো বাসা দিমু– ফাস্টো কেলাস ভালোবাসা–[৪৭]

কিন্তু হাফিজ রাজি হয় না। কারণ সে জানে, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে নিম্নবর্গের বৃহৎ স্বার্থ বিসর্জন দেয়ার জন্য চেয়াম্যান তাকে খাতির করছে।

ঘটনাক্রমে মন্টু সফুরাকে পছন্দ করা শুরু করে। কিন্তু চেয়ারম্যান চায় আমিনের সঙ্গে সফুরার বিয়ে দিতে। চরের সবাইকে সে কথাটা জানায়ও। ফলে আবার দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে পড়ে। কোনো মতে সফুরাকে রাজি করাতে না পেরে আমিন মিথ্যা ও কৌশলের আশ্রয় নেয়। হাফিজ টাকার অভাবে বুড়িকে দিয়ে তার মায়ের রূপার বালা বিক্রি করতে পাঠালে আমিন সেই বালা কেনে। তার কাজ হাসিলের জন্য সুযোগ মতো মন্টুকে দেখিয়ে সফুরার নামে নানান কুকথা বলে। সন্দেহের জালে আটকে যায় মন্টু। কোনো কিছু না বিচার করে সে সফুরাকে অসতী, দুশ্চরিত্রা ভাবতে শুরু করে। বিয়েও আর শেষ পর্যন্ত হয় না। শুধু পারস্পরিক বিশ্বাসের দৃঢ়তা নেই বলে মন্টু সফুরার সম্পর্কে অন্যের মুখ থেকে শোনা কথা সহজে বিশ্বাস করে। একবার বিচার করেও দেখে না। বিশ্বাসের দোদুল্যমানতা এবং বিচারশক্তিহীনতার কারণেই সামান্য বালাও তাদের স্বপ্ন, প্রেম, ভালবাসার ইতি টানতে মূল ভূমিকা রাখতে পারে। শেষ পর্যন্ত প্রতিকারের কোনো উপায় না পেয়ে সফুরা কৌশলে হত্যার পথ বেছে নেয়। মন্টুর সঙ্গে বিয়ে ভেঙে গেলে সে চলে আসে আমিনের সঙ্গে দেখা করতে:

আমিন: আঁরে ডাহো
সফুরা: হ ডাহি আপনেরে আমি অনেক ভুল বুঝছি– আপনে ছাড়া আমার কোন গতি নাই আইজ রাইতে আইসেন নিশুতি রাইতে।[৪৮]

সফুরার এই অভিনয় আমিন ধরতে পারে না। বিশ্বাস করে সে রাতে আসে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর তখন:

ঘুরে দাঁড়ায় সফুরা। হাতে তার দাঁ, আমিনকে আঘাত করে। আমিন চিৎকার করে ওঠে। শূন্য চরে আমিনের চিৎকারকে অনুসরণ করে আরেকটা চিৎকার–
চেয়ারম্যান: মারছি– আমি মারছি– মারছি জব্বইরারে মারছি– কিন্তু জলমহাল অরে আমি দিমু না– দিমু না– জলমহাল– দিমু না–[৪৯]

এই স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই চরের মানুষ চেয়ারম্যানকে ঘিরে ফেলে। সবাই মিলে তার বিচার করে। আমিনকে হত্যার দায়ে পুলিশ সফুরাকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যায়। হাফিজ, মন্টু তাদের ভুল বুঝতে পারে। সফুরাই তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে বাঁচার মতো বেঁচে থাকার প্রেরণা:

বুড়ি: যে কাম তরা পারলি না হেই কাম করলো মাইয়া মানুষ অইয়া–
সফুরা: আমি যাই– এই চড়ায় আবার আবাদ অইবো– সোনার ফসল অইবো– কোন এক ফসল তোলার দিনে আমি ফিরে আসুম ততদিন তোমরা একলগে থাইকো– কও তোমরা আর চেয়ারম্যানের কতা হুনবা না–[৫০]

চরের মানুষের মধ্যে আবার একতা ফিরে আসে। সফুরার কথায় তারা স্বপ্ন দেখে সোনালি ভবিষ্যতের। এই সংগ্রাম তাদের ভবিষ্যতে পথ চলার পাথেয় হিসেবে চেতনা জগতে স্থান করে নেয়। তাই তারা একতাবদ্ধ থাকার প্রতিজ্ঞা করে। অতীতের সংগ্রামী চেতনা নিম্নবর্গের মানুষকে ভবিষ্যতের বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সাহস যোগায়। এই সত্যটি নাট্যকার *এখানে নোঙর* নাটকে তুলে ধরেছেন। নাট্যকারের বক্তব্য থেকে বিষয়টি স্পষ্ট: 'ভাঙনের মুখে সুরম্য নগর, সমৃদ্ধ জনপদ, বড়-বড় সভ্যতা কিছুই টেকে না কিন্তু টিকে থাকে মানুষ, তার সংগ্রাম, সর্বোপরি শ্রেণিসংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস।'[৫১] তবে নাট্যকার মামুনুর রশীদ এ নাটকে শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রেণিশোষণকে তাঁর নাটকের মৌল প্রেরণায় স্থাপন করে কেন্দ্রীয় সত্য যা আবিষ্কার করেন তা হচ্ছে– অন্যায়কে মোকাবেলা করতে হয় আঘাত দিয়ে। তার জন্য কাউকে না কাউকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এই নাটকে তেমনি চরিত্র সফুরা।'[৫২] কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক শাসনকাঠামোয় সফুরার মতো নারী, যে নিম্নবর্গের মধ্যে আরও নিম্নবর্গ[৫৩]– তার দ্বারা এরকম আচরণ বাস্তবসম্মত কি-না তা বিবেচ্য।

স্পষ্টতই নাটকগুলোর বিষয় নিম্নবর্গের মানুষের জীবন, তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। শোষিত-বঞ্চিত মানুষ যে একদিন বিদ্রোহ করে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত একটা সিদ্ধান্তকে উপস্থাপন করেন। ফলে নিম্নবর্গের জীবন তাঁর নাটকে একটা নির্দিষ্ট কাঠামোয় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। উচ্চবর্গের শোষণ এবং তার বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের প্রতিরোধ সংগ্রাম, কখনো বিজয়, কখনো পরাজয়– এই তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে বিশ্বজিৎ ঘোষের বক্তব্য হলো: 'ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি থাকলেও মামুনুর রশীদের নাটক বিষয়ভাবনা ও উপস্থাপনরীতিতে একধরনের পৌনঃপুনিকতায় আক্রান্ত– এ কথা স্বীকার করতেই হয়। তাঁর নাটকের প্রধান যারা মানুষ, তারা নিষ্পেষিত শোষিত মানুষ, সুদভোগী মহাজন, অসৎ মোড়ল, দালাল চেয়ারম্যান, দুর্বল দরিদ্রমানুষকে শোষণকারী পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী চক্র।'[৫৪]

মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিভাজিত সমাজের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বকে উপস্থাপন করতে গিয়ে মামুনুর রশীদ তাঁর নাটককে একটি নির্দিষ্ট ফর্মুলার মধ্যে বেঁধে ফেলেছেন। তাঁর তিনখানা নাটক পরপর দেখলেই বোঝা যায় ঐ একই সূত্রাবদ্ধতায় গতানুগতিক হয়ে পড়ছে তাঁর নাটকের বিষয় ও বিস্তার। তিনি গ্রামবাংলার শোষণ কিংবা কৃষক ও পল্লীর বিভিন্ন জীবিকার মানুষের জীবন ও প্রতিরোধের বিষয়কে একটা কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখতে চাইছেন। শোষিত, নিম্নবর্গের মানুষ অত্যাচারিত হতে হতে হঠাৎ করে জোট বাঁধে, এবং শোষকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়।[৫৫] বক্তব্যটির সত্যতা দেখা যায় *রাঢ়াং* (২০০৫) নাটকেও।

এ নাটকে মামুনুর রশীদ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সাঁওতালদের সংগ্রামী জীবনবাস্তবতা উপস্থাপন করেছেন। সাঁওতালদের ইতিহাস থেকে জানা যায়:

সাঁওতাল জাতি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ছোটনাগপুর, বীরভূম প্রভৃতি জেলা ও অঞ্চল অর্থাৎ উত্তর বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করত। এদের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, ভাষা আছে, সামাজিক প্রথা পদ্ধতি আছে। সাহিত্য আছে। যদিও ভদ্রলোকেরা তাদের জাতি হিসেবে মেনে নিতে রাজী নয়। তারা বৃটিশ উপনিবেশবাদী পণ্ডিতদের মতই 'উপজাতি' বলতে অভ্যস্ত। তারা মনে করে, উপজাতি মানে ছোট জাতি নীচু জাতি। ঔপনিবেশিক

Dhaka University Institutional Repository

শোষণে এই জাতি ছিল নিষ্পেষিত-অত্যাচারিত। এর বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ (বা তাদের ভাষায় হুল) করে। এই বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মেদিনীপুর, সিউরী, মহম্মদবাজার থানার গণপুর। বৃটিশ, জোতদার মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচার তাদেরকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করে। একসময়ে তারা জঙ্গল কেটে অমানুষিক পরিশ্রমে তৈরি করে আবাদী জমি। সেই জমিতে যখন ফসল ফলতে শুরু করলো তখন সে ফসলে সাঁওতালদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো না। সে ফসল জোতদার মহাজন, জমিদারদের ঘরে চলে যায়। প্রতিবাদ করলে তাদের ভাড়াটে বাহিনী পুলিশ ইত্যাদি নানা নামে নিপীড়কেরা এসে উপস্থিত হয়। শেষে কৃষকের হাতে আর কিছু থাকে না। তখন তারা বিদ্রোহের পথে পা বাড়াল।[৫৬]

এরকম আর্থ-সামজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক শোষণ থেকে মুক্তি আশায় '১৮৫৫ সনের ৩০ শে জুন রাত্রে সিধু কানুদের গ্রাম ভগনাডিহিতে ৪শো গ্রামের প্রতিনিধি ১০ হাজার সাঁওতালের এক জমায়েত হয়। এই জমায়েতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। আরো বলা হয়, সমস্ত খাজনা বন্ধ, প্রত্যেকেই যত খুশি জমি চাষ করতে পারবে, সমস্ত ঋণ বাতিল হবে। জমায়েত থেকে এই ফরমান জারি হয়। নেতারা বলেন যে, তাঁদেরকে নিজেদের সরকার কায়েম করতে হবে। শোষণ ও পীড়ন থেকে মুক্তি, জমি ও ফসলের উপর তাদের অধিকার চাই।'[৫৭] সিধু-কানুর নেতৃত্বে ওই বছরই ৩০ থেকে ৫০ হাজার লোকের সমন্বয়ে বিশাল এক গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। সরকারী বাহিনী ২৫ হাজার সাঁওতালকে হত্যা করে বিদ্রোহ দমনের নামে।[৫৮] ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশরা চলে গেলেও সাঁওতালদের জীবনব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। বরং বারবার তাদের ভূমি, সংস্কৃতি আধিপত্যবাদী শক্তির করাল গ্রাসে পতিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশভাগের অব্যবহিত পরে সংঘটিত নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ। ইলা মিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও নেতৃত্বে সংগঠিত এই বিদ্রোহের মূল চালিকা শক্তি ছিল সাঁওতাল কৃষকরাই।[৫৯] পাকিস্তান সরকারও বৃটিশ বাহিনীর মতো বিদ্রোহ দমনের নামে হত্যা করা শুরু করে। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশেও।

২০০০ সালে নওগাঁয় আলফ্রেড সোরেনের নেতৃত্বে ভূমির জন্য লড়াই ও আলফ্রেড সোরেনের আত্মত্যাগ মামুনুর রশীদকে নাটকটি রচনায় উদ্বুদ্ধ করে।[৬০] ঐ ঘটনার আলোকে নাট্যকার সাঁওতালদের জীবন-সংগ্রাম, সংস্কৃতি উপস্থাপন করেছেন। আমাদের আলোচ্য নাটকের কাহিনী শুরু হয় নাচোল বিদ্রোহ থেকে।

'একশো বছর থাকলাম তানোরে নাচোলে জমি তো হইলো না'[৬১]– সাঁওতালদের যাপিত জীবনে শেষ পর্যন্ত এই কথাটি চরম সত্য হয়ে ওঠে। তাই বিদ্রোহ করা ছাড়া তাদের আর কোনো পথ থাকে না। নাটকটিতে নাট্যকার এই সত্য ব্যক্ত করেছেন। নাচোলের সাঁওতালরা অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীদের অনেকে পুলিশের গুলিতে মারা যায়। আবার কেউ কেউ ধরা পড়ে জেল খাটে। সরকারী দমন-নিপীড়নের ভয়ে অবশিষ্ট সাঁওতালরা বাসভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। তাছাড়া রাণীমাও[৬২] দেশ ছেড়ে চলে গেছে। ফলে তারা আর সেখানে থাকার মতো কোনো আনন্দ, সাহস পায় না। শুরু হয় তাদের উদ্বাস্তু জীবন। কিন্তু প্রচলিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর রীতি-পদ্ধতি থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তারা নিজেরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাই তাদের উদ্বাস্তু জীবনের পথপ্রদর্শক হয় বাঙালি, হিন্দু জোতদার বিশ্বম্ভর। সাঁওতালদের সিদ্ধান্তের দোলাচলে সে-ই তাদের নতুন স্থানে যাওয়ার তাগাদা দেয়:

বিশ্বম্ভর: ট্রেন ফেল করলেই বিপদ, তোদের চাইতে আমার বিপদ বেশি। থানার দারোগা, পুলিশ, আনসার সবাইকেই মাল-কড়ি দেয়া হয়েছে দেদার। কিন্তু একটাই কথা পার হতে হবে রাত্তিরের মধ্যে। আমি আবার রাতের বেলায় চোখে মেখি কম। দেরি হইলেই সর্বনাশ। পুণ্য:
সব্বনাশ! হা হা সব্বনাশ– সব্বনাশের মধ্যে বসে আছি আর বলছে সব্বনাশ–
বিশ্বম্ভর: এ ছোড়ার মাথা খারাপ, ধুর। চল দেখি নাহলে আমি যাই। বারবার থানাপুলিশের সাথে হ্যাঙ্গামা করতে পারবো না। সব ক্ষ্যাপার দল।[৬৩]

সাঁওতালদের অন্য জায়গায় আবাস গড়ে দেয়ার পেছনে বিশ্বম্ভরের রয়েছে স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা। জোতদার থেকে জমিদার হওয়ার বাসনা তার চেতনায় বিদ্যমান। কিন্তু সাঁওতালদের চেতনায় তা ধরা পড়ে না। ফলে নিজস্ব বাড়ি, জায়গা-জমি চাষের আশায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা মহানন্দার পাড় ছেড়ে চলে আসে বলিহারের জমিদারের জমিতে। আবাস গাড়ে এখানে। দেশভাগের কারণে জমিদার তার ১২০০ একর সম্পত্তি ছেড়ে ইতোমধ্যে ভারতে স্থায়ী হয়েছে। ভারত বিভাজিত হয়েছিল ধর্মকেন্দ্রিক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। পাকিস্তান নামক দেশটির বেশির ভাগ মানুষ ধর্মীয় দিক থেকে ইসলামপন্থী। ফলে বিশ্বম্ভরের জমি দখল নেয়াটা সহজে মেনে নেয়নি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হাতেম। সে তাদের উচ্ছেদের চেষ্টা করে। কারণ একজন হিন্দুর এত জমি দখল তার পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব হয় না। দারোগার সঙ্গে তার সংলাপে বিষয়টি স্পষ্ট হয়:

হাতেম: তাহলে দেশ ভাগ করে কি লাভ হল? হিন্দুর সম্পত্তি যদি হিন্দুই নেয় তাহলে লাভটা কি হল? হিন্দুস্থান-পাকিস্তান করে কি হল?[৬৪]

নতুন দেশে কোনো সংকটের আশঙ্কা থাকতে পারে– এ বিষয়ও সাঁওতালরা ভাবে না। মূলত তাদের জীবন পরিচালিত হয় বিশ্বম্ভরের দ্বারা। কাগজে টিপসই দিয়ে সে তাদের জমি দেয়। তার কথা মতো সাঁওতালরা সেখানে ঘর তোলে। কিন্তু সেখানেও বাধা পায় হাতেমের লোক দফাদারের মাধ্যমে:

দফাদার: সব বাড়ি ভেঙে দেবো এখন–
লুনকু: এ তো বিশ্বম্ভরের জায়গা জমি– তোমরা কে?
দফাদার: আমরা আইনের লোক, প্রেসিডেন্ট বলে দিয়েছে, সরকারি হুকুম– হুকুম জারি করে গেলাম, তোমরা সূর্যাস্তের আগে জমিজমা ফেলে ঘরবাড়ি তুলে নিয়ে চলে যাবে– যাবে কিন্তু–[৬৫]

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কারণে সমাজে পুঁজির এক যাদুকরী ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। এই বস্তুর মোহনীয় ক্ষমতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা অনেকের পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। তার সর্বগ্রাসী চরিত্রের কারণে মানবতা, নীতিবোধ ভূলুণ্ঠিত হয়। ফলে হাতেমের অর্থনৈতিক ক্ষমতার কাছে পরাজিত হয় বিশ্বম্ভরের সাঁওতালদের স্থায়ী আবাস গড়ে তোলার পরিকল্পনা এবং নিজের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা। পুলিশ ঘুষের বিনিময়ে হাতেমের পক্ষে কাজ করে। ফলে আবার অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে সাঁওতালরা। কিন্তু নিজেরা কিছু করতে পারে না। বিশ্বম্ভরের মতো তার ভাইপো গদাই সাঁওতালদের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। উদ্বাস্তু এই জনগোষ্ঠীর স্থায়ী আবাস গড়ে তোলাকে কেন্দ্র করে সে কোনো ঝামেলায় জড়াতে চায় না। তাই কাকাকে নিষেধ করে সাঁওতালদের জমির মালিকানা নিয়ে প্রশাসন এবং হাতেমকে ঘাটাতে। জমির মালিকানাহীনতাই সাঁওতালদের জীবনের পরম সত্য বলে সে ধরে নিয়েছে–

গদাই: কবে কোন সাঁওতালের কাগজ হইছে বলো? ওদের কাগজ তো লাগে না– ওরা চাষবাস করে, ওরাও খায় আমরাও খাই– সেই ভাবেই চলে–[৬৬]

বিশম্ভর চেতনাগতভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণিসত্তাকে ধারণ করার ফলে নিজের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কাজেই সে বেশি আগ্রহী। ফলে 'জিততে হলে বুদ্ধি চাই, আপোষের বুদ্ধি'[৬৭]– গদাইয়ের এই মতে প্রলুব্ধ হয়ে স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সাথে বিশ্বম্ভর আর কোনো ঝামেলায় যায় না। শেষ পর্যন্ত সাঁওতালরা জমির কাগজ পায় না। এর মধ্যে ত্রিশ বছর পার হয়ে যায়। বিশ্বম্ভরের সব কিছু দেখাশোনা করে গদাই। ফলে আবার এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পতিত হয় সাঁওতাল জীবন। জমির মালিকানা তারা পায় না:

রবীন: জমির কি করলেন বাবু।
গদাই: জমি মানে?
রবীন: জমি-জমা তো চাষ করে চলেছি তিরিশ বছর হলো–

গদাই: হ্যা হলো–
রবীন: কি সব কথা ছিলো– কিছুই তো হল না–
গদাই: হয়নি কে কইলো? হচ্ছে– হচ্ছে– সব হবে–
রবীন: সব কিছু মুখে মুখে না হয়ে কাগজে কলমে হলে ভালো হয় না?
গদাই: ঠিক আছে বিষয়টা মাথায় নিলাম– এবার কাজ করতে দে–[৬৮]

আইনের কাছে কাগজের চেয়ে শ্রমের মূল্য বেশি নয়। ফলে সাঁওতালরা জমি চাষ করলেও মালিক থাকে গদাইয়ের মতো কাগজওয়ালারা। সাঁওতালদের লোভ দেখিয়ে জঙ্গলাকীর্ণ জমি চাষযোগ্য করে তোলে বিশ্বম্ভর, গদাইদের মতো মানুষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাঁওতালরা জমি পায় না। এক সময় তাদের ফসলেও ভাগ বসায় কাগুজে মালিক:

লুনকু: আমার ফসল কে যেন নিয়ে যায়–
পুণ্য: না বিরাম ভূমি সাফ করলাম, সাপের, পোকা-মাকড়ের কামড় খাইলাম তারপর শস্য বুনলাম আমাদের ক্ষেতে হাত দেয় কে?[৬৯]

কিন্তু আবারও তাদের এই জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয় গদাইয়ের কাগজ দেয়ার সম্মতিতে। সাঁওতালরা স্বভাবে সহজ-সরল। ফলে সহজে তারা সব বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের কারণে তারা বিশ্বম্ভরের কথায় চলে আসে। জমির মালিকানা পাওয়ার আশা দেখিয়ে মালিকরা তাদেরকে বছর বছর শোষণ করতে পারে। যখন তারা বঞ্চনা-শোষণ সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন তারা আবারো সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এর জন্য দরকার হয় দক্ষ নেতৃত্বের। এ নাটকে আলফ্রেড তাদের সম্মিলিত ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে নেতৃত্ব দেয়। গদাই সবাইকে কাগজের কথা বলে প্রতিবাদ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেও আলফ্রেডকে পারে না। সে এতদিনের শোষণ-প্রতারণার কথা সাঁওতালদের বোঝাতে সক্ষম হয়। আবার তারা অধিকার আদায় এবং এত দিনের শোষণ-বঞ্চনা, প্রতারণার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়। প্রশাসন বরাবরই ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা মানুষের পক্ষেই কাজ করে। তবে সেই সহায়তাও অনেক সময় নিম্নবর্গের আন্দোলনের সাফল্যকে দমিয়ে রাখতে পারে না। প্রান্তিক এই মানুষের সংগঠিত প্রতিরোধের মুখে সরকারি বাহিনীও পিছু হটতে পারে। আলোচ্য নাটকে সেই বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। আলফ্রেডের নেতৃত্বে সাঁওতালরা পুলিশকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং তারা ফসল ঘরে তোলে। কিন্তু আধিপত্যবাদী বাঙালি জোতদাররা এবার ভিন্ন পথ বেছে নেয়। দখলস্বত্ব আইনের কারণে জমির অধিকার হারাতে পারে ভেবে গদাই এবং হাতেমের মতো জোতদাররা হিংসার পথ বেছে নেয়। নবান্ন উৎসবে খেতে বসা সাঁওতালদের ওপর হামলে পড়ে তাদের পোষা গুণ্ডারা। নির্মমভাবে হত্যা করে আলফ্রেডকে।

নাট্যকার সাঁওতালদের সংগ্রামী চেতনার পাশাপাশি তাদের নিজস্ব জীবনধারা, সংস্কৃতিও উপস্থাপন করেছেন। মহুয়ার রস, হাড়িয়া ইত্যাদি পানীয় তাদের জীবন যাপনের প্রতিদিনের অংশ। প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিবিড়। তাই নতুন বাসস্থান ভীমপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার আগে তাদের মনে প্রশ্ন জাগে সেখানে মহুয়া, গাব, শাল, গজারি, সেগুন ইত্যাদি গাছ এবং জবা, চামেলী, চাঁপা, ধুতরা গন্ধরাজ এসব ফুল আছে কি-না। চিকিৎসার জন্য এখনো তারা জানগুরু তথা গুনীন-কবিরাজের ওপর নির্ভরশীল। জানগুরুও এই নির্ভরশীলতাকে পুঁজি করে স্বার্থ হাসিল করে। শ্যামলীর স্বামী জানকীচাঁদ জেলে। এই সুযোগে জানগুরু তাকে বিয়ে করতে চায়। শ্যামলী রাজি হয় না। অন্য সাঁওতালদের সমর্থন আদায়ের জন্য সে রাতে স্বপ্নের কথা বলে:

ধর্ম এসে বলে গেলো শ্যামলীর সোয়ামীর ফাঁসি হয়ে গেলো– ও আর ফিরবে না– আমি ওর সাথে সংসার করি–[৭০]

সাঁওতালরা জানগুরুর কথাকে সত্য বলে ধরে নেয়। কিন্তু শ্যামলী রাজি হয় না। বরং ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সবার ওপর। কিন্তু সেই ক্ষোভ কারো মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া করে না। এই অসহায়ত্ব শ্যামলীকে আত্মধ্বংসী করে তোলে। নিজের কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করতে চায় সে। শ্যামলীর এই অবস্থাটাও জানগুরু স্বার্থ হাসিলের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে। 'ওর উপর জানকীরাম ভর করলো'[৭১]– একথা রটিয়ে সমবেত সাঁওতালকে জানগুরু শ্যামলীকে বেধে ফেলতে বলে। সবাই তার কথা মতো কাজটি করতে উদ্যত হয়। কিন্তু বাধা দেয় পুণ্য। কারণ সে জানগুরুর চালাকি ধরে ফেলে:

জানগুরু: আগুন জ্বলছে ওর মনে, এ আগুন জ্বালায়ে দেবে সারা সাঁওতাল পাড়ায়। ওকে বেঁধে রাখতে হবে। ধর সবাই। ওকে বাঁচাতে হলে সাঁওতাল পাড়া বাঁচাতে হলে বেঁধে রাখতে হবে। (শ্যামলীকে বেঁধে ফেলে সবাই মিলে।জানগুরু হাসে। পুণ্য বুঝতে পারে বিষয়টা।)
পুণ্য: বুঝেছি, সব বুঝেছি– (বলে সে শ্যামলীর বাধন খুলে দেয়। অবাক হয় সবাই।) ওঠ যা ঘরে যা।
জানগুরু: এ তুই কি করলি পুণ্য, জানিস কি হবে এর পরিণাম?[৭২]

সাঁওতালরা জানগুরুকে মান্য করলেও সব সময় তার কথাকে ধ্রুব সত্য মনে করে না। ফলে পূণ্যের কাজে তারা বাধা দেয় না এবং সত্য জানার পর সবাই মিলে ক্ষেপে যায় জানগুরুর ওপর। নিজের চাওয়া পূরণ না হওয়ার ক্ষোভে জানগুরু স্বজাতির বিপক্ষে কাজ করা শুরু করে। সে সাঁওতালদের ঐক্যের খবর দিয়ে আধিপত্যবাদী, ক্ষমতালোভী বাঙালি জোতদারদের সজাগ করে দেয়। জানগুরুর এই বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিক নিম্নবর্গের সংকীর্ণ মনোবৃত্তিকে উপস্থাপন করে। তবে আলোচ্য নাটকে আমরা বেশির ভাগ সাঁওতালকে সহজ-সরল হিসেবেই দেখি। মিথ্যা তারা বলতে পারে না। তাদের কাছে দালিলিক জমির চেয়ে মুখের কথায় পাওয়া জমির মালিকানা কোনো অংশে কম নয়। তাই বিশ্বম্ভরের জমি দেয়ার কথাকে তারা সত্য বলে ধরে নেয়। প্রকৃতি তাদের জীবনঘনিষ্ঠ। প্রচলিত শাসনকাঠামো-সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, সভ্যতার সংস্পর্শে তারা আসেনি। ফলে আধুনিক জীবনের জটিলতা তাদের মধ্যে নেই। আলফ্রেডের কথায় :

স্যার সাঁওতাল তো কাগজ পত্র বোঝে না, শিক্ষা নাই, জমি চষে, কথায় কথায় জঙ্গলে জীবজন্তুর সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকে। সে তো প্রকৃতির সন্তান– এই ধরিত্রী মা তাকে খাওয়ায়– জগতের যখন শুরু তখন থেকে। সাঁওতালের কাগজ নেই, সি এস. আর এস এগুলো তো বোঝে না সাঁওতাল–[৭৩]

এই বক্তব্য তাদের সারল্য এবং সমকালীন জীবন-জগৎ থেকে পিছিয়ে পড়ারই স্বাক্ষর বহন করে। যা বিশ্বম্ভর-গদাইয়ের মতো শোষকের শোষণ-পথকে সহজ করে দেয়। নিম্নবর্গ তথা সাঁওতালদের প্রতিরোধ, সংগ্রাম তুলে ধরাই নাট্যকারের অভীষ্ট। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নাট্যকার মামুনুর রশীদ শ্রেণিবৈষম্য এবং শ্রেণিশোষণকে তাঁর নাটকের মৌল প্রেরণায় স্থাপন করে কেন্দ্রীয় সত্য যা আবিষ্কার করেন তা হচ্ছে– অন্যায়কে মোকাবেলা করতে হয় আঘাত দিয়ে। তার জন্য কাউকে না কাউকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।[৭৪] তবে এদিক থেকে *রাষ্ট্র বনাম* (১৯৯৩) এবং *সংক্রান্তি* (২০০১) নাটক দু'টি আলাদা। নাটক দু'টিতে তিনি প্রতিবাদী চেতনা প্রকাশের জন্য আবেগের আতিশয্যে ভেসে যাননি। অন্য নাটকগুলোর মতো নিম্নবর্গের তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ, সংগ্রাম দেখানো নাট্যকারের উদ্দেশ্য নয়।

সংক্রান্তি নাটকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন নিম্নবর্গের বঞ্চিত জীবনকে। গ্রামের জোতদার, মহাজনরা তাদের স্বার্থে নিম্নবর্গের মানুষকে ব্যবহার করে। জীবন ধারণের তাগিদে এটা মেনে নেয়া ছাড়া নিম্নবর্গের আর কোনো উপায় থাকে না। সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো কর্মকাণ্ডও তারা সব সময় নিতে পারে না। ফলে ব্যক্তিক জায়গা থেকে যার যার মতো বাঁচতে হয় তাদের। আত্মিক উপলব্ধির জায়গা থেকে এক সময় নিজের জীবন বঞ্চনাই সত্য হয়ে দাঁড়ায় তার কাছে।

সংযাত্রা বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিং অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এটিকে লালন এবং ধারণ করে নিম্নবর্গের মানুষ। বড় বাসালিয়া গ্রামের গরিব কৃষক গফুর আলী সঙ দলের ম্যানেজার ও পরিচালক। বিভিন্ন অনুষ্ঠান-উৎসবে সঙ পরিবেশন করে সে এবং তার দলের লালে, আকবর, সফরসহ কয়েক জন জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। ঐ গ্রামেরই জোতদার তালুকদার এবং মোমরেজ খাঁ। ক্ষমতাগত দিক থেকে দুজনের অবস্থান প্রায় সমপর্যায়ে বলে সব সময় তারা একে অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিত। নিজের থেকে অন্যকে ছোট প্রমাণ করার চেষ্টা তাই তাদের চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। গফুর সকাল থেকে নতুন সঙ পালা তৈরির জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু বার বার ব্যর্থ হয়। সত্যিকার শিল্পী সে। একেবারে নতুন একটি বিষয়কে সে সঙে তুলে ধরতে চায়। কিন্তু পছন্দ মতো বিষয় তার ভাবনায় আসে না। এ রকম একটি মুহূর্তে মোমরেজ খাঁ তার মেয়ের বিয়েতে গফুর সঙ উপস্থাপন করার জন্য বলে। যার বিষয় হবে তালুকদার। তালুকদার জোতদার, গ্রামে যথেষ্ট ক্ষমতাবান। ফলে তাকে নিয়ে স্পষ্ট ভাষায় সঙ বাধতে গফুর ইতস্তত করে। নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করে তার পক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বায়না হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে শেষ পর্যন্ত বিষয়টা মেনে নেয়।

গফুর: এলা কন কোন লাইনে যাই? আমরা আগে একটা সঙ করছি খাঁ সাব, হঠাস বাবু– হঠাস বাবু লাগাইয়া দেই।
মোমরেজ: নামডা বদলা, হঠাস তালুকদার।
গফুর: মাইরা তকতা বানাইয়া ফালাইয়া– দিব, অবো না।
মোমরেজ: তগো কোনো সাহস নাই, তগো দিয়া কাম অইবো না– তরা যা, আমি কাঞ্চনপুর থিকাই দল আনামু।[৭৫]

আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করে সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি। আর এই কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে উচ্চবর্গ। অর্থনৈতিকভাবে গফুর স্বাবলম্বী নয় বলে সে তার ইচ্ছে মতো বিষয় নিয়ে সঙ বাধতে পারে না। তাকে বায়নাদারের চাওয়া অনুযায়ীই কাজ করতে হয়। তবে শিল্পীসত্তাকে হৃদয়ে ধারণ করার কারণে সামাজিক অসংগতি, অন্যায় অবিচার তার কাহিনীতে স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে। তালুকদার আগের বউকে তালাক দিয়ে পরের বউয়ের বাড়ি ঘরজামাই থাকে। আর মোমরেজ খাঁ নদী খননের কন্টাকটরি নিয়েও কোনো কাজ করে নাই। এই সত্য দুটি গফুর তার শৈল্পিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে প্রকাশ করে। ফলে দু'পক্ষই ক্ষেপে যায় দলের ওপর।

তালুকদার: এই বার মোমরেজ খাঁ নাল সুতা বাইর কইরা ছাড়বো আমি তো পরে।[৭৬]

উচ্চবর্গ স্বার্থগত কারণে একতাবদ্ধ। তাই তালুকদার তাদের 'আমি আছি না তগো নগে– যেহানে সত্য আছে, সেহানে তালুকদার আছে'–[৭৭] বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও থাকে না। বরং নিজের সত্যটি সঙে প্রকাশ করায় মোমরেজ খাঁর সঙ্গে সে একজোট হয়।

চারিত্রিকভাবে সহজ-সরল এবং চিন্তা-চেতনায় জটিলতা-কূটিলতা কম বলে সঙের কাহিনী শুনে কেউ যে ক্ষেপে যেতে পারে এই ভাবনা গফুর বা তার দলের কারোর মাথায় আসে না। আবার প্রতিবাদ করার মতো উৎসাহ-সাহসও তারা পায় না। তাই মোমরেজ খাঁ তার অপমানের প্রতিশোধ হিসেবে সঙদলের বাদ্যযন্ত্র কেড়ে নিলে গফুর, লালে আকবর সফররা শুধু অবাক বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েই থাকে:

(মোমরেজ খাঁর লোকেরা সঙ দলের সবার কাছ থেকে জোর করে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যায়। সবাই অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে।)
গফুর: বুঝলাম না আমাগো কি দোষ?[৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নবর্গের প্রতিবাদ স্বতঃস্ফূর্ত হয় শত্রু নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত হলে কিংবা অত্যাচারিত হতে হতে নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিপন্ন হলে। গফুর মোমরেজ খাঁ বা তালুকদারকে শত্রু মনে করে না। বরং এই দুজনের দয়ায় যেন তার এবং দলের বেঁচে থাকা। ফলে জিনিসগুলো ফিরে পেতে প্রতিবাদ করার চেয়ে মাফ চাওয়াকেই তারা উচিত মনে করে। কিন্তু এতে যখন মোমরেজ খাঁর মন গলে না তখন তারা যায় এলাকার জনপ্রতিনিধি আব্দুল কাদেরের কাছে। পুঁজি ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় অর্থ এবং ভোটার সংখ্যাই নির্ধারণ করে শাসকের সুদৃষ্টি কত দ্রুত, কার ওপর পড়বে। যার অধীনে ভোটার বেশি সেই বেশি সুবিধাভোগ করে শাসকের দ্বারা। সংখ্যাগত দিক থেকে নিম্নবর্গ বেশি হলেও চেতনার পরনির্ভরশীলতা এবং একাত্মবোধের অভাবের কারণে তারা বিচ্ছিন্ন। মাঝে মাঝে তাদের সমর্থন হয় অর্থনৈতিক নির্ভরতাকেন্দ্রিক। একারণে সঙ গেয়ে শত শত লোককে আনন্দ দিলেও সংখ্যায় তার হাতে থাকে মাত্র ১০টা ভোট। আর মোমরেজ খাঁ এবং তালুকদারের মতো জোতদারদের থাকে যথাক্রমে ১২০ ও ৮৬ ভোট। ফলে জনপ্রতিনিধি কাদেরের গফুরের মতো মানুষদের জন্য কিছু করার ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তার আর সমস্যার সমাধান করা হয় না। নিম্নবর্গের মানুষ ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা মানুষের প্রতি সমীহ ভাব পোষণ করে। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও কাদের গফুরের সমস্যার সমাধান করতে চাইলে তারা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ গফুর তার বাড়িতে নেতাকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে। এর মধ্য দিয়ে গফুর তথা নিম্নবর্গের অতিথিপরায়ণতা, সরলতা এবং মানুষের প্রতি বিশ্বস্ততাই প্রকাশ পায়। মানুষের কথার প্রতি গফুরের বিশ্বাস আছে। তাই সংসদ সদস্য কাদেরের সমস্যা সমাধান করার প্রতিশ্রুতিকেই সে সত্য মনে করে। সেই আনন্দে নিজের ডিমপাড়া মুরগিটাও নেতার আগমন উপলক্ষে কেটে দেয়। গ্রামের জোতদাররা নিজের ক্ষমতাকে জাহির করে আনন্দ লাভ করে। তার কথা মেনে না চললে গরিব কৃষকদের নানাভাবে হেনস্তা হতে হয়। এই বেশিষ্ট্য মোমরেজ খাঁর মধ্যেও বিদ্যমান। সঙের মধ্যে তাকে অপমান করায় বাদ্যযন্ত্র কেড়ে নেয়ার পর গফুরের ক্ষেতে পানি দেয়াও বন্ধ করে দেয় সে। কিছুদিন পর গফুরের ক্ষেতে পানি দিলেও তার একমাত্র গাভীকে কৌশলে বিষপ্রয়োগ করে মেরে ফেলে মোমরেজ খাঁ। জোতদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর শক্তি গফুরের নেই। তাই ক্ষোভ ব্যক্ত করে তার স্ত্রী এবং দলের সদস্যদের ওপর।

নিম্নবর্গের সম্পদ, সম্পত্তি, জিনিসপত্র উচ্চবর্গের মতো অঢেল নয়। তাই অধিকারভুক্ত জিনিসের প্রতি তাদের মায়া থাকে বেশি। গাভী ও মুরগির প্রতি গফুরের স্ত্রী বেদানার মমতা-ভালোবাসা, গুরুর কাছ থেকে পাওয়া ভাঙাচোরা কর্নেট বাঁশির প্রতি লালে মিয়ার ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সেই বৈশিষ্ট্যই প্রতিফলিত হয় । বাঁশিটি ফিরে পাওয়ার জন্য লালে ছুটে যায় এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। সেটি ভাঙা পেয়ে তার সমস্ত রাগ পড়ে গ্রামবাসীর ওপর। বাঁশি বাজিয়ে সে গ্রামের লোকজনকে অতিষ্ঠ করে তোলে:

জনৈক: ভাই বন্ধ কর, বন্ধ কর তর কর্নেট বাজানি, সারা রাইত কেউরে ঘুমাইতে দেস নাই।
লালে: ক্যান ঘুমাইবি? শালা আমার লগে তরা বেঈমানি করছস না? এহন কোন শালারে আমি ঘুমাইতে দিমু না।[৭৯]

সংক্রান্তি নাটকে সামষ্টিক ক্ষোভ প্রকাশ না পেলেও নাট্যকার নিম্নবর্গের এই ব্যক্তিক ক্ষোভটা তুলে ধরেছেন সফলভাবেই। গফুর, আকবর, সফর জানে মোমরেজ খাঁ-ই তাদের ক্ষতির মূলে। কিন্তু তারা কোনো সমাধান করতে পারে না। শুধু দেখে যায় একে একে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তাদের অবলম্বনটুকু। শুধু শ্রেণিগত অবস্থানের কারণেই তারা এই ধ্বংসকে রোধ করতে পারে না।

রাষ্ট্র বনাম নাটকে মামুনুর রশীদ তুলে ধরেছেন নিম্নবর্গের ওপর রাষ্ট্রের শোষণ, প্রতারণাকে। ধনতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় উচ্চবর্গের সুবিধানুযায়ী পরিচালিত হয় রাষ্ট্র। একারণে সর্ববৃহৎ এই প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ড বরাবরই নিম্নবর্গের বিপক্ষে। আজিজল অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান হওয়ায়

তার কথামতোই কাজ করে প্রশাসন। পারিবারিক শত্রুতার জের ধরে পিতৃহত্যার সব দোষ সে চাপায় ফকির বংশের ওপর। তার অর্থনৈতিক ক্ষমতার কাছে নতি স্বীকার করে পুলিশ, মোক্তার, জজ। তাই কোনো দোষ না করেও শাস্তি ভোগ করতে হয় আসমত, তেজারত, জুলমত, সমিরণ বেওয়াকে। উচ্চবর্গের স্বার্থের কাছে বলি হয় তাদের জীবনের স্বপ্ন, আহ্লাদ।

অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে নিম্নবর্গের কোনো কোনো ব্যক্তির মধ্যে লোভী মানসিকতা প্রবল হতে পারে। ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য কেউ কেউ স্বশ্রেণির মানুষের ক্ষতিও করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজটির পরিণাম তাকে অনুতপ্ত করে তোলে। এ নাটকে আহাদি চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিষয়টি প্রকাশ পায়। সামান্য পাঁচটা বিড়ির জন্য সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় জুলমত, তেজারত, আজমতের বিপক্ষে। কিন্তু পরবর্তীকালে সে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়:

আহাদি: (এতক্ষণ বহু কষ্টে কান্না চাপা ছিলো আর পারে না, কেঁদে দেয়) মুই একটাও মিছা কতা কওছো নারে, মোক পাঁচটা বিড়ি দিছে, মুই তাও কওছো বিড়িটা নিয়া যা জেলখানায় বসি খাবু।[৮০]

সব মিলিয়ে বলা যায়, প্রতিরোধ, বিদ্রোহ, প্রতিবাদের অদম্য তাগিদ নয়, উচ্চবর্গের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্বের কারণে নিম্নবর্গের পরনির্ভরশীলতা, অসহায়ত্ব, জীবনের অনিশ্চয়তাকে তুলে ধরেছেন এ নাটকে।

মামুনুর রশীদের নাটকে নিম্নবর্গের মানুষ প্রতিরোধ-চেতনাসম্পন্ন, অধিকার আদায়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। এটা সত্য যে, নিম্নবর্গীয় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে একতাবদ্ধ হয়; উচ্চবর্গের শোষণ, অত্যাচার-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধে ঝাপিয়ে পড়ে। কিন্তু উচ্চবর্গের ক্ষমতা, শক্তির কাছে তা যথেষ্ট কি-না, মামুনুর রশীদ তার নাটকে এ নিয়ে কোনো সংশয় প্রকাশ করেননি। কিংবা নিম্নবর্গের সংগঠিত শক্তি কতদিন একতাবদ্ধ থাকতে পারে সেটিও প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ সাময়িক আবেগের বশে তারা সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুললেও সুচিন্তিত এবং যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে তাদের সব প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই বিষয়টি মামুনুর রশীদের নাটকে অনুপস্থিত। তাছাড়া তাঁর নাটকে শোষিত মানুষের জেগে ওঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে একগুঁয়ে, সরল বোবা প্রতিবন্ধী, পাগলাটে কোনো মানুষ। এদের ওপর নির্যাতন কখনো নিম্নবর্গের মানুষকে একতাবদ্ধ করেছে আবার কখনো আক্রান্ত ব্যক্তিই প্রতিরোধ, প্রতিশোধের জন্য একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বিচারে প্রান্তেরও প্রান্তে এইসব মানুষের অবস্থান। ফলে নিম্নবর্গের প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই সব চরিত্র বাস্তবে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে, তা বিবেচনাসাপেক্ষ। আর একটি বিষয় উল্লেখ্য, মামুনুর রশীদের নাটকে উচ্চবর্গ, শোষক, অত্যাচারী চরিত্রের কেউ কেউ নিম্নবর্গ, শোষিত শ্রেণি থেকে উঠে আসা।[৮১] ফলে তাদের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গ খুব দ্রুত প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠবে কি-না, নাট্যকার সেই ভাবনাটিও এড়িয়ে গেছেন। অনস্বীকার্য যে, মামুনুর রশীদের নাটকে শ্রেণিদ্বন্দ্ব স্পষ্ট। মার্কসবাদে দৃঢ় বিশ্বাস থাকার কারণে তাঁর নাটকের বক্তব্যও বলিষ্ঠ;[৮২] কিন্তু বিশ্বাস যে মাঝে মাঝে যুক্তিকে এড়িয়ে যায়– তার প্রমাণও দুর্লভ নয়।[৮৩]

রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, দর্শন– জীবনবোধ ও চেতনার বিবর্তনে ভূমিকা রাখা অনিবার্য এসব বিষয়কে কেন্দ্রাবদ্ধ রাখার কূটনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় যে চেষ্টা বর্তমান বৈশ্বিক-দৈশিক প্রেক্ষাপটে পরিলক্ষিত হয়, সেলিম আল দীনের (১৯৪৯- ২০০৮) শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলো তার বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ। তাঁর নাট্য-পরিক্রমা মূলত স্ব-জাতির শেকড়ের অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া।[৮৪] সাহিত্যিকের চোখে কোনো জীবনই তুচ্ছ নয়। যেখানে সচরাচর কেউ আলো ফেলে না, দেখে না সেখানকার আলো-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা মানুষের জীবন– সেই মানুষের অন্তর্ভাবনা, দার্শনিক অভীক্ষা, জীবন বিশ্লেষণও হয়ে উঠতে পারে নাটকের মূলবিন্দু; তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বোধের প্রকাশ তুলে ধরতে পারে স্রষ্টার মুন্সিয়ানা– এই

সত্যটি প্রমাণিত হয় তাঁর সৃষ্টির মহাকাব্যিক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। স্পষ্ট এবং সচেতনভাবে তিনি তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলোতে রূপায়ণ করেছেন কেন্দ্রীয় দৃষ্টিতে না-দেখা সেই সব মানুষের জীবন, দর্শন, চেতনার রূপান্তর। প্রচলিত নিয়ম না-মেনে, প্রথাগত বিষয়ের বাইরে গিয়ে কেউ যখন লেখেন এবং সেটি প্রতিষ্ঠা করেন; তবে কোনো রাজনৈতিক চেতনা ছাড়াই সেটি হতে পারে একটা বিদ্রোহ। সেলিম আল দীনের নাটকে আমরা সেই বিদ্রোহই খুঁজে পাই। আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নাট্যকার কোনো না কোনো নাট্যদলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। তিনিও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। বংলাদেশের প্রধান নাট্যদলের একটি *ঢাকা থিয়েটার*-এর সঙ্গে ছিল তাঁর আমৃত্যু সম্পর্ক। নাটকের বিষয় সম্পর্কে দলটি বক্তব্য হলো:

বাংলাদেশ একটি সংগ্রাম ক্ষুব্ধ অকুতোভয় জনপদের নাম। যুদ্ধ ঝড় জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে এই জনপদ সমুন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রজ্জ্বলিত করেছে তার সামুদ্রিক দুই চোখে। এই দেশ, তার ইতিহাস, সংগ্রাম, সংস্কৃতি সব কিছুকে আমরা সম্মান করি। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, ধরলার কূলে কূলে নামহীন গোত্রহীন মানুষের সংগ্রামী জীবন আমাদের নাটকের বিষয়বস্তু।[৮৫]

ঢাকা থিয়েটার-এর এই প্রতিপাদ্য বক্তব্যের সাথে সেলিম আল দীনের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলোর বিষয়গত মিল লক্ষ করা যায় । তিনি যেসব নাটক রচনা করেছেন তা যেন ঢাকা থিয়েটার-এর এই বক্তব্যকে সামনে রেখে।[৮৬] স্বাভাবিকভাবে তাই সেলিম আল দীন নাটকে রূপায়িত করেছেন আধিপত্যহীন, কেন্দ্রের দৃষ্টিতে না-দেখা সেই সব নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন। তাঁর নাট্যচেতনা আবহমান বাংলা জনপদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্পর্শে ছিল ঋদ্ধ। সম্ভবত এ কারণেই কোনো-না কোনোভাবে তাঁর নাটকে বাংলার পশ্চাদপদ তথা অন্ত্যজ মানুষের জীবন-কথাই প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে বেশির ভাগ নাট্যকারের মতোই তাঁর নাট্যজীবনের শুরুর নাটকগুলোতে আর্থ-সামাজিক সমস্যাই পরিলক্ষিত হয়। 'সত্তরের দশকে অর্থাৎ প্রথম পর্বের নাটকে সেলিম স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যা উপস্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন।'[৮৭] এই সময়ে রচিত অধিকাংশ নাটকে তিনি উপস্থাপন করেছেন শহর জীবনের ছবি। *সর্প বিষয়ক গল্প* (১৯৭৩), *জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন* (১৯৭৩), *এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা* (১৯৭৩), *সংবাদ কার্টুন* (১৯৭৪), *মুনতাসীর*(১৯৭৬) ইত্যাদি নাটক স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক নৈরাজ্য ও সংকটেরই পরিচয় বহন করে। ফলে এসব নাটকে স্পষ্টভাবে কোনো নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনচিত্র পাওয়া যায় না। *জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন*-এ ফকিরের কান্না, বেকারের চিৎকার, ক্ষুধার্তের মিছিল, প্রকৃতার্থে স্বাধীন বাংলাদেশের তৎকালীন আর্থ-সামজিক প্রতিচ্ছবি। বলা যায়, শহরকেন্দ্রিক বিষয়-অন্তর্গত নাটকে তিনি নিম্নবর্গের জীবন উপস্থাপন করেননি; সেখানে মূলত সময়কেই ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু শহর ছেড়ে যখন তিনি গ্রামকে নাটকের বিষয় করলেন তখন যেন অনিবার্যভাবেই তাঁর নাটকের চরিত্র হিসেবে স্থান পেল বিচিত্র ধরনের নিম্নবর্গের মানুষ।

এক্ষেত্রে *করিম বাওয়ালীর শত্রু অথবা মূল মুখ দেখা* (১৯৭৩) নাটকের কথা প্রথমেই বলতে হয়। এই নাটকে প্রথম বারের মতো প্রান্তিক জনসমাজ ও তাদের জীবনের গল্পচিত্র উপস্থাপন করেছেন সেলিম আল দীন।[৮৮] *করিম বাওয়ালীর শত্রু অথবা মূল মুখ দেখা* নাটক সম্পর্কে নাট্যকার বলেছেন: 'জীবনব্যাপী সংগ্রাম শেষে শত্রুর জীবনকে তাড়িয়ে মানুষ কী পায়? এই অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে লেখা এই নাটক।'[৮৯] সুন্দরবন অঞ্চলের করিম নামের এক বাওয়ালীর বেঁচে থাকার সংগ্রাম নাটকের মুখ্য বিষয়। এর পাশাপাশি নাট্যকার সামাজিক কুসংস্কারকেও তুলে এনেছেন। তবে নাটকটির পরিণতি নাট্যকারের বিষয়গত বক্তব্যকে শেষ পর্যন্ত দুর্বোধ্য করে তোলে। নাটকে দেখা যায়, "শিক্ষা ও মেজাজে আদিম" করিমের পেশা মৌমাছির চাক থেকে মধু সংগ্রহ করা। কিন্তু তার জীবিকার উপায় ক্রমশ সংকটাপন্ন। কারণ একশ্রেণির মানুষ সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য সুন্দরবনের বৃক্ষ নিধন করে চলেছে। কোনো উপায় না পেয়ে মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে তাকে ঋণ নিতে হয়। কিন্তু টাকা শোধ

Dhaka University Institutional Repository

করারও কোনো পথ সে পায় না। প্রায়ই মহাজন এসে টাকার তাগাদা দেয়। করিম তার পিতৃপেশা ত্যাগ করতে চায় না। স্বকীয় ঐতিহ্যের প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল বলে পূর্বপুরুষের পেশা সংরক্ষণ করাকে তার দায়িত্ব মনে করে। আবার অর্থনৈতিক দৈন্যদশা জীবন সম্পর্কে তার তীক্ষ্ণ বোধ অর্জনের অন্তরায়। জগৎ-সংসারের বহমান স্বার্থ চিন্তায় সে উদ্বেলিত নয়। নৈমিত্তিক অভাবকে অর্জন দ্বারা জয় করলেও এই সত্য সে উপলব্ধি করতে পারে না যে, ঐতিহ্য হিসেবে অতীতের অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণেকে আকড়ে ধরে থাকলে উন্নততর অর্থনৈতিক জীবনব্যবস্থার পথে তা হবে প্রধান অন্তরায়।[৯০] জীবন সম্পর্কে এই বোধ না থাকার ফলে প্রচলিত পরিবর্তনকে করিম সহজে মেনে নিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার তাগিদে অনেক দুঃখ নিয়ে এত দিনের পেশাগত অবলম্বন সুন্দরবন ও স্ত্রী পাবদাকে ছেড়ে শহরে যায় কাজের আশায়। কাজ পায়ও। কিন্তু এর মধ্যে তার স্ত্রী হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এই মৃত্যু করিমের যাপিত জীবনের বঞ্চনাকে ক্ষোভে পরিণত করে। তার সামনে তখন ছায়ামূর্তি হয়ে দেখা দেয় মহাজন, ঠিকাদার, সাপ, বাঘ, রোগ। এগুলো তার শত্রু, এদেরকে সে তাড়িয়ে বেড়ায়। এদের বিরুদ্ধেই তার বেঁচে থাকার সংগ্রাম। ফলে প্রিয়জনের মৃত্যুতে শত্রুদের প্রতি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ অবচেতনে ঘটতে পারে। কিন্তু সে তার স্ত্রীর ছায়ামূর্তিও দেখে। ফলে মৃত্যুর আগে করিমের ছায়ামূর্তিগুলো দেখার কারণ দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত কলেরায় সে মারা যায়। তার মৃত্যুর সময় সানকিওয়ালার সংলাপ নাটকটির বক্তব্যকে আরো অস্পষ্ট করে তোলে:

পানি। আমার কাছে সানকি সেরেফ সানকি?– *করিম একবার সমস্ত শরীর টান করে নিথর হয়ে যায়। সানকিওয়লা তাকে পরীক্ষা করে।* হে খদ্দর সুবিদার না। তয় সানকিতেই পানি দিমু তোমারে।[৯১]

মৃত্যুর আগে করিম বাওয়ালীর হঠাৎ ক্ষেপাটে হয়ে ওঠা, ক্ষুধার জ্বালা নিয়ে বিকারগ্রস্তের মতো নিজের মৃত স্ত্রীর ছায়ামূর্তিসহ বিভিন্ন ছায়ামূর্তিকে লক্ষ করে হম্বিতম্বি করা, দীর্ঘক্ষণ একটানা অসংলগ্ন সংলাপ বলে যাওয়া, বর্শা নিক্ষেপে ছায়ামূর্তির পালিয়ে যাওয়া, বাওয়ালীর চারপাশে প্রদীপ হাতে চার ছায়ামূর্তির ঘুরে বেড়ানো দর্শকের কী বোঝাতে চায় তা দুর্বোধ্যই হয়ে থাকে।[৯২] তবে নাট্যকার অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন– সুন্দরবনের সবুজ বৃক্ষপত্র যাদের চোখের জ্যোতি বাড়ায়, ফুলের নির্যাস যাদের জীবিকার উপায়, তাদের লড়াই করতে হয় হিংস্র বাঘের সঙ্গে। কিন্তু জীবনে তারা পরাজিত, হতমান, নিরন্ন। তাদের শত্রু রহমত মহাজনের মতো সামন্ত-শোষক এবং আদিম বিশ্বাস-সংস্কার।[৯৩] এই সত্য তারা উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে বার বার তাদের এসবের কাছে পরাজিত হতে হয় ।

নিম্নবর্গের মানুষের জীবনের প্রতিফলন পাওয়া যায় *আতর আলীদের নীলাভ পাট* (১৯৭৫) নাটকেও। এতে নাট্যকার আতর আলীর মতো পাট-চাষীদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, বিশ্বাস-সংস্কারের পাশাপাশি তাদের ওপর মহাজনের শোষণের চিত্রটিও তুলে ধরেছেন।[৯৪] *করিম বাওয়ালীর শত্রু অথবা মূল মুখ দেখা* নাটকের পর সেলিম আল দীন দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত আতর আলীর মতো কৃষকের মধ্য দিয়ে বাংলার কৃষক সমাজের বেদনাদীর্ণ প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করেছেন। এ নাটকে তার প্রত্যক্ষণের বিষয় কৃষক শ্রেণির জীবনসংগ্রাম– তাদের নীলাভ মুখের অমলিন রেখাময় ভাঁজে হতাশা-পীড়ন-জুলুম অত্যাচারের গভীরতা।[৯৫] এ থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে নাট্যকার কৃষকের সংগঠিত হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করেন। তবে নিম্নবর্গের বোধের অপরিপক্কতার কারণে কৃষক-ঐক্যের ব্যর্থতার বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেন।

আতর বাংলার কৃষক সমাজের প্রতিনিধি। অসুস্থ, মৃত্যুশয্যায় শায়িত সে। স্ত্রীও তার প্রতি অনাসক্তা। এ কারণে অন্য কৃষকরা আতরের প্রতি সহমর্মী। বিছানায় শুয়ে সে বারান্দায় স্তূপীকৃত সাদা ধবধবে পাট দেখে আর স্বপ্ন রচনা করে। কিন্তু তা আর বাস্তব-রূপ পায় না। মহাজন, মুনশীর মতো শোষকের

কারণে আতর আলীর জীবনের কোনো পরিবর্তন হয় না। নাটকটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার বাংলার প্রান্তিক কৃষকের শোষিত জীবনের চিরন্তনতাকে চিত্র তুলে ধরেছেন।

কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল পাট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে তার অধিকার নেই। জমিতে থাকলে তার আর তুললে পরে মহাজনের।[৯৬] এই কষ্ট তাদের সারা জীবনের। যে মহাজনকে তারা চেনে না, জানে না– সেই হয়ে যায় তার কষ্টে অর্জিত ফসলের মালিক। সরকার নির্ধারিত মূল্যে খোলা বাজারে চাষিরা পাট বিক্রি করতে চায়। কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগী মুনশী তার নির্ধারিত মূল্যে মহাজনের কাছে পাট বিক্রির জন্য চাপ প্রয়োগ করে। কম মূল্যে কৃষকরা পাট বিক্রি করতে রাজি হয় না। এরপর মুনশী গ্রামের মাতবরের সহযোগিতায় কৃষকদের ওপর অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগ করে। এর বিরুদ্ধে কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই কৃষকরা সংগঠিত হয়। তবে এই একতা সত্ত্বেও মুনশীর সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন তারা করতে পারে না। কৃষকরা আক্রমণ করার পূর্বেই মুনশী তার গুণ্ডাপাণ্ডা দিয়ে কয়েক কৃষককে আহত করে। মহাজন, মাতবর, মুনশীর শক্তির বিরুদ্ধে কৃষকদের এই প্রতিরোধ শেষ পর্যন্ত কোনো কাজে আসে না। মহাজনের কাছে পাটের চেয়েও কৃষকের জীবন তুচ্ছ। তাই নাটকের শেষে মহাজনের লোক মুনশীর কাছে আতরের লাশের চেয়ে পাটের ওজন হিসাব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিষয়টি সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার:

আগন্তুক।– গন্ধ টের পাই হুজুর– বদ গন্ধ। *হঠাৎ মৃত আতরকে লক্ষ্য করে*– আঁই মালিক– আতর না ইটা।
মুনশী। কি করতিছে। পাট পাহারা দেয়। *এগিয়ে যেতে যেতে* হে হে হে। পাট পাহারা দেয়।
আগন্তুক। *তাকে তুলতে গিয়ে*– আঁই– গন্ধ হুজুর– ওয়াক থু।
মুনশী। *পরীক্ষা করে* আল্লা মালিক। অর মউত হইছে। ইন্নালিল্লাহ পড়ছোস।
আগন্তুক। না হুজুর।
মুনশী। পড়।
আগুন্তুক। *মনে মনে পড়ে*– কিন্তুক হুজুর গন্ধে পেটের ভাত মাথায় উঠতি চায়।
মুনশী। আরে বেওকুফ।– আমরা পাট কিনতি আইছি।– হ আতরের নয় গন্ধ– কিন্তুক পাট তো গন্ধ না।[৯৭]

নিম্নবর্গের কৃষকের আন্দোলন বা তাদের সংগঠিত হওয়া সাময়িকভাবে কোনো মহাজন বা মুনশীর মতো কোনো মধ্যস্বত্বভোগীদের বেকায়দায় ফেললেও আদতে বড় কোনো পরিবর্তন তারা আনতে পারে না। এই বিষয়টি নাটকের কাহিনী ও পরিণতিতে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। 'আতর আলীর মতো কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য কোনো দিন পায় না। নিজের সম্পদ সম্পত্তি সম্ভ্রম স্বপ্ন ক্রমাগত লুট হতে থাকে। তাদের সম্পদ চুরি করেই জন্ম নেয় পুঁজিপতি মহাজন, শিল্পপতি বণিক। সেলিম আল দীন সামন্ত অর্থনীতির অবক্ষয়িত রূপের মধ্যে অদৃশ্য মহাজনের যাদুপুরীর অস্তিত্ব দেখিয়েছেন কৃষকশ্রেণিকে। যারা কোনো দিন মহাজনকে দেখে নাই– দেখেছে তাদের অনুচরদের হিংস্র শোষণশক্তি। সেই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধও ফতোয়াবাজ, ভূততাড়ানো, জ্বিন-খেদানো ইত্যাদি অতিলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মৌলভি চরিত্রের চাতুর্যের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন।'[৯৮] নাটকটিতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের রূপটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উৎপাদক কৃষক তথা নিম্নবর্গের মানুষের বিপরীতে মুনশী, মাতবর, মহাজন তথা রাষ্ট্র ও সরকারের সান্নিধ্যে থাকা মানুষ। সামন্ততান্ত্রিক বা পুঁজিতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় উৎপাদক থাকে একেবারে নিম্নসারিতে। পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সরকার বা রাষ্ট্র তাদের শোষণের জন্য আবিষ্কার করে নিত্যনতুন কৌশল। যার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে মুনশী চরিত্রের মাধ্যমে। ব্রিটিশ সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এদেশের কৃষকের জীবনে যে বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে তার মূলগত কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ফলে আতর আলীর জীবন চিরকাল একই রকম থেকে যায়। এই উপলব্ধিটি নাট্যবক্তব্যে প্রতীয়মান। তবে নাট্যকার কৃষকদের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, শোষণ ইত্যাদি দেখালেও তা

থেকে পরিত্রাণের কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নাটকে উপস্থাপন করেননি। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, *করিম বাওয়ালীর শত্রু অথবা মূল মুখ দেখা* এবং *আতর আলীদের নীলাভ পাট* নাটক দুটির বক্তব্য সামাজিকতা ও দার্শনিকতা– এই দুই প্রবণতার মধ্যে দোদুল্যমান। নাট্যকার নিজেও যেন নিশ্চিত নন কোন বক্তব্যটিতে তিনি জোর দিতে চান। তার চরিত্রগুলি কি তাদের নিয়তির শিকার অথবা তারা নিজেরাই নিয়তির স্রষ্টা তা আর স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে না। আর তাতে বক্তব্যের অস্পষ্টতা নাটকের পরিণতিকে আচ্ছন্ন করে।[৯৯] আতর আলী বা করিম বাওয়ালীর মতো নিম্নবর্গের মানুষের জীবনের সংগ্রামের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি নাটক দুটিতে ফুটে ওঠে না। শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনার কাছে তারা অসহায়। নিজেদের অস্তিত্বের জানান তারা সেটুকুই দেয় যে টুকু শুধু তাদের জীবিত থাকাকেই নিশ্চিত করে। তবে নিম্নবর্গীয় মানুষের আচার-বিশ্বাস খুব স্বল্প পরিসরে হলেও নাট্যকার তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক কারণে নিম্নবর্গের মানুষ নানান কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। রোগ বালাই হলে তারা এখনো ডাক্তারের চেয়ে ঝাড়ফুক, পানি পড়া মৌলভীর চিকিৎসা-পদ্ধতির ওপর তাদের বিশ্বাস। কিংবা অর্থনৈতিক অসঙ্গতি ও ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার সম্পর্কে তারা জানেও না। নিম্নবর্গের এই চেতনা নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে।

বাসন (১৯৮৫) নাটকটির মাধ্যমে সেলিম আল দীন স্পষ্টভাবে গ্রামীণ বর্গাচাষী কৃষকের জীবনবাস্তবতা তুলে ধরেছেন। নিম্নবর্গের মানুষের সংগঠিত ও আক্রমণাত্মক প্রতিবাদ এই নাটকের মতো তাঁর আর কোনো নাটকে পাওয়া যায় না। এতে তিনি বর্গাচাষী কৃষকের সঙ্গে জমির মালিকের সম্পর্কের নানামাত্রিক দিক উপস্থাপন করেছেন। নাটকটির কাহিনী এবং রচনাশৈলী বেশ প্রাঞ্জল। অন্তত আগের নাটক দুটোর মতো দোদুল্যমানতা এই নাটকে নেই।

জমির মালিক আজিজুল কোনো এক রাজনৈতিক দলের সংসদ সদস্য। শহরেই তার বসবাস। বহু বছর পর সে গ্রামে আসে মূলত তার জমি নতুনভাবে বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য। সামন্তবাদী চেতনার কারণে আশেক জমির মালিক তথা আজিজুলের প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধা পোষণ করে। তাই জমিদারের সব কথা সে রাখবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার দুই ছেলে বাবার এই আচরণ মানতে চায় না। আশেকের একমাত্র মেয়ে কৈতরির বিয়ে হওয়ার পরও যৌতুক দিতে না পারার কারণে শ্বশুর তাকে বাপের বাড়ি রেখে যায়। দুই হাজার টাকার জন্য মেয়ের এই অবস্থা সে মেনে নিতে পারে না। বর্তমানের দুর্দশা দেখে সে আপসোস করে তার পরদাদা হাজি ফখরুদ্দিনের গৌরবময় ইতিহাসের জন্য; যিনি ফরাজী আন্দোলনে দুদু মিয়ার শিষ্য হিসেবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। স্মৃতি হিসেবে আশেক দাদার ব্যবহৃত একটি বাসন তাই খুব যত্নে রেখে দেয়– যা তার কাছে পারিবারিক অস্তিত্ব, অহংবোধ ও পবিত্রতার প্রতীক। গ্রামবাসীরাও বাসনটিকে পবিত্র মনে করে। জমির মালিক আজিজুল গ্রামে থাকাকালীন একদিন নিজে থেকেই আশেকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। মালিকের এই আচরণে সে অভিভূত হয়ে যায়; আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলে। কারণ চেতনাগত কারণে মালিকের বর্গাচাষীর বাড়ি ভাত খেতে চাওয়াটা তার কাছে বিস্ময়কর। সারা জীবন মালিককে সে দেখেছে বর্গাচাষীর থেকে বিচ্ছিন্ন, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সেই মালিকই যখন স্বেচ্ছায় খেতে চায় তখন তার আনন্দে কেঁদে ফেলাটা স্বাভাবিক। নিজের কষ্টের চেয়ে মালিকের ইচ্ছা পূরণ করতে পারাতেই যেন তার সুখ। তাই মালিককে খাওয়ানোর মতো অর্থনৈতিক সচ্ছলতা না থাকলেও সে কার্পণ্য করে না। যে মুরগি বেচলে তার কিছু দিন সংসার খরচ চলতো, সেই মুরগি সে কাটতে চায় মালিককে খাওয়ানোর জন্য। মালিকের প্রতি এই ভক্তি তার চেতনাগত দাসত্বেরই পরিচায়ক। এ কারণে পুত্রদের নিষেধও সে শোনে না:

আশেক: চুপ আমার মুহের উপরে কতা। জমিদার জমিদার-ই। তার ইচ্ছা আমাগো ইচ্ছা। হুজুর যে আমাগো ঘরে খাইবো কইছে– তা আমাগো সাত জনমের ভাইগ্য।[১০০]

শেষ পর্যন্ত পুত্রদের সঙ্গে আশেকের বিরোধ চরমে ওঠে আজিজুলকে দাদার বাসনে খেতে দেয়া নিয়ে। ভালো বাসন না থাকার কারণে আশেক ঠিক করে পরদাদার বাসনেই জমিরর মালিককে খেতে দেবে। কিন্তু পুত্ররা বাধা দেয়:

জমির: না না। অসম্ভব। পরদাদার জিনিসে আমরা কেউ ডরে হাত দেই না গুনা হইবার পারে বইলা। আর হে ভাত খাইবো। তার মতো একটা কাদাখোঁচা মানুষ। ছিঃ![১০১]

প্রতিবাদ তীব্র না হলেও এর মধ্য দিয়ে মালিকের প্রতি তাদের ঘৃণা স্পষ্ট। পুত্রদের এই আচরণ সহ্য করতে না পেরে আশেক গলায় ফাঁস নিতে চায়। ফলে জমির ও খবির আর রাজি না হয়ে পারে না। আজিজুল খেতে এসে আশেকের দাদার দাদার বাসন দেখে সেটি দখলে নিতে চায়। এর বিনিময়ে কৈতরির শ্বশুরের দাবি অনুযায়ী দুই হাজার টাকাও দিতে রাজি হয় আজিজুল। কিন্তু আশেক মানতে পারে না:

আশেক: হুজুর– আপনে আমার সব নিয়া যান হুজুর ঐ জিনিসটা চাইবেন না। আমরা বংশের পর বংশ এ চিহ্নটা রাইখা দিছি। ঐ বাসনটা আমাগো জীবনের চায়া দামি।[১০২]

তাদের বিশ্বাস, বাসনটি তাদের বংশগৌরবের প্রতীক। তাই একমাত্র বোন স্বামী-সংসার ফিরে পাবে জেনেও দু'ভাই বাসনটি দিতে রাজি হয় হয় না। অন্যদিকে বাসনে আজিজুলকে খেতে দিয়ে পাপ করছে ভেবে আশেকও মৃত দাদার কাছে ক্ষমা চায়। ঠিক একই কারণেই কৈতরিও বাসনটি রক্ষার জন্য নিজের জীবনকে তুচ্ছ মনে করে:

কৈতরি: বাজান– আমার জান যাইতে পারে। কিন্তুক তও বাসন আমি বেচতে দিমু না। এ বাসন যদি বেইচা দেও তাইলে গুনা অইবো গজব পড়বো।[১০৩]

বাসন না পেয়ে আজিজুলের আসল রূপটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিন হাজার টাকাও দিতে রাজি হয় সে। কিন্তু আশেক সম্মত হয় না। কোনো কিছুর লোভে সে আর বশ হয় না। ব্যর্থ হয়ে আজিজুল আশেককে বর্গাচাষ থেকে উচ্ছেদ করে এবং গ্রামের অন্য বর্গাচাষীর কাছ থেকেও জমি কেড়ে নেয়। তার চেলা করমকে সমস্ত জমি বর্গা দিয়ে যায়। জমি হারানোর শোক আশেক সহ্য করতে পারে না। পারার কথাও না। যে জমি তার জীবিকার একমাত্র উৎস, সেটি চলে গেলে হা-হুতাশ করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। যেহেতু সে আগে থেকে ধরে নিয়েছে জমির মালিকের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। তাই প্রতিবাদ করলে মালিকের সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন হতে পারে, এই চিন্তাটুকুও তার মাথায় আসে না। নিজের অবস্থাকে সে যেন মেনে নেয়:

আশেক: আল্লা আল্লা– গরিব করছ ক্যান। এক দলেরে জমির মালিক আরেক দলেরে জমি ছাড়া করছো ক্যান? ক্যান করছো। অহন আমি কি করমু। এঁ্যা কি করমু।[১০৪]

চেতনায় নিজে কিছু করতে পারার বিশ্বাস নেই বলে অলৌকিক শক্তির কাছে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ জানানো ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা আশেকের নেই। এর বিপরীতে তার দুই ছেলে। তারা মালিকের এই অন্যায় সহ্য করে না। প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। গ্রামের অন্যান্য বঞ্চিত চাষীদের সঙ্গে তারা জোট বাধে অধিকার ফিরে পাওয়ার। অন্যদিকে কৈতরি সব কিছুর জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে আত্মহত্যা করে। এই মৃত্যুর কারণে গ্রামবাসীরা প্রতিশোধের নেশায় মেতে ওঠে। ভয় পেয়ে আজিজুল পালিয়ে যায়। গ্রামবাসী তার বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। নাটকটিতে নিম্নবর্গের বৈপরীত্যপূর্ণ দুই বৈশিষ্ট্যকে নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন। একদিকে সামন্ততান্ত্রিক চেতনার কারণে পিতা তথা আশেকের মানসিক দাসত্ব, অন্য দিকে সেই পিতার সন্তান হয়েও জমির এবং খবিরের মালিকের অন্যায়, প্রতারণা এবং শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এবং শেষ পর্যন্ত অধিকার আদায়ের

সংগ্রামে যোগ দেয়া। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নিম্নবর্গের চরিত্রের মধ্যে সহকারিতা এবং প্রতিরোধ পাশাপাশি অবস্থান করে।[১০৫] একই পারিবারিক ঐতিহ্যকে চেতনায় ধারণ করা সত্ত্বেও আশেকের আচরণ মূলত মালিকের শ্রেণিগত অবস্থানের পক্ষেই। মালিকের কথার বিরুদ্ধে সে স্পষ্টভাবে কোনো উচ্চারণ করেনি। কিন্তু তার ছেলেদের প্রতিবাদ স্পষ্ট:

আশেক: আহা বাজান– মানি লোকের নাম দাপুস দুস কইরা কইতে নাই।
জমির: অতো বুঝি না– প্যাডে নাথি মারলে কিয়ের মালিক।[১০৬]

প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় স্বামীর আবাসই নারীর শেষ ঠিকানা। পুরুষতান্ত্রিক এই চেতনার বিরুদ্ধে *বাসন* নাটকে কৈতরি এক প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ। স্বামীর ঘরের চেয়ে বাপ-দাদার ঐতিহ্য, গৌরব তার কাছে বড়। তাই দুই হাজার টাকা হলে সে আবার স্বামী-সংসার করতে পারবে জেনেও বাবাকে বাসন বিক্রি করতে দেয় না। তবে স্বামীর ঘরে না যেতে চাওয়ার আরেকটি কারণ হলো শ্বশুর বাড়ির লোকের নির্যাতন। প্রতিবাদ করার মতো শক্তি বা ক্ষমতা তার নেই। তাই নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য কৈতরি নিজের মতো একটা উপায় বাতলে নিয়েছে। যার মধ্য-দিয়ে সে নিজে মুক্ত হয়েছে এবং পিতৃবংশের গৌরবের শেষ অবলম্বনও রক্ষা করতে পেরেছে। কিন্তু সামাজিক কারণে ভাইয়েরা তাকে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার জন্য বললে এবং শেষ আশ্রয় বাবাও তাকে অপমান করলে জীবনের প্রতি তার আর কোনো মায়া থাকে না। এই অবস্থায় আত্মহত্যা ছাড়া তার আর কোনো পথ সে পায় না। তবে কৈতরি মৃত্যু বৃথা যায় না। মূলত তার করুণ পরিণতির কারণে প্রতিবাদী মানুষ প্রতিশোধ প্রবণতায় মেতে ওঠে। নিজেদের অধিকার নিজেরাই আদায় করে। তবে সেটি কি স্থায়ী হয়? এই প্রশ্নটি নাট্যকার নাটকের শেষে উল্লেখ করেছেন। কোনো পরিবর্তনকে স্থায়ী করার জন্য যে সাংগঠনিক শক্তি, একতা, সমাজতান্ত্রিক চেতনা দরকার তা আশেকদের মতো মানুষদের নেই। ফলে তাদের প্রতিবাদ, সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত স্থায়ী কোনো পরিণতি আনতে পারে না। ফলে নাট্যকারের এই শঙ্কা একেবারে অমূলক নয়।

নাট্যকার হিসেবে সেলিম আল দীন যে মৌলিকত্বের অধিকারী হয়েছেন তা মূলত *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য* (১৯৯৪) বিষয়ে গবেষণার সূত্রে। ইউরোপ নয় বাঙালির আছে নিজস্ব নাট্যঐতিহ্য– এই সত্য তিনি তাঁর গবেষণার মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এরই সূত্রে তিনি তাঁর নাটকে ঘটিয়েছেন নাট, গীত, বর্ণনা, সংলাপ ইত্যাদির সমন্বয়। এই বৈশিষ্ট্যের প্রথম প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি *কিত্তনখোলা* (১৯৮৬) নাটকে। প্রচলিত নাট্যকাঠামোর বাইরে গিয়ে বিস্তৃত পটভূমির মহাকাব্যিক আখ্যান, বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে নানান ঘটনার সাবলীল উপস্থাপন, অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্রের সমাবেশ ইত্যাদির মধ্য-দিয়ে তিনি বাংলার লোকায়ত জীবনচিত্রের উপস্থাপনার শুরু করেন এ নাটক থেকেই। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষণ-নিপীড়ন অব্যাহত থাকায় প্রবল আর্থনীতিক চাপ সৃষ্টি হয়– এই চাপ সবচেয়ে বেশি পড়ে নিম্নবিত্ত শ্রেণির ওপর। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপর্যুপরি চাপে বিপন্ন নিম্নবিত্ত শ্রেণি অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। পেশাগত এই রূপান্তর প্রকৃত অর্থেই দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ এক অবক্ষয়িত সমাজের বাস্তব অবস্থার চিত্রই মূর্ত করে।[১০৭] মূলত এরই সূত্রে *কিত্তনখোলা* নাটকে নয়টি সর্গের মধ্য দিয়ে নাট্যকার নিম্নবর্গের মানুষের জীবনের নানা রূপ-রূপান্তরকে দৃশ্যমান করতে চেয়েছেন।

নাটকটির কাহিনীর বিস্তার ঘটেছে মনাই বয়াতির মাজারকে কেন্দ্র করে। প্রতি বছরের মতো এবারও সেখানে মেলা বসেছে। কবিগানের আসর, যাত্রানুষ্ঠান, মদ-জুয়ার আখড়া, নানা রকম জিনিসের বাহারি দোকান, ফেরিওয়ালা, বেদে, লাউয়া সম্প্রদায় ইত্যাদি নানান রকম অনুষ্ঠান, সম্প্রদায় এবং মানুষের আগমন মেলাকে করে জাঁকজমকপূর্ণ। নাটকে অনেকগুলো দ্বন্দ্ব উপস্থিত। তবে প্রধান দ্বন্দ্বটি দিনমজুর সোনাইয়ের সঙ্গে ইদু কন্টাকটরের। বিত্তবান মানুষ বাংলার গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে ক্ষমতাশালী।

অশিক্ষা, চরিত্রহীনতা, লোভ এগুলো কোনো বাধা নয়। তাই ইদু কন্টাকটরের এই সব চারিত্রিক দোষ থাকার পরও মেলা কমিটির চেয়ারম্যান হতে পারে। সে বিভিন্ন অজুহাতে সোনাইয়ের কাছ থেকে বন্ধকী জমিগুলো নিজের দখলে নিতে চায়। আর কোনো বাধার সম্মুখীন যেন ইদু না হয় সে জন্য সে সোনাইকে আরো কিছু টাকাও দিতে চায়। কিন্তু সোনাই রাজি হয় না। সে টাকা শোধ করে জমি উদ্ধারের পক্ষপাতী। এবার মেলা কমিটির চেয়ারম্যান ইদু। সোনাই মেলায় এসে তাকে এড়িয়ে চলে। কোনোভাবে সোনাইয়ের কাছ থেকে জমি দখল করতে না পেরে ইদু কূটকৌশল অবলম্বন করে। ওদ্দা ও মালেক নামের তার অর্থভোগী দুইজনকে দায়িত্ব দেয় সোনাইয়ের দিকে নজর রাখার জন্য। মালেক একদিন নিজের টাকা দিয়ে জুয়ার আসরে সোনাইকে খেলায় প্রবৃত্ত করে। কুটিলতা সে ধরতে না পেরে খেলে। একহাজার আশি টাকা হেরে যাওয়ার পর মালেক তার কাছে টাকা দাবি করে। এতক্ষণ পর তার কাছে স্পষ্ট হয় মালেকের ছলনা। বুঝতে পারে সে আসলে ইদুর লোক। কিন্তু প্রতিবাদ সে করতে পারে না। ওদ্দা ও মালেক তাকে প্রচণ্ড মার দেয়। এই মারের কারণে তার মধ্যে প্রতিশোধ নেয়ার প্রবল ইচ্ছা তৈরি হয়। সেই রাতেই সে বছিরকে সঙ্গে নিয়ে কামারের দোকানে যায় দা কিনতে। সেই দা দিয়ে পরে সে ইদুকে হত্যা করে।

এই কাহিনীর পাশাপাশি নাটকের আরেকটি কাহিনী মেলায় আসা নয়াযুগ যাত্রাদলকে ঘিরে। ছায়ারঞ্জন, বনশ্রীবালা, রবি দাশ যাত্রাদলে কাজ করে। দলের মালিক সুবল ঘোষ। সে নিজের স্বার্থে দলের মেয়েদের ক্ষমতাশালী লোকের মনোরঞ্জনের জন্য পাঠায়। ইদু মেলা কমিটির চেয়ারম্যান। বনশ্রীকে সে ভোগ করতে চায়। সুবল ঘোষ অর্থনৈতিক লালসার কারণে এ প্রস্তাবে রাজি হয়। কিন্তু ছায়ারঞ্জন এবং রবি দাশ এটাকে সহজে মেনে নিতে পারে না। তারা দুজনই বনশ্রীর প্রতি দুর্বল। কিন্তু দলের মালিকের বিরুদ্ধে তারা সহজে যেতে পারে না। এর একটি কারণ অর্থনৈতিক, অন্যটি যাত্রার প্রতি তাদের ভালোবাসা। ঠিক একই কারণে বনশ্রী ইদুর ঘরে যাওয়ার প্রস্তাবে রাজি হয়। কারণ সে জানে; যদি রাজি না হয় তাহলে তাদের হয়ত আর যাত্রা করতে দেয়া হবে না। তখন দলের লোকদের চলবে কী করে? তাই প্রত্যেক যাত্রানুষ্ঠানে সুবলের এই অর্থলোভী মানসিকতার বিরুদ্ধে স্পষ্ট কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না। একদিন কাশেমালির মদের দোকানে সোনাইয়ের সঙ্গে ছায়ারঞ্জনের পরিচয় হয়। ছায়া তাকে বনশ্রীবালার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সোনাইয়ের সঙ্গে বনশ্রীর এই পরিচয় ইদু ভালভাবে নেয় না। এক রাতে আসরের আগে সুবলের অন্যায়ের প্রতিবাদে ফেটে পড়ে রবি দাশ। সে দল ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। নিজের অপমান আর সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে বনশ্রী। তার মৃত্যুর পর ছায়াও দল ছেড়ে যশোরে এক কাকার কাছে চলে যায়। দলটি এক প্রকার ভেঙেই যায়।

এই দুই কাহিনীর সঙ্গে ঘটনাক্রমে যুক্ত লাউয়া সম্প্রদায়ের ডালিমন ও রুস্তম। মদ খেতে গিয়ে সোনাইয়ের মৃগী রোগ সম্পর্কে জানতে পেরে রুস্তম তাকে ডালিমনের কাছ থেকে ভাল্লুকের নখের মাদুলি নেয়ার কথা বলে। এই সূত্রে ডালিমনের সঙ্গে সোনাইয়ের পরিচয় হয়। এই নিয়ে পরে লাউয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ তৈরি হয়। কারণ নিয়ম অনুযায়ী কোনো বাইরের লোককে নৌকায় নেয়া যাবে না। সোনাই গেলে সবাই সন্দেহ করে। বিপদে পড়ে রুস্তম। কারণ সেই তাকে নিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া রুস্তম ডালিমনের প্রতি দুর্বল। দলের সর্দার ডালিমনের স্বামীকে হত্যা করে তাকে রক্ষিতা করে রেখেছে। এটি সে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু সর্দারের বিরুদ্ধে যাবার শক্তিও তার নেই। পরে সোনাইয়ের কাছে এই সমস্যা সমাধানের মিনতি করে রুস্তম। এভাবে লাউয়া সম্প্রদায়ের ডালিমন ও রুস্তমের সঙ্গে তার এক ধরনের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সোনাই জানতে পারে তাদের জীবনের নানা কথা। আর ডালিমন যখন জানতে পারে সোনাইয়ের স্ত্রী মারা গেছে, তখন সে-ও ভিতরে ভিতরে সোনাইয়ের প্রতি একটু দুর্বলও হয়ে পড়ে। কিন্তু বলতে পারে না। সে সম্প্রদায় ছেড়ে পালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু পারে না। নাটকটি শেষ হয় সোনাইয়ের পেশা পরিবর্তনের ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে। বছিরের

মাধ্যমে জমিজমা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার খবর পাঠায় সে মাকে। আর নিজে পিতৃপেশা ত্যাগ করে রুস্তমের সঙ্গে সাপের বিষ বিক্রির জন্য দুখাইপুরের উদ্দেশ্যে উঠে পড়ে নৌকায়। এর মাঝে ব্যক্ত হয়েছে এই অঞ্চলে প্রচলিত নানা কাহিনী– মনাই বয়াতির আশ্চর্য ক্ষমতা, *সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল*-এর কাহিনী ইত্যাদি।

নাটকটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার মূলত গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনের নানা দিককে তুলে ধরেছেন। শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না হলেও শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বের চিত্র এ নাটকে দেখতে পাওয়া যায়।[১০৮] ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিভিন্ন রূপ ফুটে উঠেছে নাটকে। ইদু ও সোনাই, সর্দার ও রুস্তম, সুবল ঘোষ ও ছায়ারঞ্জন– প্রত্যেক সম্পর্কের পারস্পরিক বোঝাপোড়ার মাধ্যমে সেলিম আল দীন তুলে ধরেছেন ক্ষমতার নানা মাত্রা। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট যে যাকে আমরা নাট্যদ্বন্দ্ব বলি, তা উপস্থাপনের কোনো চেষ্টা নাট্যকারের ছিল না। তিনি মূলত গ্রাম-বাংলার অসংখ্য নিম্নবর্গ মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক রাজনৈতিক, ধর্মীয় এমনকি নৃতাত্ত্বিক জীবনচিত্রই তুলে ধরতে চেয়েছেন।[১০৯] ইদুর সঙ্গে সোনাইয়ের জমিকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বই এই নাটকের মূল দ্বন্দ্ব। তবে কোথাও সেটি জমাট বাধে না। বিত্তশালী ইদুর নানান শক্তি ও কৌশলের বিপক্ষে সোনাইয়ের একা লড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মেলায় এসে ইদু কন্টাকটরের সাগরেদ ওদ্দার সঙ্গে মুখোশের দোকানে দেখা হওয়ার পর তার ভীতি বেড়ে যায়। সব সময় সে ইদুকেই দেখে:

সোনাই: হে যদি আমার থিক্যা জমিনের দস্তখত লয়।
বছির: কেমনে লইবো।
সোনাই: তা জানি না। কিন্তুক এখন খালি ডর করতাছে আমার। যেন ডাইনে রেনলে (তাকালে) পরে দেখুম ইদুরে– বাঁয়ে বাঁও কুড়ানীর মতন দেখুম তারে।[১১০]

কিন্তু ইদুর কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো চেষ্টা সোনাইয়ের মধ্যে নেই। স্বশ্রেণির কাউকে নিয়ে বিষয়টা কোনো ফয়সালা করার চেষ্টাও সে করেনি। তার সঙ্গী বছির ক্ষোভে ইদুকে ঘানিতে ফেলে একবার পিষে মারার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেও তা সোনাইকে আলোড়িত করে না। ইদুর শোষণ-বঞ্চনা, নির্যাতন পেশাগত পরিবর্তন– সব কিছু সহজে সে মেনে নিয়েছে। তাই কৃষক থেকে দিনমজুর হওয়ায় তার তেমন কষ্ট নেই:

মংলা: জমি-জমার ঘাপলা হইছে হুনলাম। হাচায়।
সোনাই: জে। বন্ধকে গেছে। অখন দিনমজুর হইছি।
মংলা: তা বন্ধক ছাড়াওনের ব্যবস্থা করছ।
সোনাই: দোহা দুধনি আর বাটে সান্ধায় মংলা বাই।[১১১]

সোনাই ধরে নিয়েছে সে আর জমি ফেরত পাবে না। তাই তা ফিরে পাবার জন্য কোনো চেষ্টা করতে সে নারাজ। নিম্নবর্গের পরস্পরের প্রতি যে সহযোগিতা, সেটি এনাটকে তেমনভাবে নেই। সবাই যেন যার যার কষ্ট নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে বেঁচে থাকার আনন্দে উদীপ্ত। জীবন যাপনের ক্রুর-বাস্তবতা নিয়ে তারা চিন্তিত নয়। সোনাই, বছির, ছায়া, বনশ্রী, ডালিমন নিম্নবর্গের এই চরিত্রগুলোর প্রত্যেকের জীবনে নানান কষ্ট-বেদনা-দুঃখ আছে। এসব যেন তারা মদ, জুয়া, কবিগান যাত্রা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভুলে থাকতে চায়। ফলে সোনাই ছায়ারঞ্জনের কাছে তার জমি হারানো, বৌয়ের করুণ মৃত্যুর কথা ব্যক্ত করলেও তা ছায়ারঞ্জনের মধ্যে তেমন প্রভাব ফেলে না। ঠিক একইভাবে ছায়ারঞ্জনও তার বাপমায়ের ওপর পাঞ্জাবিদের নির্মম নির্যাতনের কথা বললে সোনাইয়ের মধ্যে একই রকম প্রতিক্রিয়া হয়। যে প্রতিক্রিয়া মেনে নেয়ার, ক্ষোভের নয়। এর কারণ মূলত জীবনযাপনের প্রতি মুহূর্তে সোনাই, ছায়ার মতো মানুষদের বঞ্চিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত এসম্পর্কিত কোনো অনুভূতি তাদের আর তেমন থাকে না। বঞ্চনাটাই যেন তাদের কাছে চিরসত্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে কারোর মধ্যে সেই জীবনের ওপর

তেমন কোনো ক্ষোভ পরিলক্ষিত হয় না। জীবনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তেমন কোনো প্রশ্নও জাগে না। যেটুকু প্রশ্ন সোনাই শামসল বয়াতির কাছে করে তাতে জীবনে বেঁচে থাকাটাই আনন্দের হয়ে ওঠে:

শামছল: অহন যদি তোমারে জিগাই– সুখ চাও ক্যান।
সোনাই: আছে বইলা চাই।
শামছল: জনমটা যে বহুত সুখের। হে কতাটা মরণকালে বুঝতে পারবা।
সোনাই: আমার মতন বাঁইচা সুখ কি। বাঁচতে গেলে দেখি তবনটা ছিঁড়া– শিকায় ঝুলতাছে মরা বউ-এর কেঁথা কাপড়। নূন দিয়া দুইডা লাল চাইলের ভাত জুটে না।
শামছল: ঈমান ঠিক থাকলে সুখও মেলে বাবা।[১১২]

শামছল বয়াতির মতো মানুষ গ্রামীণ মানুষের চেতনাজগত গঠনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। তাদের চেতনা মূলত আধ্যাত্মিকতায় আচ্ছন্ন। তাই জীবনের কঠিন বাস্তবতা থেকে তা বিচ্ছিন্ন। 'আল্লায় অসুখ দিয়া মানষের হিম্মত পরীক্ষা করে'[১১৩]– এমন কথা নিম্নবর্গীয় মানুষকে জীবন সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন করতে দেয় না। তারা যেন মেনে নেয় অদৃশ্য শক্তিকে এবং প্রত্যেকের জীবন সেখানে যার যার হয়ে পড়ে। বলা যায়, নিম্নবর্গের জীবন এ নাটকে অনেকটা আধুনিক ব্যক্তিবাদী চেতনা দ্বারা প্রভাবিত। একারণেই চরিত্রের কেউ সম্মিলিতভাবে বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথ খোঁজে না। তাদের প্রতিবাদ কিংবা প্রতিশোধ হয় ব্যক্তিক। বছির, ছায়ারঞ্জন, রবি দাশ, সোনাই প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিবাদ করার স্পৃহা আছে কিন্তু তা এককভাবে। বছির ইদু কন্টাকটরকে তেলের ঘানিতে ফালায়া চিপতে চায়।[১১৪] আবার সোনাইও তার ওপর অন্যায় আর সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তারা দুজন কখনো একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করে না। নাট্যকার যেন দেখাতে চান ইদুর শোষণ ব্যক্তিক কারণে। সোনাই তাই নিজেই তার ওপর অন্যায়-অত্যারের প্রতিশোধ নেয় ইদুকে হত্যা করে। এর মধ্য দিয়েই এতদিনের সব ক্ষোভের ইতি টানে সে:

সোনাই: কনকদার সাব–। কনকদার সাব খারান– আমি রাজি। জমির সাফ কবলা করুম। মালেক বাই আর ওদ্দা সাক্ষী *চিৎকার ও দা দিয়ে আঘাত*– এই তো জমির সাফকবলা করলাম।[১১৫]

এই হত্যা কোনো সমষ্টিগত কারণে নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে। তা নিম্নবর্গের কাছে হত্যা ছাড়া আর কোনো অর্থ বহন করে না। তাই সোনাইকে শেষ পর্যন্ত পালাতেই হয়। ইদু কন্টাকটরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তা থেকে তারা কোনো দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না। এর কারণ এই যে নাট্যকার সেলিম আল দীন বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত নন।[১১৬] আবার সুবল ঘোষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ রবি দাশ যাত্রা করতে না চাইলেও কাউকে সে সঙ্গে পায় না।

রবি দাশ: বনশ্রী, আজ এ্যাকটিং করবো না আমরা।
বনশ্রী: তা কেমনে হবে। সভাজন প্যান্ডেলে আগুন লাগায়া দেবে।
রবি দাশ: তুমি পাট করবে না। আমিও না। দেখি সুবল ঘোষের নয়াযুগ কেমনে চলে।
বনশ্রী: মানষের দোষটা কি। তাদের কষ্ট দেওন ঠিক না। আজ হলো লখিন্দরের যাত্রা। ধম্মকথা।
রবি দাশ: বনশ্রী তুমি ইদুর সামনে নাচতে পারবে না। ননী বালাও শ্যাষ রাইতে শফিক চেয়ারম্যানের ঘরে যাবে না।
বনশ্রী: নাচি না নাচি আমার ব্যাপার। আপনের রাগের কারণটি কি।– আমরা সীতাও না– বেউলাও না। যদি সিটা ভাবি– ভাবি যে আমরা সতী– মানষে তা ভাববে না। ভাবে না।[১১৭]

বনশ্রীর এই ক্ষোভ তাদের সামাজিক অমর্যাদার কারণে। সমাজ, রাষ্ট্র তাদের জীবন-জীবিকার ন্যূনতম নিরাপত্তাও গ্রহণ করে না।[১১৮] এর ফলে সামাজিক ভাবনার চেয়ে পেশার প্রতি বেশি দায়িত্বশীল হয়

সে। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য নিজেকে বারবার ইদল হকের মতো লোকদের কাছে বিকিয়ে দেয়াও সে মেনে নিতে পারে না। আত্মহত্যাই হয় তার শেষ পরিণতি।

বনশ্রীকে নিয়ে যাত্রার ছাউনিতে রবিদাশ, সুবল ঘোষের মধ্যে যে সংঘাতময় পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, অনুরূপ চিত্র আমাদের গোচরীভূত হয় লাউয়াদের নৌকার ছইয়ের নিচে হুকুম সর্দার ও রুস্তমের মধ্যে, ডালিমনকে কেন্দ্র করে। নারীকে, ভূমিকে বাহুবলে আপন অধিকারে আনার মধ্যে যে আদিম পৌরুষের বহিঃপ্রকাশ স্থিরিকৃত হয় আরণ্যক সমাজে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে হুকুম সর্দারের চেতনায় তার উপস্থিতি বিদ্যমান।[১১৯] গোষ্ঠীবদ্ধ চেতনায় বিশ্বাসী নিম্নবর্গীয় লাউয়াদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় গোষ্ঠীপ্রধানদের দ্বারা। তাদের ব্যক্তিগত চাওয়ার কোনো মূল্য সেখানে নেই। গোষ্ঠীপ্রধান হুকুম সর্দার ডালিমনের মতো নারীদের নিজস্ব সম্পত্তিই মনে করে– গোত্রের বা গোষ্ঠীর সকলের এবং সব কিছুর ওপর যেমন তার অধিকার বিদ্যমান তেমনি নারীদের শাসন করবার ভোগ করবার অধিকারও তার রয়েছে। যদি অবদমন সম্ভব না হয়, তবে বাসনা চরিতার্থ করতে ডালিমনের মতো বাঞ্ছিত নারীদের সম্মুখেই স্বামীর প্রাণহরণ পূর্বক নিহত স্বামীর স্ত্রীকে আপন অধিকারে নিয়ে আসে। সর্দারের এই অত্যাচারে সম্প্রদায়ের কারো কোনো কথা বলবার অধিকার নেই– শক্তির আস্ফালন দেখাবার কোনো উপায় নেই, প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্যায়কে নির্বিচারে মেনে নেয়াই বিধান। প্রথার নিকট যুক্তি, শ্রেয়বোধ, ন্যায়, প্রেম, ভালোবাসা সব কিছু পরাজিত।[১২০] এ কারণে রুস্তম ডালিমনকে ভালোবাসলেও সর্দারের রক্ষিতা হওয়ার কারণে তাকে নিয়ে সে ঘর বাধতে পারে না। ডালিমনও পারে না তার চাওয়াকে পূর্ণ করতে। ঘটনাক্রমে সোনাইয়ের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে সে। কিন্তু স্বজাতির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সর্দারের ভয়– এ সবের কারণে সে নৌকা ছেড়ে চলে যেতে পারে না। বরং সোনাইয়ের কাছে সে তার জাতিগত অহং এবং বেদনা প্রকাশ করেছে:

লাউয়ার মাইয়া ডাঙায় কুনো দিন ঘর বান্ধে না। বানতে চাইলেও পারে না।[১২১]

নিম্নবর্গের জাতিগত দরদ এই নাটকে এক মাত্র ডালিমনের মধ্যে দেখা যায়। তাই রুস্তম তাকে লাউয়া সর্দারের নির্যাতন থেকে বাঁচাতে চাইলেও সে রাজি হয় না।

রুস্তম: হোন– মনাই বাপরে কসম– হুকুম সদ্দারের তলে থাকুম না। চল– তুই আমার লগে নাও ছাইড়া। কত বেইজ্জতি হবি ডালিমন। এত কি সুখ দেখলি তুই নায়ের মদ্যি।
ডালিমন: সুখ না পাই ঊমানটা তো ঠিক থাকবে রুস্তম বাই। দশ জনের লগে আমাগো বাঁচন মরণ।[১২২]

কিন্তু তার এই দরদ শেষাবধি তার আত্মবিসর্জন।[১২৩] ব্যক্তিক নয় সামষ্টিক মুক্তি কাম্য ডালিমনের। সমাজের অভ্যন্তরের ভেতরে থেকেই সে প্রতিকূলতার মোকাবেলা করতে চায়।[১২৪] তাই রুস্তমের ভালোবাসা প্রত্যাখান করে সর্দারের নৌকায় থেকে যায় সে। কিন্তু রুস্তম তা পারে না। তার স্বভাবসুলভ গোয়ার্তুমি এবং সহজাত প্রতিবাদী মানসিকতার দ্বারা সর্দারের কর্তৃত্ব, শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও ব্যর্থ হয়। কারণ একক কোনো প্রতিবাদ গোষ্ঠীজীবনে পরিবর্তন আনতে পারে না। তাই শেষ পর্যন্ত সম্প্রদায় ত্যাগ করে সে একা বেরিয়ে পড়ে। যাওয়ার পথে সঙ্গী হিসেবে পায় সোনাইকে। সোনাই রুস্তমের সঙ্গে যাওয়া নিয়ে প্রথমে দোলাচলে থাকে। গ্রামীণ সংস্কারানুযায়ী বেদের সঙ্গে একজন কৃষিজীবীর কোথাও যাওয়া বা বাস করা প্রচলিত ব্যবস্থাকেই অস্বীকার করা। সোনাই বুঝতে পারে, ইদুকে হত্যা করে তার পক্ষে আর আগের মতো থাকা সম্ভব নয়। তাই শেষ পর্যন্ত রুস্তমের সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ে দুখাইপুরর উদ্দেশ্যে। টুইটামের সোনাইয়ের গন্তব্য হয় দুখাইপুর। নিম্নবর্গের জীবনের অনিশ্চয়তা এবং পরিণামে রূপান্তরকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। নাটক শেষে আমরা দেখি বেশির ভাগ নিম্নবর্গের মানুষ আর তার আগের পেশায় নেই। রবিদাশ, ছায়া, রুস্তম, সোনাই তাদের রূপান্তরিত জীবন নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান।

এই নাটকে শোষক চরিত্র দুটি। প্রথমত ইদু কন্টাকটর, দ্বিতীয় যাত্রাদলের ম্যানেজার সুবল ঘোষ। এই দুজনই উঠে এসেছে নিম্নবর্গ থেকে। ইদু কন্টাকটরেরও আছে বেদনাময় ইতিহাস।

ইদু: সোনাইলার হুরমুত কাজীর বাড়িতে পেটেভাতে খাটতাম। এক বেলা ভাত– দুই বেলা ফেন।[১২৫]

কিন্তু বিত্তশালী হওয়ার পর সেই হয়ে ওঠে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক নির্ণায়ক। ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর কারণে এই রূপান্তর তাকে করেছে ক্ষমতাবান। অর্থবিত্ত অর্জনের অব্যবহিত পরে শ্রেণিগত স্বভাববশে সে নিজেই এখন সামাজিক রূপান্তর সাধনে তৎপর। অর্থাৎ যে শোষণযন্ত্র সমাজের পেশাগত রূপান্তরকে ত্বরান্বিত ও দ্রুততর করে, ইদু তার চালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ।'[১২৬] তবে চলতি অর্থে সে ভিলেন নয়। যদি ইদু কন্টাকটরকে এ ধারায় দাঁড় করানো যায় তবে সূক্ষ্মভাবে আবিষ্কার করা যাবে যে, সে শ্রেণিসমাজদ্বন্দ্বে ভিলেন যতটা তারও বেশি হীন স্বভাব প্রবৃত্তিতাড়িত ব্যক্তি, সে প্রকৃতির স্বভাবের মতো যেন বিষাক্ত এক সাপ– অপ-মানুষের অপরিবর্তনীয় প্রত্নছাঁচ যে একালের দুর্বৃত্তরূপে বহন করছে। যেন সমাজ-অর্থনীতি নয়– খরা-ঝড়ই তাকে শোষণের অসীম ক্ষমতা যোগায়।[১২৭] ইদু কন্টাকটরের মতোই নাটকের নিম্নবর্গের চরিত্রগুলোও যেন পরিণতি অনিবার্যতার দিকে ধাবমান। তাদের কারো কিছু করার নেই। একটি অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর প্রেক্ষাপটই সেখানকার মানুষের চিন্তা-চেতনা গঠনে মূল ভূমিকা পালন করে। নাট্যকার মেলায় আগত মানুষের বেদনা, দুঃখ, বঞ্চনা, প্রতারণার কথা বলেছেন সত্য, কিন্তু কোনো বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ আমরা সেখানে পাই না। সেলিম আল দীন নিম্নবর্গের জীবনবঞ্চনার খণ্ড খণ্ড ছবিই উপস্থাপন করেছেন শুধু।

সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি যে সব মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে শ্রেণিগত কারণেই তারা প্রায় শোষক হয়ে ওঠে। তারা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কিন্তু এর মধ্য থেকেও নিম্নবর্গ নিজেদের মতো একটা অর্থ তৈরি করে নেয়। তাই এক সময়ের রাজনৈতিক নেতা মওলানা ভাসানী তাই এখন তাদের কাছে রূপকথা, উপকথা, পুরাণের স্মৃতিচারণের মতো। তারা ভোলে না ইতিহাস, দাঙ্গা, সাধের জয় বাংলা।[১২৮] নিম্নবর্গ তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও একদম ভুলতে পারে না। তাই তারা মনোযোগ দিয়ে বারবার শোনে মনাই বয়াতির কিসসা, *সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল*-এর কাহিনী। স্পষ্টতই নাট্যকার নিম্নবর্গের যাপিত জীবনকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তবে কোনো রাজনৈতিক চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়। বেঁচে থাকার সংগ্রামে তাদের বারবার রূপান্তরের রূপায়ণই নাট্যকারের অভীষ্ট। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্রম রূপান্তরে গ্রামীণ জনজীবনের যে পরিবর্তন হয় তা নিম্নবর্গের জীবনে কোনো ইতিবাচক ফল বয়ে আনে না। তাদের ভাগ্যেরও কোনো পরিবর্তন হয় না তাতে। তাই আমরা দেখি, *কিত্তনখোলা* নাটকের ছিন্নমূল প্রান্তিক জনমানুষ বিভিন্ন বৃত্তে আবর্তিত হয়ে অবশেষে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। পরিবর্তিত রূপান্তরিত বৃত্তে তারা কখনো ছিন্নমূল, কখনো উদ্বাস্তু। আর কখনো ভাসমান মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকে।[১২৯] কিন্তু এ থেকে পরিত্রাণের কোনো ইঙ্গিত নাটকে পরিলক্ষিত হয় না। সমালোচকের দৃষ্টিতে– 'কিত্তনখোলার মেলায় আসা ভাঙা ও নিরন্ন মানুষগুলো অর্থনীতির পরিভাষায় প্রান্তিক চাষী, ক্ষেতমজুর এবং আরও অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পেশার বিচ্ছিন্ন ভাসমান মানুষ। কারখানা শ্রমিকের মতো তারা সংগঠিত এবং স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা সোচ্চার নয়। প্রতিশোধের আগুন তাদের অন্তর পোড়ায়, আত্মহত্যা কিংবা খুন করে সে আগুন নেভায়। সচেতন সক্রিয়তা নেই তাদের। আত্মধ্বংস কিংবা হত্যা করে দেশান্তরী হওয়ার মধ্যে বিদ্যমান সঙ্কটের সমাধান নিহিত নয়। এই সত্য তারা নিজেরাও উপলব্ধি করতে পারে না– অন্য কেউ সে বিষয়ে তাদের সচেতন করতে প্রয়াসীও নয়। তারা অসচেতন– কারণ নিরক্ষর। তাদের প্রতি সমাজের কোনো দায় নেই যেন– ফলে শত্রুকে খুন করে কিংবা আত্মহত্যা করে, কিংবা তার প্রতি কৃত অন্যায়ের জন্য স্রষ্টার নিকট ফরিয়ার করে চোখের জল মুছতে দিনমজুরর পেশা গ্রহণ করে। এই অনগ্রসর জনমানুষ নিয়েই কিত্তনখোলার মেলা– বাংলাদেশ। তাদের বিশ্বাস মধ্যযুগীয়। কোনো বিপ্লব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজ ব্যবস্থার

পরিবর্তন ঘটেনি, প্রত্যেকে আধিপত্যবাদী শক্তির নিকট নীরবে আত্ম সমর্পণ করেছে– সংশ্লেষ সমন্বয়কেই ধর্ম জ্ঞান করেছে।'[১৩০] ফলে কোনো পরিবর্তন তারা করতে পারে না। স্বতঃস্ফূর্ত এবং সমষ্টিগতভাবে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী এবং অধিকার আদায়ের যে সংগ্রাম তাও নাট্যচরিত্রগুলোর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

বিস্তৃত পটভূমি ও মহাকাব্যিক আয়োজনের আরেকটি নাটক *কেরামতমঙ্গল* (১৯৮৮)। এ নাটকের বিষয়কে নাট্যকার কোনো একক স্থান-কালে সীমাবদ্ধ করেননি। বাংলা জনপদের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়-গোষ্ঠী ও নানা জাতের মানুষের সুখ-দুঃখের ঘটনা *কেরামতমঙ্গল* নাটকের কাহিনী বৃত্তে স্থান পেয়েছে।[১৩১] ১৯৪৬ এর ভারত বিভাগ-পূর্ব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে আরম্ভ করে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক অনিশ্চয়তা এবং একাত্তরের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক টানাপড়েনে নিম্নবর্গের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের উত্থান-পতন, করুণ পরিণতি নাট্যকার ব্যক্ত করেছেন *কেরামতমঙ্গল*-এ। কোনো একক কাহিনী এতে নেই। মানবসৃষ্ট নারকীয় ভুবনের নখলা, চন্দ্রকোনা, ফইট্যামারী, হিজড়া, হাজং-অধ্যুষিত অঞ্চল, হাজত, বিরিশিরি, একিনপুর, রাজাকারদের ক্যাম্প, জলসুখা লঞ্চঘাট, বিবাহের আসর এবং বাসর, কুসুমপুর, চানতারা (ক ও খ) প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের মধ্য দিয়ে কেরামত এক জীবনে যে সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তারই খতিয়ান *কেরামতমঙ্গল*।[১৩২] প্রতি খণ্ডের স্বল্পায়তনের ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে নাট্যকার নিম্নবর্গের মানুষের জীবনের নানাদিক স্পর্শ করেছেন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, হাজং, গারো, জমিদার-প্রজা মুক্তিযোদ্ধা-রাজাকার, রাজনীতিবিদ, কৃষক, মাঝি, শ্রমজীবী মানুষের যে জীবনচিত্র এতে উপস্থাপিত হয়েছে তার দর্শক, কথক কেরামত। প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সে জড়িয়ে গেছে। নাটকের প্রতিটি খণ্ডে যে জীবনচিত্র সে দেখে তা প্রকৃত অর্থে দোজখ সদৃশ।[১৩৩] আর এর শাস্তি পেতে হচ্ছে তার মতো নিরীহ, বোকা ধরনের এক মানুষকে। শাস্তিই যেন তার অনিবার্যতা। আদম সুরতের কাছে আর্জি জানানো ছাড়া আর কোনো কিছু তার করার নেই।

নাটকের প্রথম খণ্ডের নাম 'নখলা খণ্ড'। প্রথম থেকেই নাট্যকার নিম্নবর্গের জীবনের প্রতিবাদ, শোষণ, বঞ্চনা, সাম্প্রদায়িক চেতনা উপস্থাপন করেছেন। ১৯৪৬ সালে বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে বিষবাষ্প ছড়িয়ে গিয়েছিল, নাট্যকার তার উৎসের কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই সত্যটি তিনি বলতে চান যে, বাংলা-অঞ্চলের প্রতিটি দাঙ্গার কেন্দ্রে রয়েছে নিম্নবর্গের মানুষের ওপর উচ্চবর্গের আর্থ-সামাজিক শোষণ। দাঙ্গায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই প্রতিদিনের শোষণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের হিংসাত্মক প্রকাশ ঘটায় তারা। এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা মানুষ। মির্জা আর হরিশ দুজনই কেরামতের বাবা ছবরালি, অখিলদ্দির মতো কৃষকদের অর্থনৈতিক সংকটের সুযোগে অর্থ ধার দেয়ার নামে শোষণ করে। কিন্তু এ থেকে মুক্তির কোনো উপায় তাদের জানা নেই। একজনের থেকে টাকা নিয়ে অন্যজনের টাকা শোধ করতে হয় তাদের। তাই দুজনের প্রতিই তাদের ক্ষোভ। কিন্তু কারো প্রতি বেশি কারো প্রতি কম। এই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করতে চায় মির্জা ও হরিশ। কিন্তু কৃষকরা এটি উপলব্ধি করতে পারে না। টাকা শোধ করতে না পারার কারণে হরিশ মহাজন ষাঁড় নিয়ে যেতে চাইলে তার প্রতিবাদ করে ছবর।

ছবর: : ফালা কো। আমার ফালা কো। অরে খাইছি আমি। খবদ্দার মাজনের বাচ্চা– আমার গরুর গতরে হাত দিবি না।[১৩৪]

এই প্রতিবাদ ছবরের নিজের তাগিদে। নিজের বেঁচে থাকার অবলম্বনকে সে রক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটি পরবর্তীকালে এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার উৎসে পরিণত হয়। এই ঘটনাটি ব্যবহার করে মির্জা স্বার্থ উদ্ধার করতে চায়। তার উদ্দেশ্য দাঙ্গা লাগিয়ে হিন্দুদের সম্পত্তি দখল ও

স্বার্থ হাসিল করা। তাই হরিশ মহাজনের টাকা শোধ করার জন্য কেরামতের বাবা মির্জার কাছে আসলে সে 'সুদ হারামের' দোহাই দিয়ে টাকা ধার দেয় না। কিন্তু আসল কারণ:

মির্জা: আহ। আস্তে ক। ছবর ফজরে আমার কাছে টেকা চাইবার আইছাল হরিশ মাজনের দেনা শোধ করনের মতলবে। তয় আমি তারে ফিরায়া দিছি। কিন্তুক আমি তারে কর্জ দিলাম না ক্যান বুজছাস– আরে আমি যদি কর্জ দিতাম তো ছবর কি হরিশ মাজনরে এবা কইরা গলা টিপা ধরতো। না হরিশ মাজন টেকার বদলে ছবরের গরুর দড়িত হাত দিত।[১৩৫]

কিন্তু কৃষকরা সেটা অনুধাবন করতে পারে না। তাই মির্জা বা হরিশ মহাজনের মতো লোকেরা খুব সহজে নিজের স্বার্থে দাঙ্গা লাগাতে সক্ষম হয়। এর মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের অধিকার রক্ষায় প্রতিবাদী চেতনার পাশাপাশি চেতনার পরনির্ভরশীলতা প্রকাশ পায়। নিজের ওপর এত দিনের শোষণের বিরুদ্ধে ছবরের সোচ্চার প্রতিবাদ এবং ষাঁড়ের ক্ষেত খাওয়া শেষ পর্যন্ত দাঙ্গার কারণ হয়ে ওঠে। এর কারণ কোনো সাংগঠনিক ঐক্য না থাকার ফলে তারা প্রায়ই উচ্চবর্গের নির্দেশনা মতোই চালিত হয়। আবার প্রতিবাদের পরিণতি সম্পর্কেও কোনো ধারণা তাদের থাকে না। ফলে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে শেষ হবে এ সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। তাই ছবরের প্রতিবাদ নিম্নবর্গের ধর্মীয় বোধের উগ্র প্রকাশের কাছে শেষ পর্যন্ত অর্থহীন হয়ে যায়।

১৯৪৬ সালের কলকাতার দাঙ্গা গ্রামের মানুষের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তা থেকে ফায়দা লোটে মির্জার মতো মানুষ। অর্থনৈতিক বিভাজনের চেয়ে ধর্মীয় বিভাজনকে তারা বড় করে তোলে। এই সত্যটি নিম্নবর্গের মানুষ ধরতে পারে না। প্রথম দিকে 'আমরা চাষী আমরা হাল বুঝি– ক্ষেত বুঝি আমরা এই সবের মইদ্দে যামু ক্যান'[১৩৬] বললেও শেষ পর্যন্ত আর তাদের এই বোধ থাকে না। মির্জার কথায় প্ররোচিত হয়ে দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে। কৃষক পরিচয় নয় তখন বড় হয়ে ওঠে ধর্মীয় পরিচয়। তাই অধরকে শেষ পর্যন্ত প্রাণের ভয়ে বলতে হয়– 'না না আমি মোছলমান।'[১৩৭] তবে ধর্মীয় দিকটাই যে প্রধান ছিল না, তা নাট্যকার দেখিয়েছেন কেরামতকে বাড়ি থেকে উৎখাতের ঘটনার মধ্য দিয়ে। মুসলমান হলেও কেরামতের ওপর দয়া করেনি আসলাম, শরমালি। তারা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। কোনো প্রতিবাদ না করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সে। শুরু হয় তার মানুষ ও জীবনকে উপলব্ধি করা।

দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'চন্দ্রকোনা খণ্ড'। বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর কেরামত আসলামের কথা মতো চলে আসে তার এক খালার কাছে, যাকে সে আগে কখনো দেখেনি। এখানে এসে সে জীবনের নতুন এক উপলব্ধির সম্মুখীন হয়। মানুষের বীভৎসতা তাকে জীবনকে নরকের সদৃশ ভাবতে বাধ্য করে। খালা এবং খালাতো বোন নওশাদী কেরামতকে বেশ খাতির করলেও খালু আলিমিয়া তাকে সহ্য করতে পারে না। সামাজিক দৃষ্টিতে বোকা, পাগলা কেরামত তা সহজে গ্রহণ করে। বাচ্চা হয় না বলে স্বামী নওশাদীকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এতগুলো মুখের খাবার জোটানো আলি মিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে পেটের দায়ে নওশাদীকে কাজ করতে হয় তালুকদারের বাড়িতে। নওশাদী রাজি না হলেও তার বাবা আলি মিয়া শোনে না। এর জন্য কেরামতকেও শুনতে হয় গালাগাল:

অই শুইয়ারের বাচ্চা– নওশাদী বলে কামে যায় নাই। আইজও যাবার দ্যাস নাই না। অইরে মুচি পারায় যাস ক্যারে। মুচি পারায় তোর কোন বাপ ভাই থাহে। যা বাইরা অক্ষণে অই অর লুঙ্গি পিরান বাইর কর।[১৩৮]

বাবার অত্যাচারে বাধ্য হয়ে নওশাদী তালুকদারের বাড়ি কাজ করতে যায়। মূলত অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে আলি মিয়া কেরামত, নওশাদী ও স্ত্রীর ওপর এমন আচরণ করে। মেয়েকে কাজে পাঠালে তালুকদারের কাছে জমি বর্গা পাওয়ার আশা আছে। যার মধ্য দিয়ে বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি হতে

পারে তার। তবে লোভে সে একেবারে অন্ধ নয়। তাই নওশাদীর ওপর তালুকদারের লালসা চরিতার্থ করার কথা জেনে ক্ষেপে যায় সে। এর বেশি কিছু আর তার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

আলিমিয়া: আমার কিছু নাগবো না মুনশী সাব। শুইয়ারের বাচ্চা তালুকদার।
মুনশী: তওবা তওবা।
আলিমিয়া: ভিডাটা রাইখা আমারে কিছু টেকা দেন– আমি এ গেরাম ছাইরা গঞ্জে যামু।[১৩৯]

মেয়ের অপমানের প্রতিশোধ সে নিতে পারে না। তালুকদার গ্রামীণ ক্ষমতাবলয়ের কেন্দ্রে অবস্থান করে বলে অমর্যাদার উর্ধ্বে। এই সত্য আলি মিয়া জানে। ফলে পালানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না তার। ক্ষমতা-দ্বন্দ্বের ভুক্তভোগী হয় নিম্নবর্গের মানুষ। তালুকদার অন্যায় করলেও তার কিছু হয় না। ঠিক একই কারণে কালু এবং আয়নালের আধিপত্যবাদী চেতনার প্রতাপে বাড়িঘর ছেড়ে চলে যেতে হয় মুচিপাড়ার লোকদেরও। অন্যদিকে গ্রামের মানুষের কাছে নাপাক বলে সাব্যস্ত হওয়া নওশাদীর ভ্রূণটিকে কবর দেয়ার কারণে তালুকদারের ক্ষোভের মুখে পড়ে কেরামত। আবার উদ্বাস্তু হতে হয় তাকে । ক্ষমতার সর্বগ্রাসী চরিত্রের কাছে পরাজিত হয় আলি মিয়া, নওশাদী, কেরামতের মতো নিম্নবর্গের মানুষ।

তৃতীয় খণ্ডের নাম 'ফইট্যামারি খণ্ড'। এ অংশে সেলিম আল দীন সামন্তবাদের অত্যাচারের স্বরূপটি তুলে ধরেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে নিম্নবর্গের মানুষের ওপর গ্রামীণ জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণের মাত্রা বেড়ে যায়। তারা দিনে দিনে সম্পত্তির পাহাড় গড়ে তুলতে থাকে আর কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় থেকে শোচনীয়তর হতে থাকে। কলকারখানার প্রভূত উন্নতি এবং শেষ পর্যন্ত কৃষকদের বিদ্রোহের কারণে প্রথাটি বিলুপ্ত হলে জমিদাররা তার আগের মর্যাদা হারাতে বাধ্য হয়। শ্রেণিগত কারণেই তারা ক্ষুব্ধ হয় পুঁজিপতি ও কৃষক শ্রেণির ওপর। ফইট্যামারি খণ্ডে বিষয়টি নাট্যকার বেশ ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। জমিদার দেখেনি বলে উৎসুক দৃষ্টিতে দেখতে খোশান মহলে গিয়ে লাঠিয়ালদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়ে কেরামত। জমিদারের নির্দেশে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় সে। এ জন্য জমিদারের বিরুদ্ধে তার মধ্যে জেগে ওঠে প্রতিবাদী চেতনা। কিন্তু মনেই থেকে যায় তা, প্রকাশ পায় না।

জমিদার: এসেম্বলিতে জমিদারি উচ্ছেদের কথা চলছে। কিন্তু চাষার বাচ্চারা দেখবে কোনটা তাদের জন্য শ্রেয়। এই কুত্তার বাচ্চা। *কেরামত প্রতিবাদের ভঙ্গিতে দাঁড়ায়*। এই কুত্তার বাচ্চা। সময় আসবে যখন জোতদার আর নায়েবের মতো লোকদের কাছে তোরা হাঁটু গেড়ে বসবি কিন্তু এক কণা দয়াও পাবি না। এই– এভাবে দাঁড়িয়ে আছিস ক্যান। প্রতিবাদ! গোলামের বাচ্চা– প্রতিবাদ! যা যা এখান থেকে যা। ডাক্তার দেখ ছোটলোকের বাচ্চাটা কীভাবে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে। ওকে সরে যেতে বলো। সরে যেতে বল। কাছে আয়, থুক! কেমন মজা। *আবার থু থু দেয়*। হা হা।[১৪০]

জমিদারের এই ক্ষোভের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে কলকারখানার মালিক এবং পুঁজিবাদী কাঠামোয় উৎপাদকশ্রেণির প্রতি ঘৃণা। জমিদারের এই ঘৃণার একটা সামষ্টিক কারণ আমরা পাই। কিন্তু কেরামতের প্রতিবাদের কোনো সামষ্টিক কারণ নেই। সে তার ওপর অকথ্য গালিগালাজ শুনে প্রতিবাদের ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়ায় কিন্তু তা প্রকাশের কোনো লক্ষণ আমরা তার মধ্যে দেখি না। ক্ষমতার কার্যকারণে কেরামত ছাড়া এ অংশের সব চরিত্রই জমিদারের নির্দেশ মেনে চলে। তবে কেরামত চরিত্রগত দিক থেকে দর্শকী-চেতনা ধারণ করে বলে কোনো প্রতিবাদ নয় বরং জমিদারী প্রথার ওপর একধরনের ঘৃণা নিয়েই চলে আসে ফইট্যামারি ছেড়ে।

এরপরে শুরু হয় 'হিজড়া খণ্ড'। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে হিজড়াদের ওপর নানা বঞ্চনার কথা উঠে আসে এ অংশে। মাঘের এক রাতে কেরামতের সঙ্গে সাক্ষাত হয় অল্প বয়সী হিজড়ার।

নিজেকে সে পরিচয় দেয় মদিনা সুন্দরী নামে। হিজড়া ছলনার দ্বারা কেরামতকে দুই টাকার বিনিময়ে তার সঙ্গে যৌন-কর্মে লিপ্ত হতে রাজি করাতে পারে। ঘটনাক্রমে কেরামত আবিষ্কার করে মদিনা সুন্দরী নারী বা পুরুষ নয়। সঙ্গম ব্যর্থতায় সে ক্ষেপে যায় হিজড়ার ওপর। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তা প্রশমিত হলে সে সমব্যথী হয়ে মদিনাকে নিবিড়ভাবে কাছে পেতে চায়। কিন্তু রাজি হয় না মদিনা। প্রকৃতির বিরুদ্ধে রাগ-ক্ষোভ প্রকাশ করে আত্মযন্ত্রণা নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় সে। তার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করা ছাড়া কেরামতের আর কিছু করার থাকে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেমন কিছু করার নেই মদিনার, তেমনি সামাজিকভাবে বঞ্চিত মানুষ কেরামতের ব্যর্থ ক্ষোভ ও আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা নেই।[১৪১]

'হাজং খণ্ডে' নাট্যকার হাজং বিদ্রোহের ঘটনার উপস্থাপন এবং তার সঙ্গে কেরামতের জড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে মানবিকবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আধিপত্যবাদের প্রেক্ষাপটে আদিবাসীদের নিম্নবর্গ বলেই গণ্য করা হয়। কতিপয় বাঙালির কারণে তারা হারাচ্ছে তাদের ভূমি, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি। এর সঙ্গে রয়েছে জমিদারদের অত্যাচার। ফলে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত সহিংস পথ বেছে নেয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকে না তাদের। স্বভূমি থেকে উৎক্ষিপ্ত কেরামত চেয়েছিল জঙ্গলাকীর্ণ জমি পরিষ্কার করে নিজের একটা স্থায়ী আবাস গড়ে তুলতে। হাজং অঞ্চলের সুন্দর প্রকৃতি দেখে সেখানেই আবাস গড়ে তুলতে চায় কেরামত। কিন্তু এই জায়গাও পারস্পরিক হিংসা থেকে মুক্ত নয়। আধিপত্যের বিস্তার ও স্বভূমি রক্ষায় বাঙালি ও হাজংদের বিবাদ দেখে সে জীবন ও মানুষ সম্পর্কে আবার নেতিবাচক ধারণায় উপনীত হয়। ইচ্ছা না থাকলেও এই বিবাদে জড়িয়ে পড়ে সে। বাঙালি-গুপ্তচর সন্দেহে হাজংরা কেরামতকে বেধে রাখে। জমিদারি শোষণ ও বাঙালিদের প্রতি অবিশ্বাসের কারণে হাজংরা বেশ সংঘবদ্ধভাবে বিদ্রোহ করে। কিন্তু পুলিশী তোপের মুখে তারা বেশি দিন টিকতে পারে না। আগেই বলা হয়েছে, এখানে নিম্নবর্গ মূলত হাজংরা। সাংস্কৃতিক সূত্রে তারা ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু ক্ষমতা যেহেতু নিয়ন্ত্রণ করছে বাঙালিরা ফলে প্রশাসনিক শক্তি তাদের পক্ষে। তবু এই বিশাল শক্তির কাছে মাথা নোয়াতে রাজি নয় হাজংরা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে তারা বরাবরই অধিকার বঞ্চিত, নানাভাবে অবহেলিত। কারণ পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠরাই ক্ষমতাবান। শাসক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর নির্ভর করে ক্ষমতা লাভ করে বলে বাঙালির অন্যায় আগ্রাসন দেখেও তারা চুপ থাকে। তাই অরণ্য পরিষ্কার করে আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বের কারণে সেখানে হাজংদের জায়গা হয় না। অবিকশিত সমাজবোধসম্পন্ন এই মানুষ শাসকের চাতুর্য ধরতে পারে না। আধিপত্যবাদী চেতনার কারণেই এভাবেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দ্বারা বিতাড়িত যুগে যুগে হয়।[১৪২] তাই মানুষের প্রতি অগাধ ভালবাসা এবং সহানুভূতিবশত কেরামত বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও হাজংদের পক্ষেই সোচ্চার হয়। তার কাছে মানুষ মাত্রেই এক। হাজং বা বাঙালি নয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশের কাছে ধরা পড়ে হাজতে স্থান হয় তার।

হাজত-বাস কালে কেরামত আবার নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। ক্ষমতাতন্ত্রের নতুন একটি রূপ স্পষ্ট হয় তার কাছে। কোনো দোষ না করেও জীবনের আটটি বছর জেলে চলে যায় তার । স্বার্থ ছাড়া কোনো উচ্চবর্গ নিম্নবর্গের পক্ষে দাঁড়ায় না। তাই সহায়-সম্বলহীন কেরামতের পক্ষে কোনো উকিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু চশমা ডাকাতের মতো দাগি খুনিরা ছাড়া পেয়ে যায়। কারণ তার সঙ্গে এমপির সম্পর্ক আছে।

চশমা: ধাক্কাও ক্যা ধাক্কাও ক্যা মিয়ারা। চশমা ডাকাইতের কি এট্টা মান সোম্মান নাই। আমি এম পি খলিল সাবের লোক। আবুল দারোগায় ডেইলি সালাম ঠুহে আমারে।[১৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

তার গ্রামের অখিলদ্দি চাচার সঙ্গে ঘটনাক্রমে জেলে দেখা হয়। মির্জা তাকে মিথ্যা মামলায় জেল খাটিয়েছে। কিন্তু সে কিছু করতে পারেনি। অর্থাৎ নিম্নবর্গের মানুষের যেন নিজের ভাগ্য মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। এখানে কেরামতের পরিচয় হয় আজমত ডাক্তারের সঙ্গে। সেই সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্বে রূপ নেয়। আগে দেয়া কথানুসারে ডাক্তার ছাড়া পেয়ে কেরামতকেও ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

এরপর কেরামতের আবাসস্থল হয় বিরিশিরি, আজমত ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে। বিরিশিরি অঞ্চলে গারোদের বসতি-স্থানের নাম চিগাস্থান। নাট্যকার এখণ্ডের কাহিনীতে মূল দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখিয়েছেন প্রাকৃত জনের ধর্মবিশ্বাসের সাথে ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের দ্বন্দ্বকে।[১৪৪] দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে খ্রিস্টান মিশনারীরা গারোদের ধর্মান্তরিত করতে চায়। এর মধ্য দিয়ে তাদের সনাতন বিশ্বাস, সংস্কার হুমকির মুখে পড়ে। তবে সব গারো খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে না। ফলে তাদের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন তৈরি হয়। ছোটবেলা থেকে ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষের নির্মমতা, বীভৎসতা কেরামত প্রত্যক্ষ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মের প্রতি সে বীতশ্রদ্ধ । ধর্মকে ব্যঙ্গ করতেও তার বাধে না।

উডওয়ার্ড: শান্ত হও শান্ত হও। ভ্রাত কেরামত– মৃত্যুকালে তুমি কি ফ্রিংতালের শয্যাপাশে ছিলে।
কেরামত: ছিলাম তো। তারে শেষবার নাক্সভোমের ড্রপটা দিলাম নিজের হস্তে।
উডওয়ার্ড: তাহার আত্মা পরমপিতার স্বর্গোদ্যানে যাইবার সময় তুমি কি জাগ্রত ছিলে– তখন কি সে দুইবার যীশু যীশু উচ্চারণ করিয়াছিল।
কেরামত: ফ্রিংতালের আত্মা কোন পথ দিয়া স্বর্গে গেল সেটা আমি দেহি নাই– জবান নামনের নগে নগে আমি কাট মারছি। তাবাদা তারে আমি যীশু যীশু কইতে হুনি নাই। খালি দুইবার হিশু করতে দেখছি।[১৪৫]

ধর্ম কেরামতের কাছে মানুষের থেকে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও বাকিরা ধর্ম-জাত সাম্প্রদায়িক চেতনা দ্বারা তাড়িত। ফলে একটি লাশও তাদের হিংসাবৃত্তি থেকে রক্ষা পায় না। আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ধর্মীয় বিভেদের সুযোগে উচ্চবর্গের স্বার্থরক্ষাকারী ধর্মীয় নেতারা নিম্নবর্গের মানুষকে উত্তেজিত করে। তাদের ধর্মীয় বোধকে উসকে দিয়ে উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করে। 'নখলা খণ্ডে' হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার অনুরূপ এখানে খ্রিস্টানদের সঙ্গে আদিবাসী গারোদের সংঘাত সংঘটিত হয়েছে। নিজেদের আধিপত্যকে বিস্তৃত কিংবা প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাদ্রী উডওয়ার্ড তাদেরকে লাশ ছিনতাইয়ে প্ররোচিত করে। ফ্রিংতালের লাশ নিয়ে ধর্মান্তরিত ও সনাতন গারোদের মধ্যে মারামারি শুরু হলে কেরামত সনাতন আদিবাসীদের পক্ষাবলম্বন করে। ফলে উডওয়ার্ড পুলিশের কাছে আবেদন করলে ডাক্তার ও তার নামে হুলিয়া জারি হয়। আর সেখানে থাকতে পারে না তারা। এর মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। চিগাস্থান ছেড়ে তারা চলে আসে একিনপুরে। এখানে থাকা কালে সে শোনে কৃষকের দুঃখের কথা। কিন্তু কেরামত তাদের আশা দেয়: 'ডর নাই। জয় বাংলা আইসা গেছে।'[১৪৬] পাকিস্তান আমলে বাংলার কৃষকের অবস্থা খুব দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। তাই স্বাধীনতা যুদ্ধ তাদের জীবনে আশার আলো সঞ্চার করে। এলাকার পাকিস্তানপন্থীরা কেরামত ও আজমতের নামে নানা বদনাম রটালেও তারা গায়ে মাখে না। বরং আহত মানুষের সেবা করে যেতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বরতায় কেরামতের কাছে পৃথিবীটা আবারও দোজখ হয়ে ওঠে। তার তখন একটাই চাওয়া: 'এট্টা কতা কন দেহি– জয় বাংলার পরে সংসারে আর কুনো দোজখ থাকব না।'[১৪৭]

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়টা নিয়ে 'রাজাকার খণ্ড'। মুক্তিযুদ্ধের সময় কেরামত রাজাকরের হাতে বন্দি হয়। পাকিস্তানি কমান্ডার তাকে গুপ্তচর হতে বললে সে অস্বীকার করে। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে কি-না জিজ্ঞাসা করলে সে শেষ রাতে তার স্বপ্নের কথা বলে ব্যঙ্গ করে। ফলে বন্দিজীবনে তার ওপর নেমে আসে অমানুষিক অত্যাচার। তবু কেরামত সর্বহারা বাঙালির পক্ষেই থাকে। অত্যাচার নির্যাতনের মধ্যেও সে দেখে স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন ।

'জলসুখা লঞ্চঘাট খণ্ড'র কাহিনী স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের বাংলাদেশকে নিয়ে। স্বাধীনতার পর কেরামতের পরিচয় হয় লঞ্চে লঞ্চে বই ফেরি করা এক যুবকের সঙ্গে। যুবকের জীবন যাপনের টানাপড়েনের কাহিনী শুনে কেরামতের মানবিক হৃদয় সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। স্বাধীন দেশ সম্পর্কে ক্রমে তার মোহ ভঙ্গ হতে থাকে। জলসুখায় আর আগের মতো মাছ পড়ে না। ফলে জেলেদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। যুদ্ধ পরবর্তী অস্থিরতার কারণে মানুষের দৈনন্দিন জীবন হয়ে পড়ে বিপন্ন। আর শোনে মানুষের নানা অভাব, অভিযোগ, কষ্টের কথা।

চন্দ্রধর: গাঙ্গা ছাইরা কি জলে লাইমা মীন হয়া যাবার কও আমারে। হেই– বঙ্গবন্ধু আসিতাছে তার কাছে নালিশ আছে আমার। সোনা মিয়া বেরাঙ্গনা কিনে টেকা দিয়া– আবার মাছের আরতে আমাগোরে জোরজুলুম করে।[১৪৮]

স্বাধীন বাংলার নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন এবং খেটে খাওয়া মানুষের ওপর অত্যাচার শোষণ কেরামতকে দুঃখের নদীতে নিমজ্জিত করে। একদিন সোনা মিয়ার মাছের আড়তে সে নূরজাহান নামের এক নির্যাতিতা নারীর আর্তনাদ শুনে তার দিকে মানবিক সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়। অসুস্থ নূরজাহানকে হাসপাতালে নিয়ে যায় কেরামত। পেটের বাচ্চাকে বাঁচাতে না পারলেও রক্ত দিয়ে নূরজাহানকে বাঁচায় সে। কিন্তু ভ্রূণের জন্য মায়া ছাড়তে পারে না কেরামত। এ অংশে নিম্নবর্গের হৃদয়ের সহানুভূতিশীলতাকে সফলভাবে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। কেরামত নূরজাহানের গোঙানি শুনে মাছ ধরতে ব্যস্ত জেলে এবং চা দোকানদারের সাহায্য চাইলে তারা দ্বিধা করে না। মূলত তাদের সহায়তায় কেরামত মেয়েটিকে বাঁচাতে সক্ষম হয়।

নূরজাহানের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে কেরামতের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সফলতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। সদ্য স্বাধীন দেশে নারীদের ওপর অসম্মানের কারণে পুরো স্বাধীনতাটাই তার কাছে হয়ে পড়ে অর্থহীন। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলেও নারীদের মুক্তি মেলেনি। 'বিবাহ খণ্ডে' এই বক্তব্যটি নাট্যকার ব্যক্ত করেছেন। দেশ স্বাধীন হলেও নূরজাহানের মতো বীরাঙ্গনারা মুক্তি পায় না সোনা মিয়ার মতো লোকের কবল থেকে। স্বাধীনতার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের ভাগ্যে জোটে সামাজিক ঘৃণাসূচক রক্ষিতা নামক অপবাদ। এই পরিণতি থেকে নূরজাহানকে রক্ষা করতে গেলে আজু মেস্তরী এবং কেরামতকে বাধার সম্মুখীন হতে হয় সোনা মিয়া পোষা গুণ্ডার দ্বারা।

গুদ্দু: আজু মেস্তরি। দেশে আইন বইলা এট্টা জিনিস আছে। সোনা মিয়ার ছেমরিটা তোমার ঘরে আমরা খোঁজ পাইছি।
আজু: অহন কী করবার চাও। গুদ্দু: কী আর করমু। আপনা আপনির মইদ্দে। বাইর কইর‍্যা দাও ছেমরিটারে। আদত বাজাইরা ছেমরি। হাত বদল হয়া সোনা মিয়ার আছরয়ে আছে। যার জিনিস তারে বুঝায়া দাও।
আজু: হে আমার মায়্যা।
গুদ্দু: কবে থিকা। ব্যবসা বাণিজ্যের তালে আছ নাকি।
আজু: কুত্তার বাচ্চা– জিলভাটা টানদা বাইর কইরা ফালামু।
গুদ্দু: মুখ হামলায়া কতা ক মেস্তরি। আখেরে ঘরদোরে আগুন লাগবো। ঠিক আছে আমি নিজে টানদা বাইর করতাছি।
কেরামত: *কুড়াল হাতে উঠানে নামে।* অমানুষের বাচ্চা এক পাও আগাবি না।[১৪৯]

এ অংশটুকুর মধ্যে একই সঙ্গে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ, সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মিকবোধ প্রকাশ পেয়েছে। নূরজাহানকে না চিনলেও মানবিকবোধের কারণে তার প্রতি মমত্ববোধ তৈরি হয় আজু মেস্তরির। তাই সে গুণ্ডা গুদ্দুর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ঠিক একই কথা কেরামতের ক্ষেত্রেও বলা যায়। স্বভাবগত কারণেই সে বঞ্চিত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল। নূরজাহানের ওপর নির্মম অত্যাচার তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। তাই নূরজাহানকে রক্ষা করতে সে হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। ঘর বাধার জন্য নূরজাহানকে বিয়ে করে কেরামত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্তক্ষরণজনিত কারণে মেয়েটি মারা

গেলে কেরামত আবার নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। স্বাধীনতা, দেশ, মানুষ, জীবন আবার তার কাছে হতাশা, পাপ, নরকের সমতূল্য হয়ে ওঠে।

মৃত নূরজাহানকে নিয়ে কুসুমপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পর কেরামতের বিলাপই প্রধান হয়ে উঠেছে 'কুসুমপুর খণ্ডে'। নদী সংলগ্ন পরিবেশ ভরে ওঠে তার আহাজারিতে: 'এইটা সুখের নাও না– গুদারা না– বাইচের নাও না– এইটা দুঃখের নাও। এই নাওতে এক বেরাঙ্গনার লাশ– এই লাশ কুসুমপুরে যায়।'[১৫০] কেরামতের বক্তব্য স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের নিম্নবর্গের মানুষ, বিশেষ করে নারীদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। অনেক রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা তাদের কাছে আত্মদহন ছাড়া শেষ পর্যন্ত আর কোনো অর্থ বয়ে আনতে সক্ষম হয় না।[১৫১] ফলে প্রিয়জন হারানোর বেদনায় বিলাপই হয় তাদের ভাবপ্রকাশের একমাত্র উপায়।

দুইভাগে বিভক্ত 'চানতারা খণ্ড'র প্রথম অংশে নাট্যকার তুলে ধরেছেন মুক্তিযোদ্ধা ও নারীদের শোচনীয় পরিণতি। স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলার কৃষকদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তাদের জীবনের কোনো উন্নতি হয়নি। একাত্তর-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের গ্রামীণ মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র ধরা পড়ে এখানে:

রফিক: আমার ঠ্যাঙের ঘাও এর মধ্যে নালি অইছে। আবার ঢাকায় গিয়া হাসপাতালে ভর্তি হওন নাগবো। হারাটা দিন ঘুরছি। এট্টা পয়সা ধার পাইলাম না। মজলিশরা মশকরা কইরা কয় তোর আবার টেকার অভাব কী। জমি গিরাপী করবার চাইলাম মানুষ কয় মুক্তির জমি গিরাপী নুইয়া কি জেল ফাঁস খামু।
নেতা। অ।
রফিক। যুদ্ধ শেষ হয়া সারে নাই কাহা– মানুষগুলানের ভিতরে য্যা দয়ামায়া উইঠা গেছে।
নেতা। সত্য বাজান। নয় সমরুদ্দির মাও না খায়া থাকে ক্যা। এতিম বশরের ভিডামাডি দহল কইরা নিল ক্যাম্বায় মজলিশরা।[১৫২]

চানতারা গ্রামে এসে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের সংকটময় অবস্থা দেখে আবারও কেরামত হতাশায় মুষড়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের জমি জায়গা দখল হয়ে যাচ্ছে। তবু কেউ প্রতিবাদ করছে না। ক্ষমতার দাপটে বশরের মতো ছেলেরা হয় আশ্রয়হীন। চানগ্রামে এসে নেতা ফকিরের বাড়িতে থেকে সদ্য স্বাধীন দেশের বিপর্যস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে। ফকিরের মেয়ে শমলার করুণ জীবন-কাহিনীও তাকে স্বাধীনতা ও জীবন সম্পর্কিত প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। গোসল করতে গিয়ে কানের দুল হারিয়ে ফেলার কারণে স্বামী ও শ্বশুরের হাতে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয় মেয়েটি। সামান্য এই ঘটনার কারণে তারা শমলাকে তালাক দিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। প্রচণ্ড মারের কারণে মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে। দেশ স্বাধীন হলেও নারীদের কোনো মুক্তি ঘটেনি। সামান্য কারণে অত্যাচার পাকবাহিনীর অত্যাচারের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কেরামত এ সত্য সহ্য করতে পারে না। মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখাও তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে। ফকিরের ছেলে ছোভান ডাকাতি করতে গিয়ে নিহত হলে কেরামত আরো হতাশাগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয় অংশের কাহিনীর মধ্য দিয়ে নাট্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সহজ-সরল মানুষের পরিণতি তুলে ধরেছেন। একদিন এক ভিখারি এসে কেরামতে কাছে থাকার জন্য আশ্রয় চায়। এই ভিখারি নখলা গ্রামের অধরচন্দ্র। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় যে চলে গিয়েছিল আসামে। কিন্তু সেখানেও দাঙ্গা লাগে বাঙালি ও অসমীয়াদের মধ্যে। ফলে মানুষের সভ্যতা যেন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। নেতা ফকির এলাকায় প্রভাবশালী বলে তাকে হটানোর জন্য মজলিশরা সব সময় সুযোগে থাকে। ছোভান ডাকাতি করতে গিয়ে নিহত হলে তারা আরও বেশি ক্ষেপে যায়। ঘটনাক্রমে একদিন জানাজানি হয় পাগলা বসিরের সন্তান শমলার গর্ভে। কলঙ্কের হাত থেকে মেয়েকে বাঁচানোর জন্য নেতা ফকির ভ্রূণ নষ্ট করার কথা বলে। কেরামত বাধা দেয়। তার কাছে মানুষ হত্যা আর ভ্রূণ হত্যা একই। শমলাও রাজি হয় না। শেষে ফকির রাগে মেয়ের গলা টিপে

ধরলে কেরামত বাধ্য হয়ে শমলাকে ভ্রূণ নাশক ওষুধ খাওয়াতে রাজি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানবিক বোধের কারণে সেটি না করে বশর আর শমলাকে নিয়ে পালিয়ে যায় সে । কিছু দূর গিয়ে এলাকার ক্ষুব্ধ লোকদের হাতে ধরা পড়ে। গ্রামবাসী তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে। শেষ পর্যন্ত কেরামতের দুচোখ অন্ধ করে ছেড়া জুতোর মালা পরিয়ে গ্রামে ছেড়ে দেয়া হয়। তাকে করে তোলা হয় গ্রীক ট্রাজেডির ইডিপাস। ব্রিটিশ আমলের শেষে ও পাকিস্তান জন্মের পর রাজনৈতিক নানা উত্থান পতন কিংবা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা এসব কেরামতদের মতো সাধারণ মানুষদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা দিতে পারেনি। তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে পারেনি। এই বক্তব্যের সঙ্গে নিম্নবর্গের মানুষের ভেতরকার নানা দ্বন্দ্ব নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন কেরামতমঙ্গল নাটকে।[১৫৩] খুব দরদ দিয়ে সেলিম আল দীন এখানে নিম্নবর্গের মানুষের ওপর উচ্চবর্গ ও সামাজিক প্রথার নানা শোষণ তুলে ধরেছেন। মির্জা, হরিশ মহাজন, চুন্নু মিয়া, উডওয়ার্ড ছাড়া বাকিরা নিম্নবর্গের। গারো, হাজং, কেরামত এবং বাঙালি নিম্নবর্গের মানুষের যে পরিণতি, তা সংঘটনের পেছনে তাদের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। উচ্চবর্গের লোকই স্বার্থ হাসিলের জন্য তাদের ব্যবহার করেছে। কিন্তু চেতনার পরনির্ভরশীলতার কারণে এটি তাদের বোধে কোনো সক্রিয় কর্মস্পৃহা তৈরি করে না। ফলে নিজের পরিণতি শুধু তাদের দেখে যেতে হয়। যেমন দেখেছে কেরামত, অধর, হাজং কিংবা গারোরা। টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যকার প্রকাশ করেছেন মানব জীবনের অসহায়ত্ব– যার দ্রষ্টা কেরামত, বাংলাদেশের নিম্নবর্গ মানুষের প্রতিনিধি। তবে সাধারণের থেকে একটু আলাদা। নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে প্রতিবাদ, পরনির্ভরশীলতা, চেতনার অস্পষ্টতা, সহমর্মিতা সবই কেরামতের মধ্যে দেখা যায়। তবে যে বৈশিষ্ট্য তাকে আলাদা করে তুলেছে সেটি হলো মানুষের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা। এর কারণেই পৃথিবীতে শেকড়হীন, বৃন্তচ্যুত, আশ্রয়হীন কেরামত একের পর এক মানুষের ভয়াল রূপ পরিদর্শনের পরও আশায় বুক বেধে আবার পথে নেমে পড়ে। স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি দেয়। জাগতিক পরিবেশ সম্পর্কে, শ্রেণিশোষণ সম্পর্কে, মানুষের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে কমই জানে।[১৫৪] তাই খুব সহজে সবাইকে সে আপন করে নিতে পারে এবং একই কারণে নিম্নবর্গের মানুষ ও নিজের অসহায়ত্ব, অক্ষমতার কারণে আদম সুরতের কাছে আর্জি জানানো ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। জীবনের চলতি পথে সে যত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তার প্রত্যেকটি যন্ত্রণাদায়ক। মানব-ইতিহাসের জন্য অবমাননাকর। ভয়াবহ সেই সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তার হৃদয় রক্তাক্ত হয়, ক্ষত-বিক্ষত হয়, তবু প্রতিবাদ করার কোনো তীব্র ইচ্ছা তার মধ্যে জাগে না।[১৫৫] নাটকটিতে নাট্যকার বর্তমানে দাঁড়িয়ে মূলত বাংলার ইতিহাসকে অবলোকন করার চেষ্টা করেছেন। তবে তা শাসক, সমালোচক বা কোনো সচেতন দেশপ্রেমিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়। কেরামত নামের এক সহজ-সরল-বোকা ধরনের দেশ-জাতি-জাতীয়তার চেতনামুক্ত এক লোকের দৃষ্টিতে। তাই বাঙালি, হাজং, গারো নয়, সমস্ত মানব জাতি– এমন কি মাতৃ-উদরে বেড়ে ওঠা অপুষ্ট একটি ভ্রূণও তার অশ্রুসিক্ত ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয় না। নাট্যকার শেষে ব্যক্ত করেন:

> যে এই নাটক দেখে সে যেন শমলার অপরিপুষ্ট ভ্রূণের নিরাপত্তা বিধান করে। পৃথিবীর সমস্ত ভ্রূণের জন্য যেন সে মমতার হাত বাড়ায়। মানব জনমকে সামাজিকগণ যেন স্বাগত জানায়। এই নাটক দর্শনে বন্ধ্যা নারী যেন ফলবতী হয়।[১৫৬]

কেরামত আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচারে নিম্নবর্গের হলেও মানবতার দিক থেকে মহান আদর্শের দিশারী। শেষ পর্যন্ত মানুষের কল্যাণই তার চাওয়া। তাই মহাকাব্যিক আবহের নাটকটিতে নিম্নবর্গের বাকি চরিত্র সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, পারস্পরিক ঈর্ষা, অলৌকিক বিশ্বাস, লোভ, দ্বন্দ্ব, হিংসা, একই সঙ্গে শ্রেণিমানুষ ও শ্রেণির প্রতি আস্থাহীনতা ও সহমর্মিতা, বোধ-চেতনার জড়তা এবং উচ্চবর্গের প্রতি নির্ভরশীলতা থাকলেও এর কোনোটাই কেরামতের মধ্যে দেখা যায় না। একজন নিম্নবর্গের মানুষ প্রতিনিয়ত জীবনযুদ্ধে লিপ্ত থেকেও কতটুকু মহান হতে পারে কেরামতের মধ্য দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যেন সেটাই তুলে ধরেন নাট্যকার। ফলে নিম্নবর্গের সামষ্টিক রূপটি যেমন এখানে উঠে আসে না তেমনি ব্যক্তিক হাহাকার-আর্তনাদও সামষ্টিক প্রতিবাদী চেতনা রূপে আবির্ভূত হতে পারে না।

কিত্তনখোলা এবং *কেরামতমঙ্গল*-এর মতো মহাকাব্যিক আবহের আরেকটি নাটক *হাতহদাই* (১৯৯৭)। এই তিনটি নাটককে ট্রিলজি বললেও অত্যুক্তি হয় না। তবে তা বিষয়ের নয়, ফর্মের।[১৫৭] *হাতহদাই* নাটকে সেলিম আল দীন বঙ্গ জনপদের উপকূলবর্তী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্র উপস্থাপন করেছেন। নাটকের সব চরিত্রই দরিদ্র; দুঃখে-কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করে, তবু তারা জীবনকে ভালোবাসে। কেউ মরতে চায় না। এখানে জীবন দুঃসাহসী, নিত্য সংগ্রাম-মূখর। এক নিরাভরণ গল্পের মাধ্যমে নিম্নবিত্ত মানুষের স্বরূপ উন্মোচন করে দেখিয়েছেন নাট্যকার।[১৫৮] *হাতহদাই* সাতসওদা শব্দের আঞ্চলিক রূপ। তবে নাট্যকাহিনীতে কোনো সওদা বা বাণিজ্যের ইঙ্গিত নেই। আনার ভাণ্ডারি, আঙ্কুরী, মোদু, ছিদ্দা, চুক্কুনী, হাস্না, নাড়ু, নারু, মশলন শা, ইদ্রিছ, লুত্তা, লেদন প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার উপকূলবর্তী মানুষের জীবনসত্যকে তুলে ধরেন। এর কাহিনী আবর্তিত হয়েছে আনার ভাণ্ডারিকে ঘিরে। তবে একক কোনো কাহিনী এতে নেই। বহু কাহিনীর সম্মিলনে নাট্যকার বেঁচে থাকার সংগ্রামকেই সত্য বলে উপস্থাপন করেছেন। দক্ষ নাবিক যেমন সমুদ্রের চরম বিক্ষুব্ধতার মাঝেও হাল ঠিক রেখে এগিয়ে যেতে চায়– এর চরিত্রগুলোও তেমনি। প্রত্যেকের জীবনের গল্প কখনো স্বল্প কখনো বা বিস্তৃত পরিসরে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। জাহাজি মোদু আনার ভাণ্ডারির চিঠি পেয়ে ফিরে এসেছে জন্মভূমি চর চান্দিয়ায়। তেইশ বছর আগে সে তার সৎ মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়েছিল। তার বয়স তখন তেরো-চৌদ্দ। আনার ভাণ্ডারির আহ্বানে ফিরে এসে সে আবার জন্মস্থানে সংসার পাততে চায় হাস্নার সঙ্গে। কিন্তু বিবেকের কাছেই বাধা পায়। কারণ সে বিবাহিত, 'ডেঞ্জারাস মেয়ে' মাসিনুকে বিয়ে করে ইতোমধ্যে সংসার পেতেছে ব্যাঙ্ককে। তাই শেষ পর্যন্ত হাস্নার সঙ্গে তার সম্পর্ক পরিণতি লাভ করে না। চরে ফিরে এসে সে সব সময় হাসি-খুশিতে থাকতে চায়। আয়োজন করে নানান খেলার। কিন্তু তার মতো আনন্দ চরের বাকিরা পায় না। কারণ জীবন যাপনের চিন্তাই তো তাদের বড় চিন্তা। মোদুর ছোট কালের বন্ধু নাড়ু সংসার চালায় বলী খেলা এবং সড়কি চালানোর মাধ্যমে। তার বাবা তোরাব মিয়া মুসাহুরের মারের কারণে জখম হয়ে মারা গিয়েছিল। সেই কষ্ট এখনো সে বয়ে বেড়ায়। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে সংসার চালালেও নাড়ু একেবারে হৃদয়হীন নয়। চর খোয়াজের মারামারিতে এক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কষ্ট এখনো তার বুকে বাজে:

নাড়ু: একখান খুন কইরছি কিন্তুক খালি মনে হড়ে আঁর। হোলাগা বড় সোন্দর– অল্প বয়স– রোঁয়াইল্যা রোঁয়াইল্যা হাত ঠ্যাং– মাত্র মোচের রেখা দেখা দিছে।
ইদ্রিছ: আমনের হাতে মইরছে।
নাড়ু: হ। ন মারিলে আঁই মইরতাম। যে তেজি। এক কোপে কান্ধেতুন বুকের দুধ হইরযন্ত নামাই দিছি। ফিনকি দিয়া রক্ত পইড়ল আঁর চোখে মুখে। কোপ খাই মাত্র কইল। ভাইছা আঁর লাশখান গুম করিয়েন না। আঁর যাতে কবর অয়– লাশগা মার কাছে পাডাই দিয়েন। আঁর মা বড় অভাগিনী।[১৫৯]

চুক্কুনী এ নাটকে প্রতিবাদী এক নারী চরিত্র। নিম্নবর্গের নারীরা আর্থ-সামাজিক কারণে নির্যাতন সহ্য করেও স্বামীর ঘরে থেকে যায়। কিন্তু চুক্কুনী তার ব্যতিক্রম। প্রথম স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল বলে দ্বিতীয় বার তাকে বিয়ে দেয়া হয় বেশ দূরে। কিন্তু সে ঘর ভেঙেও চলে আসে চুক্কুনী। স্বামীর নির্যাতন-অপমান সহ্য করতে না পেরে। পাঁচশ টাকার বিনিময়ে বাবা তাকে বিয়ে দেয় খেলাধন মাঝির সঙ্গে। স্বামীর ঘরে গিয়ে সে জানতে পারে খেলাধনের আরো দুই বউ আছে। শুরু হয় তার বাদীর জীবন। স্বামী আফিং খেয়ে ঝিমায়, আর জ্ঞান ফিরলে তাকে মারে। একদিন মারতে মারতে তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। সংসার করার শখ মিটে যায় চুক্কুনীর। সেই রাতে শুধু বিয়ের শাড়ি আর টুকিটাকির একটি পোটলা নিয়ে খেলাধনের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে অজানার উদ্দেশ্যে। নদী-সমুদ্রের

কোলে সে বেড়ে উঠেছে। পথ তার চেনা, মানুষগুলোর ব্যবহারও তার জানা। ফলে একে একে সে পেরিয়ে আসে কেয়াকাডার খাল, ভূতিমারার ঘাট, চাপরাশির হাঁট, মাছুয়াদোনার খাল, তালমোহাম্মদের হাঁট, রামপুর, কাডাখালি, ফাজিলার ঘাট। চরের পুরুষদের মতো সেও যেন হয়ে ওঠে সাগরভাসা এক মানুষ। তবে তা প্রাকৃতিক সমুদ্র নয়, জীবন সমুদ্র:

আনার: বুইঝছি– তুইও এ চরের আর দশজনের মতন সাগরভাসা হইছস। দুইবার বিয়া বইলি। দুইবার ভাঙলি ঘর। মাত্র দেড় বছরে।[১৬০]

তবে এজন্য চুক্কুনী মধ্যে কোনো কষ্ট নেই। অনুশোচনা কিংবা পাপবোধ ও জাগে না। তাই মরণ কালে তৌবা করার কথা বললে অবলীলায় সে তা প্রত্যাখান করতে পারে। আবহমান বাংলার অধিকার বঞ্চিত নারী সমাজের প্রতিনিধি সে। শাসন-কর্তৃত্বের কারণে পুরুষরা নারীকে যে অদৃশ্য শিকলে বন্দি করে চুক্কুনী সেই নিগড় ছিড়ে বেরিয়ে আসার প্রতীকী রূপ। নিম্নবর্গের হলেও নারীর প্রতিবাদী চেহারাটা ধরা পড়ে তার মধ্য দিয়ে।

আগেই বলা হয়েছে, আনার এই নাটকের কাহিনীর কেন্দ্রে। তাকে ঘিরেই অন্য চরিত্রের যাওয়া-আসা। যৌবনে পৃথিবীর নানা বন্দর ঘুরেছে সে। পরিচয় হয়েছে দেশ-বিদেশের নানান মানুষের সঙ্গে। চৌষট্টি বছরে অবসরের জীবনে সেই অতীতই এখন জীবন্ত হয়ে ওঠে। কর্মজীবন থেকে অবসর নিতে পারলেও মানবজীবন থেকে অবসর নিতে পারে না। তাই স্মৃতি হয়ে ওঠে তার বাঁচার অবলম্বন। চরবাসী মানুষকে সে একের পর বলে যায় তার সমুদ্র ভ্রমণের কাহিনী। জাহাজি জীবনের কোনো সহকর্মী মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে তাকে দেখতে চেয়েছে– একথা কোনো আগন্তুকের মুখে শুনলেই আনার বেরিয়ে পড়ে। গতিময় জীবনের প্রতি এখনো তার আকর্ষণ থাকলেও বয়স এবং সংসারের কারণে যৌবনের উদ্দাম ভ্রমণ আর সম্ভব হয় না। তবে স্থিত সংসার জীবনে সে স্বস্তি পায় না। প্রথম পক্ষের পুত্র ছিদ্দা অকর্মণ্য। আর দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র জামাল জন্ম নিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়, ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়। দস্যুবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে। সংসার জীবনের এই ক্লেদাক্ত পরিণামের কারণে জাহাজি জীবন আনারের কাছে আনন্দময়। যাপিত জীবনের এই বেদনা ভুলবার জন্য সমুদ্রজীবনের কাহিনী বলেই তাকে শান্তি খুঁজতে হয়:

আনার: হেই যে বাঁইচছিলাম, চইলছিলাম, ফিরছিলাম,– জাহাজে জাহাজে– বন্দরে বন্দরে, হে জীবনের লগে এ জগৎ সংসারে মিল নাই। হেই মিলে যার লগে মিলন হইছে তার তুনে আপন অন্তত আর কেউ নাই।[১৬১]

ফলে মৃত্যু ও জীবন দুটোই তার কাম্য হয়ে ওঠে। একদিকে জীবনের প্রতি আসক্তি অন্যদিকে মৃত্যুভাবনায় নিমগ্ন হবার বাসনা।[১৬২] ধর্মীয় আচারের প্রতি এখনো তার বিশ্বাস আসেনি। তাই পালনও করে না। এখনো গান-বাজনা, নারী শরীরের প্রতি তার আগ্রহ। বার বার তৌবা করে আর ভাঙে। এত বছর বয়সেও জীবনের প্রতি বৈরাগ্য আসে না:

আনার: যত বয়স বাড়ে দেখি কি সংসারে শোকতাপ বাড়ে। তৌবা করি কিন্তু আবার রক্তে রক্তে কি খেলা শুরু অয়– আবার ভাঙি।[১৬৩]

শরীর ও মনকে আধ্যাত্মিকতায় স্থির রাখতে না পেরে শেষমেশ সে মছলন শাকে ডেকে পাঠায়। রহস্যময় সে। 'উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে বানে তুফানে– জোয়ারে ভাটায়–মছলন শার আনাগোনা। তুক তাক তাবিজ তুমার এবং যৌনক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার গাজী সাধনা।'[১৬৪] জীবনের প্রতি আসক্ত আনারকে খালি মরণ চিন্তার দিকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সে শুনিয়ে যায় মৃত্যুলক্ষণের ছড়া। নাটকটির মূল কথা জীবনাসক্তি, ধর্মধ্বজীদের পরলোকের পুণ্য ও সুখ বিক্রির অপচেষ্টাকে উপেক্ষা করে এই জীবন, জল-হাওয়া-মাটি-নদী ও নারীর আকর্ষণ ঘোষণা।[১৬৫] সেটি করতে চেয়েছেন আনার

চরিত্রের মাধ্যমে। তাই আনার ভাণ্ডারি বার বার ফিরে আসে জীবনের অদম্য টানে। মৃত্যুলক্ষণের ছড়া শুনে তার মৃত্যু চিন্তা আসে না। এমনকি নিজের কবর কুঁড়ে আবার তা বুজিয়ে ফেলে। এর কারণ আঙ্কুরীর প্রতি তার আকর্ষণ।

আনারের অসুস্থতার কারণে ভাইস্তা এয়াছিনকে নিয়ে আঙ্কুরী আসে চর চান্দিয়ায়। তেরো-চৌদ্দ দিন নিঃসঙ্গ, অসুস্থ আনারকে সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে আবার জীবনের প্রতি আসক্ত করে তোলে। আঙ্কুরীও জীবনযুদ্ধে পোড়-খাওয়া নারী। বিয়ের কিছুদিন পর জাহাজি স্বামী দূরদেশে মারা যায়। বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন একমাত্র পুত্রও আট-দশ বছর আগে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তাদের জীবনের পারস্পরিক কষ্ট, নিঃসঙ্গতা মিশে যায় এক সঙ্গে। তাই অসুস্থ আনার রাতে ঘুমের ঘোরে আঙ্কুরীকে জড়িয়ে ধরে। এজন্য কেউ কারো ওপর লজ্জিত নয় তেমনভাবে। বরং ঘটনাটি পরস্পরকে আরো কাছে নিয়ে আসে। তাই চরটুবায় ফিরে যাওয়ার সময় লোকলজ্জার ভয় ত্যাগ করে আনারকে সঙ্গে নেয় আঙ্কুরী। তবে এক শর্তে আনার তার সঙ্গে যেতে রাজি হয়:

আনার: যামু যে এক শর্তে– ফিরত আইবি নিকি আঁর লগে।[১৬৬]

জীবন সায়াহ্নে এসে দুই নরনারী প্রেমে আবদ্ধ হয়েছে। তাদের এই মিলনের মধ্য দিয়ে নাট্যকার জীবনের জয়ই ঘোষণা করেছেন। আবার নারুর বর্ণিত কাছিম মারার গল্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় নিম্নবর্গীয় জীবনসত্য। তাদের কাছে কাছিম নারায়ণের অবতার-রূপ। অবতারকে আঘাত করা বা মারা ধর্মীয় সংস্কারগত দিক থেকে অন্যায়, পাপ। কিন্তু পেটে ক্ষুধা থাকলে আজন্ম-সংস্কার বোধও নড়বড়ে হয়ে পড়ে। বেঁচে থাকার চেয়ে বড় কিছু নেই। নারু তার জীবনসংগ্রাম থেকে এটি বুঝতে পেরেছে:

মনে মনে কই– কাইল রাইতেথুন আইজ বেলা এতক্ষণ– মা আর বইন– সকলে উপবাস– তুই আমারে মাপ করি দে দেবতা তুই নারায়ণের জলের মূর্তি– জলের রাজা– তরে আমি শিক গাঁথুম– খুন করুম– তুই আঁরে ক্ষেমা করি দে। দে ঠাউর আহার দে। ডর কি– তোর জন্ম জরমান্তর আছে– আমিত নমশুদ্র– কত কষ্টে মনুষ্য দেহ ধারণ করে আছি।[১৬৭]

ধর্ম, সমাজ নারুর কাছে মানুষের চেয়ে বড় নয়। তাই সীতা বৌদিকে বাঁচানোর জন্য ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বিয়ে করতে সে এতটুকুও পিছপা হয় না:

আনার: তোগো ধর্মের কি বিধান। বিধবা বিয়ার নিয়ম আছে নি।
নারু: বিধান মানি না। সীতা আইজতুন আঁর বউ। যদি ধর্মে না কুলায়– ধর্ম মানি না।[১৬৮]

এভাবে একের পর এক নিম্নবর্গের যাপিত জীবনের প্রেম, ভালোবাসা, সংস্কার, জীবনাভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া দার্শনিক চেতনা উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার । মহাজন কর্তৃক নৌকার মাঝির শোষিত হওয়ার চিত্রও উপস্থাপন করতে ভুলে যাননি নাট্যকার– তবে তা খুবই স্বল্প পরিসরে। বাংলার কৃষকের মতো বেশির ভাগ মাঝিরই নিজের কোনো নৌকা নেই। অন্যের নৌকায় কাজ করে তাকে সংসার চালাতে হয়। জীবিকার তাড়নে সপ্তায়, চৌদ্দ দিনে একবার বাড়িতে ফেরা হয় তার। তবু তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন করতে পারে না। নৌকার মহাজন ইচ্ছে মতো তাদের শোষণ করে:

মাঝি: খালি কি কষ্ট। হারা দিন কাম শেষ করি হাতে আসে দুই সোয়া দুই টেঁয়া– মরিচ ডলি কনমতে ভাত খাই– জগতে যত শয়তান আছে– নৌকার মহাজনেরা তাগোর ওঁচে।[১৬৯]

স্পষ্টতই, কোনো প্রতিবাদী বোধ তাদের নেই। শুধু অভিশাপ দেয়া কিংবা স্বশ্রেণির কারো কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু তার পক্ষে করা সম্ভব না। নদী, চর, সমুদ্রকে কেন্দ্র করে এই সব

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের জীবন-জীবিকার উত্থান-পতন। প্রতিদিনই বেশির ভাগ সংসারে অভাব, অভিযোগ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য লেগেই থাকে। তবে এর জন্য তারা চর ছাড়তে রাজি নয়। নিম্নবর্গের মানুষের মাটি, জন্মভূমির প্রতি মায়া-মমতা প্রগাঢ়। এ নাটকে তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। না খেয়ে থাকলে অন্য কোথাও গিয়ে জীবন গড়ার চেষ্টা তাদের নেই। নাড়ু ও জামালের সংলাপে বিষয়টি ফুটে ওঠে:

নাড়ু: অভাবে বীজ ধান খাই ফালাইচি। ঘরে তোর ভাবী আইজ একমাস– শরীরে রক্ত নাই– ঠ্যাং ফুলি রইছে বিচানে হড়ি।– তারপর ধর এই কিছিমে গাঙ্গে ভাইঙলে দুই চাইর দশগণ্ডা যা আছে– চলি যাইব। আর দেখ যে নুন উডে ক্ষেতে–
জামাল: এই চর গুনার চর। এই চর ভাঙ্গি পুরা চলি যক গাঙ্গের হেডে।
নাড়ু: ফালতু কথা কইস না। এই চরে আংগো বাঁচন মরণ।[১৭০]

আনার ভাণ্ডারির ছেলে জামাল। বাবার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে বাড়ি থাকে না। তার আবাসেরও ঠিক নেই। তাই চরের প্রতি তার অত মায়াও নেই। অন্যদিকে নাড়ু চরে থাকে বলে গভীর মায়া তার ভূমির প্রতি। চরে তার কোনো জমি নেই। তার সড়কির ওপর নির্ভর করে জোতদাররা চর দখল করলেও তার কোনো অংশ সে পায় না। কারণ, জমি দখলের রাখার জন্য যে একতাবদ্ধ শক্তি সাহসের দরকার তা নাড়ুর মতো চরবাসীদের নেই। অর্থনৈতিকভাবে তারা যেমন নিম্নবর্গ তেমনি সামাজিকভাবেও। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাড়ু সড়কি চালনা করে জীবিকা নির্বাহ করে। এজন্য তার মেয়ের বিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে জীবনের প্রতি তার ক্ষোভ পোষণ করাটা স্বাভাবিক:

নাড়ু: পেট বাঁচানোর এই খেলা আর ভালা লাগে না। মেডি ভেদ করি ফালাই শুরের বাইচ্চার দুনিয়া। তার কইলজা গাঁথি ফালাই। *বলে প্রচণ্ড আঘাতে সড়কি গাঁথে। তারপর প্রোথিত সড়কির ডাট ধরে টেনে ছেড়ে দেয়– মৃত্তিকা বিদ্ধ সড়কি কেঁপে কেঁপে ওঠে।*
লুত্তা: দাগ মাইরলেই খালি জমি আপন অয়না ভাইছা। শক্তি লাগে জমি দখলে– আগে এত ভালা করি এ কথাখান বুইঝতাম না। দাদারে কই না চর ওসমানের জোতদারেরা খাস জমি দখলের লাই একত্তর অর।
নাড়ু: মরি বাঁচি কি আইয়ে যায়রে লুত্তা। ঘরে বউ কান্দের– ঠ্যাং ছাড়ে না হেতি– কয় যাইয়েন না– যাইয়েন না– যাইয়েন না। লাথি মারি বার অই আইছি।– গতকাইল আঁর মাইয়া নুরুন্নাহারের বিয়ার কথা লই লোক পাডাইছিলাম– হেতারা কয়– মানষ মাইরন্যার লগে কিয়ের কুডুম্বিতা। *সড়কি তুলে অগ্রভাগে নির্দেশ করে।* এত বড় সীমা– তার মাইধে– নাড়ুর দশ গণ্ডা জমিও নাই।[১৭১]

তবে এজন্য তারা যে কোনো প্রতিবাদে জোট হয়েছে তা নয়। বরং এই কষ্ট তাদের আরো স্ব-সংস্কৃতির কাছাকাছি করেছে। যাপিত জীবনের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার মধ্যেও তারা আয়োজন করে: বলী খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো মোরগ লড়াই। আনন্দ পরস্পরে ভাগ করে নেয় খৎনা উৎসব, খিজির নবির জারি, ভেড়ার যুদ্ধ, মাছ শিকারের বর্ণনা শ্রবণ, ডেঙ্গুইরা পাখি শিকার ইত্যাদির মাধ্যমে। এগুলো তাদের নতুন নতুন দার্শনিক বোধে উন্নীত করে। পশুর প্রতি তাদের দরদ অকৃত্রিম। তাই ভেড়ারও তারা নাম দেয় সুকানী, ছেরাঙ। উপকূবলবর্তী একটা বিশাল জনপদের মানুষের ভাঙা জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রণয়-বিচ্ছেদ, অস্তিত্ব এবং আত্মপরিচয়ের সংকটকে তিনি উপস্থাপন করেছেন বাস্তবসম্মতভাবে। উক্ত জীবনকে যথাযথ রূপায়ণে সেলিম আল দীন যে ভাষ্য রচনা করেন তাতে মিশে থাকে সমুদ্রজলের নোনা গন্ধ, শ্রমজীবী জনতার স্বেদ লাঞ্ছিত শরীরের গ্রন্থিল পেশির কাব্য কথা।[১৭২] এ নাটকে তিনি আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপস্থাপনে অতটা মনোযোগী নন, উদ্দেশ্যও তা নয়। উপকূলীয় অঞ্চলের জনপদ ও মানুষের জীবনকে ভিন্ন রীতি ও ভাষায় অভিনব এক আখ্যাননাট্য রূপে বয়ন করেন– অনেকটা কিসসাকাহিনী বয়ানের মতো।[১৭৩] ফলে নাটকে চরবাসী মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের কথা উঠে আসলেও জীবনের বহুমাত্রিক দিকের রূপায়ণে তা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মনে হয় নাটকের চরিত্রগুলো যাপিত জীবনের প্রতি ক্ষুব্ধ হলেও তার মধ্য থেকেও একধরনের উপভোগ্য জীবন তারা খুঁজে পান। ফলে প্রচলিত জীবনের কোনো পরিবর্তন বাসনা

তাদের মধ্যে জাগে না। আনার ভাণ্ডারি আঙ্কুরীর সঙ্গে চলে যায় মূলত মনো-দৈহিক শান্তি লাভের আশায়। হাস্নাকে বিয়ে করতে ব্যর্থ হয়ে মোদু ফিরে যায় ব্যাঙ্ককে। বাকিদের জীবনও শেষ পর্যন্ত থাকে পরিবর্তনহীন এবং প্রত্যেকে যেন অন্যের থেকে আলাদা। আনার ভাণ্ডারিকে কেন্দ্র করে বহু চরিত্রের আগমন ঘটলেও তাদের প্রত্যেকের জীবনবোধ ভিন্ন। তাই সমুদ্র তীরবর্তী মানুষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, দার্শনিক চেতনা ইত্যাদি *হাতহদাই* নাটকে প্রতিফলিত হলেও নিম্নবর্গীয় মানুষের সম্মিলিতি প্রতিরোধের কোনো প্রকাশই পাওয়া যায় না।

সেলিম আল দীনের নাট্য-উপাদান বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাস্তব ও সমকালীন জীবন থেকে আহরিত। সমকালীন সমাজ-জীবনের ভেতর দিয়ে তিনি রওনা হন বাংলার প্রাচীন সমাজ-জীবন ও প্রান্তিক মানুষের জনপদে; ভূমির সঙ্গে যাদের জীবন ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত।[১৭৪] এর প্রকাশ দেখি আমরা *চাকা* (১৯৯১) নাটকে। ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থান এবং স্বৈরাচারী সরকারের পতন এই নাটকের প্রেক্ষাপট। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, গণঅভ্যুত্থানে শহীদ হওয়া অনেক মানুষের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে অনেকের দাফন-কাফনও হয়নি। তবে এর বিপরীত দিকও ছিল। নিম্নবর্গ, প্রান্তিক মানুষ পরিচয়হীন অনেক লাশের দাফন-কাফন করেছে শুধু সহানুভূতিশীল ও মানবতাবাদী চরিত্রের জন্য। *চাকা* নাটকে নাট্যকার নিম্নবর্গের জীবনসংশ্লিষ্ট এই দিকটি উপস্থাপন করেছেন।

কাকেশ্বরী নদীর পাড়ের গঞ্জ এলংজানি। ভোরে ধান কাটতে যাবে এমন একটি গরুর গাড়ির গাড়োয়ান বাহের এবং দুজন পইরাত ধরমরাজের সঙ্গে সেখানকার এক হাসপাতাল থেকে অপঘাতে মৃত এক যুবকের লাশ মাত্র পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে অস্পষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দেয়ার জন্য রওনা হতে বাধ্য হয়। ঠিকানায় লেখা গ্রামের নামের সঙ্গে কোনো গ্রামের নামে পুরোপুরি মেলে না। ফলে গাড়োয়ানরা লাশ নিয়ে শুধু চলতেই থাকে। কোনো এক গ্রামের নামের সঙ্গে খানিকটা মেলে এবং লাশের নামের সঙ্গে একজন যুবকের নাম পুরো মিলে যায়। কিন্তু তারা কেউ লাশটির দায়িত্ব নিতে রাজি হয় না। অগত্যা আবার চলা শুরু হয় গাড়োয়ানদের। নয়ানপুর গ্রামের হেডমাস্টার লাশটিকে নবীনপুরের কেউ বলে সন্দেহ করলে লাশবাহী মানুষগুলো নবীনপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সেই গ্রামে গিয়ে তারা জানতে পারে লাশটি সে গ্রামের কারো নয়। সেখানে রাত কেটে ভোর হয়। স্থানীয় ষাঁড়ের সঙ্গে গাড়ির ষাঁড়ের লড়াই বাধে। গ্রামের লোকজন এতে খুব মজা পায়। কিন্তু তাদের গায়ের ষাঁড়টি হেরে যেতে থাকলে তারা একজোট হয়ে গাড়োয়ানের ষাঁড় দুটোকে আক্রমণ করে। কষ্টদায়ক অনুভূতি নিয়ে তারা আবার বেরিয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে তারা অনুভব করে লাশটি তাদের একজন সঙ্গীর মতো হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত গাড়োয়ানরা নাম-ঠিকানাবিহীন লাশটিকে কবর দেয় এক নদীর তীরে। যে মৃত মানুষটি যাত্রাপথের শুরুতে তাদের ঘৃণা, বিরক্তির উদ্রেক করেছিল সেই এখন সিক্ত হয় তাদের অব্যক্ত বেদনা, মমতা ও করুণাধারায়। যুবকটির মৃতদেহ দাফন হলে তারা চলে যায় তাদের গন্তব্যে।

এই কাহিনীর মধ্য থেকে পাওয়া যায় নিম্নবর্গের জীবনের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষের কথায় তাদের চলতে হয়। নিজস্ব চেতনা দ্বারা তারা সব সময় চালিত হয় না। দিল সোহাগীর বিলে ধান কাটার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েও তাই তাদের কাঁধে পড়ে লাশ পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব। এই পরিণতি তারা মেনে নেয়:

> বুঝতে পারে আজ ভোরে যা ঘটে গেছে তাকে এবং আশেপাশে যা ঘটবে কিছুই ফেরানো যাবে না। তখন মনে হয় আপন চটের আসনে সেঁটে গেছে সে* ইচ্ছে করলেই এখন আর গাড়ি থামানো যায় না খ্যাপের লাশটি ফেলে রেখে যাওয়া যায় না* গলা ছেড়ে চিলমারী বন্দরের গান গাওয়া যায় না।।[১৭৫]

জলিধান কাটা থেকে তাদের যে অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা ছিল এই লাশ গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার কারণে আর সেই সুযোগ থাকে না। ফলে ভেতরে-ভেতরে ক্ষোভে তারা ফুসতে থাকে। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে ধরমরাজের ওপর। সেই তাদের হাত-পায়ে ধরে লাশ পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব কাঁধে চাপায়। কিন্তু ধরমরাজ নির্দোষ– সে সরকারী ডাক্তারের হুকুম পালন করেছে মাত্র। তাই সেও ভয় দেখায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার। রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও শক্তিকে গাড়োয়ানের মতো নিম্নবর্গের মানুষের পক্ষে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রপ্রদত্ত কোনো দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য। নিম্নোক্ত সংলাপে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে:

ধরমরাজ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে* লাশ নিমো না হোহ তোমাকের ঘাড়ে নিবো লাশ* সরকারী লাশ করার কইরেছ* ভুগমান তুমার নাম ঠিকানা নেইখে রেখেছে* পুলিশ এইসে বান্ধি যাবো হুঁ হুঁ।[১৭৬]

তবু বাহের গজারাতে থাকে এবং সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না বলে শুধু ক্ষোভমিশ্রিত কথা বলাই তার ক্ষোভ দূর করার উপায় হয়:

গাড়োয়ান গজরায়* এই পঞ্চাশ টেকার একখান লুটের লিগে মুই জান দিবার চইলছং* সরকারী লাশ* নাথি মারি সরকারের কপালে।।[১৭৭]

নিম্নবর্গের মানুষ আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বিবেচনায় সমমর্যাদা সম্পন্ন মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল। তবে এর বিপরীতটাও মাঝে মাঝে ঘটে। ক্লান্তিপূর্ণ একটি দিন শেষে লাশ নিয়ে নয়ানপুরে পৌঁছালে গ্রামের লোকজন গাড়োয়ানদের খেতে বা থাকতে পর্যন্ত বলে না। লাশটি সে গ্রামের কারো নয় দেখে হেডমাস্টার তাদের নবীনপুরের উদ্দেশ্যে যেতে বলে। সেখানে এক বিয়ে বাড়িতে লাশ নিয়ে উপস্থিত হলে গ্রামের লোক তাদের নিয়ে ঠাট্টা, উপহাস, সন্দেহ করে।

তা হঠাৎ এই বিয়া বাড়িটা পছন্দ হল ক্যান। ভেবেছ নয়ানপুরের লাশ নবীনপুরে চালিয়ে দিবু এ্যা... শুন এটা বকশী বাড়ী* লাশ নিয়ে একটা ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে দু পসা লুটবে সে হবু না।[১৭৮]

এর প্রত্যুত্তরে লাশবাহী মানুষগুলো যা বলে তা নিম্নবর্গে মহত্ত্বের পরিচায়ক:

তিনজনের একজনও বলতে পারে না এ লাশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ডাকপিয়নের চেয়ে বেশী কিছু না* তবু টিটকারী আর গালমন্দ খেয়ে শক্ত হয়ে ওঠে ওদের চোয়াল* গাড়োয়ানের বুক ফেটে ক্রোধ বেরিয়ে আসতে চায়* ঠিক আছে না চিন না চিন এ লাশ হামাকের স্বজনের লাশ* ব্যাস জিরিয়ে লিবার লিগে এসেছিলাম... ব্যাস।[১৭৯]

এতটা পথ ও সময় সঙ্গে থাকার কারণে মৃতদেহটির প্রতি তারা একধরনের আত্মিক ও মানবিক বন্ধন অনুভব করে। ফলে নির্দ্বিধায় তারা বলতে পারে এ লাশ তাদের স্বজনের।

রাষ্ট্র-পুলিশ-প্রশাসন দ্বারা নিম্নবর্গের মানুষ উপকারের চেয়ে হয়রানির শিকার বেশি হয়। তাই থানা-পুলিশ সম্পর্কে তাদের মধ্যে ভীতি কাজ করে। লাশটা নবীনপুরে দাফন করতে চাইলে তাই গ্রামের মানুষ বাধা দেয়। কারণ 'এক থানের লাশ অন্যথানে দাফন হলি পরে পুলিশ কেছ হয়ে যাবু।'[১৮০]

নবীনপুর গ্রামবাসীর যে চরিত্র নাটকে প্রকাশিত তা অসভ্য ও বর্বরোচিত। গাড়োয়ান তিনজন ভাত রান্না করে খেতে চাইলেও তারা সন্দেহ করে; এবং গাড়ীবাহী ষাঁড় দুটি স্থানীয় ষাঁড়কে আক্রমণে পরাজিত করলে গ্রামবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে যায় তাদের ওপর। পালিয়েই তারা নিজেদের রক্ষা করে। ষাঁড়ের গোয়ার্তুমিকে কেন্দ্র করে আক্রমণে মানুষের জড়িয়ে পড়া নিম্নবর্গের হীনতা ও সংকীর্ণতাকে প্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নবর্গ জীবন যাপনের অভিজ্ঞতায় অনেক কিছু জানতে পারে, বুঝতে পারে। বাহের, শুকুরচান এবং প্রৌঢ় – এই তিন গাড়োয়ান লাশকে কেন্দ্র করে মানুষ সম্পর্কে নতুন এক উপলব্ধিতে পৌঁছায়। মানুষের প্রতি তাদের এক ধরনের ঘৃণা জন্মে। কারণ নয়ানপুর কিংবা নবীনপুরে মানুষের যে পরিচয় তারা পেয়েছে তা মনুষ্যত্বের জন্য অপমানজনক। ফলে কারো প্রতি আর তারা বিশ্বাস রাখতে পারে না। তাই বাজারকমিটির মেম্বার লাশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাদের আর কোনো ভাবান্তর বা উৎসাহ জাগে না। মেম্বারকেও তারা মনে করে ঐ দুই গ্রামের কোনো একজন।

অ শুকুর চান জগতের যত মানুষ মুই বিচারি দেখলু তাকর বাড়ি হয় নয়ানপুর নয় নবীনপুর। এই শালার বাড়িটাও দু গেরামের এক গেরামে হবু।[১৮১]

গ্রামের মানুষ লাশটিকে অস্বীকার করলে মানবিক বোধের কারণে গাড়োয়ানদের লাশটির প্রতি করুণা জাগে। এতটা পথ সঙ্গে করে নিয়ে আসার কারণে মৃতদেহটি হয়ে যায় তাদের কেউ একজন। শেষ পর্যন্ত তারাই লাশটিকে দাফন করে পরম মমতার সঙ্গে। নাট্যকার মহান মানবিকবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন এ নাটকে। মানুষের লোভ, হিংসা, বর্বরতা, স্নেহ, মমতা, বিবেক সব কিছু ছাপিয়ে এ নাটকে বড় হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গের মনুষ্যত্ববোধ। বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ নিত্য অভাব, দৈন্য, দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করলেও মানবতাবোধ তাদের হৃদয় থেকে মুছে যায় না। তাই শেষ পর্যন্ত গাড়োয়ানরা লাশটিকে শেয়াল কুকুরের খাদ্যে পরিণত হতে দেয় না। উচ্চবর্গের স্বার্থকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনার বিপরীতে নিম্নবর্গের নিঃস্বার্থ কর্মপ্রচেষ্টা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নাটকে।[১৮২]

'যদি এই হয় যে, উপনিবেশের উৎপাদন প্রসঙ্গে সাব অলটার্নদের কোনো ইতিহাসই নেই এবং তারা কোনো বক্তব্য রাখতে পারে না, তবে নারী তো সাব অলটার্ন হিসেবে আরও অনেক ছায়ার গভীর তলদেশে বাস করছে।'[১৮৩] ফলে পুরুষশাসিত সমাজে একজন পুরুষ নারীর কথা বস্তুনিষ্ঠ, সহানুভূতি, সহমর্মিতার সঙ্গে কতটুকু বলতে পারে?– এ প্রশ্ন একেবারে অযৌক্তিক নয়। এদিক বিবেচনায় সেলিম আল দীন *যৈবতী কন্যার মন* (১৯৯৩) নাটকে সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় নারীরা অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে তাদের ওপর আর্থ-সামাজিক শোষণ-নির্যাতনের মাত্রা বেশি। পুরুষতন্ত্র কোনো নারীর ব্যক্তিত্বকে সহজে গ্রহণ করতে পারে না। প্রতি পদে পদে তাকে হতে হয় নির্যাতন, বঞ্চনা, শোষণের শিকার। কথানাট্যের ধারায় রচিত *যৈবতী কন্যার মন* নাটকে সেলিম বিষয়টি সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন। জীবনযাপনের প্রতিটি পর্যায়ে নারীরা পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যের কারণে নানাভাবে বঞ্চিত হয়। এর যূপকাষ্ঠে বলি হয় তার ইচ্ছা, চাওয়া পাওয়া, ব্যক্তিত্ব– সব কিছুর। নিজের জীবনকে তাই নিজের মতো করে আর গড়ে তোলা হয় না। *যৈবতী কন্যার মন* নাটকে কালিন্দী ও পরী আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজ ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে যায়।

দু খণ্ডে বিভক্ত এ নাটকের প্রথম অংশে বর্ণিত হয়েছে মধ্যযুগের নারী কালিন্দীর জীবনকথা। মনসার পূজারী শ্রীকর গায়েনের কন্যা হওয়ার কারণে পারিবারিকভাবেই শিল্প-সংস্কৃতি, ধর্মসঙ্গীত বৈষ্ণবতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে শৈশব থেকে সে জানে। এই জানার পরিধি দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। কালো বলে বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় বাবা তাদের বাড়ি আশ্রিত শঙ্করের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করে। এরপর শঙ্করের প্রতি সে দুর্বল হয়ে যায়। মনে জাগে প্রেমের শিহরণ। খবরটি জানাতে শ্রীকর কালিন্দীকে নিয়ে যায় বড় মেয়ে শলপীর বাড়ি ধানকূড়া গ্রামে । সেখানে গিয়ে আলালের কাছে নতুন ধারার গীত শুনে কালিন্দী মোহিত হয়। তাতে দেবতা নয়, মানুষই দেবতার মর্যাদায় ভূষিত। আলাল তার গানের মধ্য দিয়ে কালিন্দীর পা দুটো পুজা করতে চায়। কালো বলে যে মেয়ের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছিল এই বন্দনায় নিজেকে সে নতুন ভাবে আবিষ্কার করে। মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে রচিত এই গান

তাকে আকৃষ্ট করে। শঙ্করের কথা ভুলে গিয়ে সে আলালের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়। আলালের গীতের কারণে সে নিজেকে মনসার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে থাকে:

আমি মাটির কালিন্দী নই মা– আমি নই শাস্ত্রের নানা বর্ণে রঞ্জিত। আঙুল বুলাতেই উঠে যায় তোমার গায়ের বর্ণ। সে রঙ কালিন্দীর মত জন্মের ভেতর দিয়ে রোদবৃষ্টির স্পর্শে প্রাণের সঙ্গে নয় যুক্ত।[১৮৪]

আলালের গীত তাকে জগৎ সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। ফলে এক নির্জন দুপুরে আলালের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারে না। সমাজ ও ধর্মবিরুদ্ধ প্রেম তাকে আলালের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য করে। কিন্তু অচিরেই তার মোহ ভঙ্গ হয়। যে মানবতার বাণী আলালের গানে ধ্বনিত হয়েছিল, সমাজব্যবস্থার কারণে তা আর মানুষ গ্রহণ করে না। শরীয়তপন্থার প্রবল প্রতাপে মানবজীবনসংশ্লিষ্ট গান তখন কেউ শুনতে চায় না। আবার গাইতে গেলে হামলার শিকার হতে হয়:

আসরের মধ্যভাগে একদল শরীয়তপন্থী লোক লাঠি তীর বল্লম নিয়ে কালুখাঁর দহলিজে নিমন্ত্রিত আসরে আক্রমণ করে এবং ঘোষণা করে জগতে একমাত্র ওয়াজ মাহফিল ছাড়া আর যেকোন ধরনের গানবাজনা হারাম।[১৮৫]

আধিপত্য বিস্তার ও বিস্তারকে স্থায়ী করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে স্বার্থান্বেষী মহল। শরীয়তপন্থার লোকেরা তাই আলালের গান সহ্য করতে পারে না। তার গান শুনতে সাধারণ মানুষের আগ্রহ আছে দেখে আলালও সহজে ভয় পায় না। মধ্যযুগে সামন্তশাসিত সমাজে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন প্রকট ছিল। কালিন্দী তার আজন্ম লালিত বিশ্বাস ছেড়ে আলালের সঙ্গে ঘর বাধে। তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ভিন্নধর্মের দুই নরনারীর এই মিলনকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। আসরে আসরে গান করা তাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। সংস্কৃতি, ধর্ম উচ্চবর্গ নিজেদের মতো ব্যবহার করতে চায়। বাধা পেলে শক্তি প্রয়োগ করে কার্য হাসিল করে। তাই নবাবের বেতনভোগী কর্মচারীর বাধা উপেক্ষা করে আলাল-কালিন্দীর গান কৈবর্তরা শুনলে তাদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়:

মাতাল ভূস্বামী আসরে উঠে বললেন– এই নারী কুলটা। এই গায়েন মোসলমান। আমি নবাবের খাস লোক– তগোরে ঘরবাড়ি জ্বালায়া গাঙ পার কইরা দিমু। আর তুই চল আমার মহালে।

চাষী আর কৈবর্তরা প্রতিবাদ করে। শত শত কণ্ঠে। বৃদ্ধ কৈবর্ত উঠে বলে– আমরা পীর বাতাসীর পালা শুনমু– হিন্দু মুসলমান দিয়া কি করমু– আপনে যান।[১৮৬]

এর মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের ওপর উচ্চবর্গের ক্ষমতা জাহির করার মানসিকতার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি নিম্নবর্গের নিজের ইচ্ছাকে প্রকাশ করার ক্ষমতাও বিদ্যমান। কিন্তু উচ্চবর্গের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বশ্রেণির ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করলে তার প্রতিদানও তারা পায়। তিনদিন পর ফৌজ দ্বারা তারা আক্রান্ত হয়। নিম্নবর্গ ধর্মের বিভাজনকে মাঝে মাঝে অস্বীকার করতে পারে। তাই ধর্মীয় গীত নয়, আলালের কণ্ঠে জীবনসংশ্লিষ্ট গান শুনতে তারা আগ্রহ পোষণ করে। তার জন্য অত্যাচার সহ্য করতে হয় উচ্চবর্গ দ্বারা। এর বিরুদ্ধে তারা কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলে না। জীবন যাপনের তাগিদে শেষ পর্যন্ত আলাল গাজী পীরের মুরিদ হয়। এটি সহ্য করতে পারে না কালিন্দী। কারণ আলালকে সে ভালোবেসেছে মানবপ্রেমে সিক্ত শিল্পের স্রষ্টা হিসেবে। কিন্তু সেই আলাল যখন পীরের মুরিদ হয় তখন নিজের ওপর তার ঘৃণা জন্মে:

অঘ্রাণ থেকে এই চৈত্রে আমি এক ভাসমান বেশ্যার জীবন যাপন করেছি। পুরো জীবন আমি এই লোকটির কাছে থুয়েছি এর সঙ্গে সেই সব গায়ের লোকগুলোর কোনো ভেদ নেই তারাও গীতিকে পাপ জানে– আমাকেও জেনেছিল নরকগামী। ছিঃ লজ্জায় বুক নিপাশ হয়।[১৮৭]

প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী কালিন্দীর পক্ষে আর আলালের সঙ্গে থাকা সম্ভব হয় না। সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সে। রূপান্তরিত হয় ভাসমান পতিতায়। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের ইতি টানে।

অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় না হলে মানুষের জীবনব্যবস্থা, দর্শন সব কিছু নড়বড়ে হয়ে যায়। কালিন্দীকে বিয়ে করা এবং গাজী পীরের গানের ব্যাপক প্রসারের ফলে আলাল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। শেষ পর্যন্ত নিজের চেতনার পরিবর্তন ঘটিয়ে সে মুক্তি খোঁজে। মানবিক গানের স্রষ্টা হয়ে যায় পীরের মুরিদ। আলালের এই আদর্শগত পরিবর্তন কালিন্দীকে আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে আধুনিক যুগের নারী পরীর কাহিনী। মৌরাবি পুতুল নাচ দলের মালিক মাজেদুল হকের কন্যা পরী। তার মা মনিরা বেগম যাত্রা অভিনেত্রী। প্রথম জীবনে মাজেদুল হক যাত্রা করতেন; সেই সূত্রে মনিরা বেগমের সঙ্গে তার পরিচয় এবং বিয়ে। সংসার ভালোই চলতো তাদের। কিন্তু মাজেদুল হকের হঠাৎ মৃত্যুর কারণে তাতে ছন্দপতন ঘটে। মনিরা বেগমের ইচ্ছে ছিল ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে সমাজের আর দশটা মানুষের মতো প্রতিষ্ঠিত করাবেন। কিন্তু সমাজবাস্তবতার কারণে তা সম্ভব হয় না। কারণ যাত্রা ও পুতুলনাচের লোকদের সমাজ তেমন মূল্যায়ন করে না। তাই অনিন্দ্যকে ভালোবেসে তার সঙ্গে ঘর বাধতে পারে না পরী। অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তির আশায় বাধ্য হয়ে মনিরা বেগম মেয়েকে যাত্রা দলে অভিনয় করতে পাঠান। শুরু হয় পরীর নতুন যাত্রা। মাস কাবারি চুক্তিতে পরী যোগ দেয় দেশ অপেরায়। নবাগত পরীকে নিয়ে দলের অনেকের বিশেষ করে পুরুষ অভিনেতাদের আগ্রহ তৈরি হয়। পুরো জীবনটাই তার পাল্টে যায়। নিজের প্রতি মোহাবিষ্ট হয় সে। দলের অন্যরা তাকে নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা করলে এক ধরনের আনন্দবোধ জন্মাতে থাকে তার মধ্যে। নিজের মূল্য যাচাই করার নেশায় আচ্ছন্ন হয় সে। এর মধ্যে মনিরা বেগমের দ্বিতীয় বিয়ে তার জীবনকে ওলটপালট করে দেয়। পৃথিবীর সব কিছুর ওপর তার অবিশ্বাস জন্মে। পুরুষের ওপর প্রচণ্ড ঘৃণা তৈরি হয়। কালিন্দীর মতোই আসরে আসরে তার জয়জয়কার কিন্তু জীবনের ওপর দিনে দিনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে নিজের কষ্টের অবসান ঘটায়।

মানবজীবন শিল্পের উৎস হলেও শিল্পীজীবন ও সামাজিক জীবনের মধ্য রয়েছে বৈপরীত্য। সামাজিক অনুশাসন শিল্পের পথে প্রতিবন্ধক। শিল্পসত্তার পক্ষে তা মেনে চলা কঠিন। *যৈবতী কন্যার মন* নাটকে দুই নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। শিল্প ও জীবনকে এক বিন্দুতে মেলাতে ব্যর্থ হয়ে কালিন্দী ও পরী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।[১৮৮] তবে এতে অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে আর্থ-সামাজিক কাঠামো।

দ্বিতীয় খণ্ডের নায়িকা পরী অনিন্দ্যকে ভালোবেসে ঘর বাধতে পারেনি । কারণ সমাজে পুতুলনাচ কিংবা যাত্রা দলের লোকদের অবস্থান নিম্নবর্গের সারিতে। তাই তার সঙ্গে মেলামেশা কিংবা সংসার বাধা মেনে নিতে পারে না অনিন্দ্যর পরিবার। সামাজিক বিধি-নিষেধের কারণে নিজের কাঙ্ক্ষিতকে না পাওয়ার যন্ত্রণা এবং অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্তির আশায় রকীব চাচার সঙ্গে মনিরা বেগমের দ্বিতীয় বিয়ে– পরীকে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে।

মায়ের দ্বিতীয় বিবাহের সংবাদ তাকে পৃথিবীর তাবৎ গৃহের প্রতি অবিশ্বাসী করে তুলে। সে ভাবে মায়ের এই বিবাহ এক অসঙ্গত অবিনাশী পাপ। সেই পাপের তাপ তাকেও পোড়াবে। মায়ের এই পাপ স্বেচ্ছাকৃত– পরীর ওপর এক পরোক্ষ প্রতিশোধ গ্রহণ। সে ক্রমেই মানুষের প্রতি অবিশ্বাসী ক্ষিপ্ত ও যে কোন পুরুষ হৃদয়কে রক্তাক্ত করার জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে।[১৮৯]

অর্থাৎ শুধু শিল্পজীবনের তাগিদ নয়, সমাজসৃষ্ট সংকটও পরীকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু এই দুই নারী নিজের যন্ত্রণা-বেদনা কারো কাছে প্রকাশ করেনি। এ থেকে মুক্তির কোনো উপায় বা চেষ্টাও তারা জানে না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনিবার্য শৃঙ্খলে বন্দি হওয়াটা যেন তাদের পরিণতি, নিয়তি। *কিত্তনখোলা* নাটকের বনশ্রীর পরিণতির সঙ্গে কালিন্দী এবং পরীর পরিণতির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। সামাজিক বঞ্চনার কারণে এদের ব্যক্তিহৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়। কিন্তু শিল্পজীবনের অনিবার্য মোহে এই বঞ্চনা তাদের না মেনে উপায় থাকে না। এবং শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে জীবন-যন্ত্রণার অবসান ঘটে। এই দুই নারী চরিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে নাট্যকার আবহমান বাংলার নারীর আর্থ-সামাজিক, পারিবাবিক অবস্থান উপস্থাপন করেছেন। সমাজ পুরুষশাসিত বলে কালিন্দী বা পরীর কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার নেই। উচ্চবর্গীয় এবং পুরুষতান্ত্রিক শাসনকাঠামোর কারণেই বাঁচার জন্য স্বামীর চিতা থেকে উঠে আসলে ভবানীকে পিটিয়ে মারা হয়। স্পষ্ট যে, কালিন্দী, পরী, মনিরা বেগম, ভবানী, মিঠু সবাই তীব্রভাবে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের শিকার। পাশাপাশি লিঙ্গবৈষম্যও তাদের জীবনকে আরো দুর্বিষহ করে তুলেছে। 'বস্তুত নিম্নশ্রেণির নারীদের ক্ষেত্রে শ্রেণীবঞ্চনা ও লিঙ্গবঞ্চনা এক বিন্দুতে মিলিত হয়ে তাদের জীবন দুঃসহ করতে পারে। একদিকে নিম্নশ্রেণীর অভিশাপ এবং তার সঙ্গে মেয়ে হয়ে জন্মানোর বঞ্চনা এই দুই দিক একত্রিত হবার ফলে নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা নিদারুণ দৈন্য ও রিক্ততার মধ্যে পড়েন।'[১৯০] কালিন্দী ও পরী চরিত্রের জীবনবাস্তবতা ও পরিণতি বক্তব্যের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করে।

বনপাংশুল (২০০১) বাংলাদেশের লুপ্তপ্রায় সর্বপ্রাণবাদী কোচ বা মান্দাই জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের জীবন্ত চিত্র।[১৯১] এ নাটকে উচ্চবর্গ হিসেবে নাট্যকার চিহ্নিত করেছেন বাঙালিকে। *কেরামতমঙ্গল* নাটকের হাজংখণ্ডে বাঙালির আধিপত্যবাদী চেতনার কারণে হাজংগোষ্ঠীর অস্তিত্বের সংকটকে নাট্যকার যে মানবিক বোধের তাড়নে উপস্থাপন করেছিলেন, তারই বিস্তৃত রূপ দেখি আমরা *বনপাংশুল* নাটকে। তবে এখানে হাজং নয়, মান্দাই গোষ্ঠী নাট্যকারের সহানুভূতির কেন্দ্রে । বাঙালির শোষণ-নির্যাতনে এই গোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি, ভূমি, ঘর-বাড়ি সব কিছু হুমকির মুখে। দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠছে তাদের অস্তিত্ব-সংকট। তবু মান্দাইরা আগামী দিনের স্বপ্ন রচনা করে। বাঙালির আগ্রাসী চেতনার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা তাদের সংগ্রামী মানসিকতার পরিচায়ক। এর পাশাপাশি নাট্যকার তুলে ধরেছেন তাদের বিশ্বাস, আচার, ব্যবহার, দর্শন। নাটকটির সংঘাত মূলত ভূমিকে কেন্দ্র করে। পরে তা বিস্তৃত হয়েছে সাংস্কৃতিক, পৌরাণিক বিশ্বাসের জগৎ পর্যন্ত।[১৯২] তবে শেষ পর্যন্ত নাটকটি সর্বপ্রাণবাদী চেতনা এবং মহান মানবিক বোধের ধারক হয়ে ওঠে। সেলিম আল দীনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রথম প্রকাশ *কিত্তনখোলা*। তারই ধারাবাহিকতায় *কেরামতমঙ্গল*, *হাতহদাই*। কিন্তু নাটক তিনটিতে তার সামাজিক সত্তাই বেশি প্রবল। তবে *বনপাংশুল* থেকে তার নাটক দর্শনগত নতুন একটি মাত্রা পায়। এটির মধ্যে তিনি প্রথম সর্বপ্রাণবাদী চেতনার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সব কিছুর মধ্যে প্রাণ আছে এই বিশ্বাস মান্দাই গোষ্ঠীর লোকেরা এখনও ধারণ করে। তাই বৃক্ষবন্দনা তাদের সমাজে এখনও লক্ষণীয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নাটকে উঠে আসে বৃক্ষপূজা, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মাকে বৃক্ষ-অভ্যন্তরে বন্দি করে রাখা ইত্যাদি বিশ্বাস-সংস্কার এবং আত্মরক্ষার নিয়ত সংগ্রামের মধ্যে মান্দাই গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক, পারিবারিক এবং গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবনভাবনা।[১৯৩]

টাঙ্গাইলের সখীপুর অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষয়িষ্ণু নৃ-গোষ্ঠী মান্দাই। বনের মধ্যেই তাদের বসবাস হলেও পেশায় তারা কৃষিজীবী। কিন্তু অন্ন জোগাতে সক্ষম এমন কোনো জমি তাদের নেই। তাই কাজ করতে হয় বাঙালি মহাজনের ক্ষেতে। যদিও বাঙালিদের ওপর তাদের বেশ ক্ষোভ। উৎসবে দরা নামক মদের নেশায় মাতাল হয়ে তারা স্মরণ করে নিজেদের গৌরবময় ইতিহাস আর রাগে-ঘৃণায় জ্বলতে থাকে প্রতিনিয়ত। নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সুকি। তাদের গোষ্ঠীগত বিশ্বাসের

কারণে সমাজের কাছে সে হয়ে ওঠে শিবের কুচুনী বা দুর্গার সতীন। তাই পছন্দের মানুষ অনিলের ভালোবাসা পায় না সে। শিব তাদের দেবতা। তার ভোগ্য নারীকে গ্রহণ করার সাহস অনিলের নেই। তবে সুকি এটিকে তার গুনীন দাদার চালাকি মনে করে। অন্যান্যদের চেয়ে সাহস, ব্যক্তিত্ব এবং মানবিক বোধে সে স্বতন্ত্র। নিজের মতামতকে প্রকাশ করতে সে ভীত নয়:

চোখ নাল করবা না। আমার রক্তমাংসের শরীর। শিবের মূর্তি নাই। তবে কারে ডাকব। আমি ক্যান শিবের বাসর করবো। শিবাইর কুচুনী আমি। ক্যান। তার দুগগা আছে দুগগার সতীন আছে। আমি তবে কি নষ্ট বাঙালি মহাজনগরে শরীর বিকায় যে মঙ্গলি তার নাগাল পায় না।[১৯৪]

সংলাপটি মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গীয় নারীর ব্যক্তিত্ববোধের পাশাপাশি প্রকাশ পেয়েছে বাঙালির প্রতি তাদের ক্ষোভ, বিদ্বেষ। বাঙালিরা দিনে তাদের ভূমি দখল করে নিচ্ছে। কিন্তু বেঁচে থাকার তাগিদে বাঙালির কাছেই শেষ পর্যন্ত মঙ্গলির মতো অসহায় নারীকে দেহ বিকিয়ে দিতে হচ্ছে। এ কারণে মান্দাইরা মঙ্গলিকে ঘৃণা করে। তবে যে জীবনবাস্তবতায় মেয়েটি অধঃপতনে যেতে বাধ্য হয় তার কোনো সমাধান তারা করতে পারে না। এ নাটকে শোষকের প্রতিনিধি রাজু মহাজন। কিন্তু কোথাও তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। তার নির্দেশ-মতো সুবিধাভোগী বাঙালিরা মান্দাইদের বন থেকে উচ্ছেদ করতে চায়। সহজে কাজ উদ্ধার না হলে তারা কৌশল অবলম্বন করে। মান্দাইরা প্রতি রাতে নেশাগ্রস্ত হয়। এটি যেন তাদের জীবনের একটা অংশ। এই সুযোগ কাজে লাগায় বাঙালি মহাজন। একের পরে এক তারা মান্দাইদের মদের টাকার যোগান দিতে থাকে এবং যোগান দেয়া তখনই বন্ধ হয় যখন সেই টাকার পরিমাণ মান্দাইদের পক্ষে শোধ করা অসাধ্য হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত তাদের বাড়িঘর দখল করে বাঙালি মহাজন। এই সত্যটি প্রকাশ করেছেন ফরেস্টার হাসান ও স্থানীয় বাঙালিদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে:

–তাগরে ক্ষতিপূরণ কইরা দিছে মহাজন। আর তারা যাওনের নিগাও এক পা বাড়ায়ে আছে স্যার।
– কিভাবে ক্ষতিপূরণ করলেন।
– টেকা পয়সা এটা সেটা দিয়া।
– এটা সেটা। কিটা। এ্যাঁ।
– কি বলব স্যার। এই একটা অসভ্য জাত। ওই নিরপেনকে এক বছরে ছিয়াশি বতল মাল সাপ্লাই দিছি।
– অ।
– দাম ধইরা পরতা কইরা অর ভিটার দামের সমান।
– ছিয়াশি বতলে এক ভিটা। বড়ই মূল্যবান বতল।[১৯৫]

অজ্ঞতার কারণে মান্দাইরা বাঙালিদের কাছে একের পর এক ঠকতে থাকে। বাঙালি মহাজনের টাকায় কেনা মদ তারা আরামে পান করে। তাদের হুশ হয় বাড়ি দখল নেয়ার সময়। কিন্তু তখন কিছু আর করার থাকে না।

–জান। হে হে। আমার ভিটা আমি বেচি নাই কিন্তু মহাজনের কিনা শেষ। দলিলও নেখা হইছে। কাগজে কলমে না মহাজনের চোখে চোখে হে হে।[১৯৬]

রাষ্ট্র-সরকার সব সময় ক্ষমতার পক্ষে থাকে। কারণ তার অস্তিত্বও নির্ভর করে ক্ষমতাবানদের সমর্থনের ওপর। ফলে বাঙালির সমর্থনপুষ্ট সরকার মান্দাইদের অধিকার রক্ষায় কোনো পদক্ষেপ নেয় না, বরং খাস বনভূমি থেকে তাদের তাড়িয়ে স্বভাষী কোনো লোককেই তারা বন্দোবস্ত দিতে চায়। ফলে মাতৃভূমি রক্ষার দায়িত্ব তাদের নিজেদের নিতে হয়।

– আমরা বাপ দাদার ভিটা দখল নিবার দিমু না। হ হ।
– দরকার হইলে বাঙালিদের এই ফাঙ থিকা আমরা বার কইরা দিমু।[১৯৭]

কিন্তু তারা নিজেরাই একতাবদ্ধ হতে পারে না। বরং কেউ এই সংকট থেকে মুক্তির জন্য সমাজ ত্যাগ করে কিংবা ধর্মান্তরিত হয়। পশুপতি এবং হরি চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। নাটকটির গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র অনিল। স্বভাবে সে কবি। স্বজাতির প্রতি তা গভীর ভালোবাসা। তাই আপ্রাণ চেষ্টা করে লেখার মধ্য দিয়ে তাদের সংগ্রামী ও গৌরবময় ঐতিহ্যকে উপস্থাপন করার, যা হয়ে উঠবে বর্তমানের সংকট থেকে উত্তরণের উপায়। কিন্তু তার আশা সফল হয় না। কারণ যে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর কারণে একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অধিকারী মানুষ পারস্পরিকভাবে জাতিত্ববোধে সোচ্চার হয়, সেই কাঠামোটি তাদের নেই। তারা প্রত্যেকে নিজের জীবন ও পরিবার নিয়ে শঙ্কিত। আধিপত্যবাদী বাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো শক্তি এবং সাংগঠনিক কাঠামোও তাদের নেই। ফলে প্রকৃতির কাছেই তাদের বিচার চাইতে হয়। অনিল সুকির সংলাপে বিষয়টি স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়:

– চাইর কুড়ি ছওটা মদের বতল দিয়া ভিটাটা নিয়া নিল মহাজন। এর বিচার হব না। – সুকি চিৎকার করে বলে।
– কে বিচার করব।
– এই গাছের ভিতরে যে দেবতা আছেন সে করব। ওই মগডালে বান্দরেরা করব। ওই আকাশের সূর্যাই করব। বিচার করব তারা।[১৯৮]

এই বিশ্বাস তাদের গোষ্ঠীগত। তবে প্রাকৃতিক বিচারের আশায় তারা বসে থাকে না। প্রয়োজনে প্রতিরোধও গড়ে তোলে। রাজু মহাজন নৃপেণের ভিটা দখল করার পর রাজেন্দ্রর ভিটা দখল করার ফন্দি আটে। পুরাকালের সম্পদ পেয়ে লুকিয়ে রাখার অভিযোগে পুলিশ রাজেন্দ্রকে অ্যারেস্ট করে। তার অনুপস্থিতিতে ভিটা দখল করতে আসে মহাজনের লোকেরা। এই লোভী মানসিকতার কারণে বাঙালির ওপর তাদের ঘৃণা প্রবলতর হয়:

'মনে কর ক্ষত্রিয়গণ রাজা মহিন্দরের কাল। মনে কর সেই দিন যখন অকস্মাৎ পরশুরামের দল নগরে আগুন দিল। খুন হল শিব পূজক ক্ষত্রিয়গণ। নারীগণ লুঠ হল। জ্যান্ত শিশু সন্তানগণকে ছুঁইড়া মারল অগ্নিকুণ্ডে। রাজু মহাজন। এই হারামির বাচ্চা বাঙালিরা নতুন কালের পরশুরাম। পশুর অধিক। নিরপেন কাকা গেছেন রাজেন্দ্রর কাকাও যাবেন। তবে চল দেখি কেবা কইরা রাজেন্দ্র কাকার ভিটা দখল করে।'[১৯৯]

রাজু মহাজনের কারণেই বাঙালির ওপর মান্দাইদের ক্ষোভ, রাগ, ঘৃণা। প্রতি পদে পদেই মহাজন তাদের প্রতারণা করে চলেছে। এমনকি ভিটা বিক্রি করে দিয়েও নিস্তার নেই। ভিটা বিক্রি করে বিদেশ যাওয়ার পথে মহাজনের লোক রাজেন্দ্র টাকাটাও লুট করে। তাই লুৎফর মাস্টার এবং বিশেষ করে ফরেস্টার হাসান মান্দাইদের উপকার করতে চাইলেও শুধু বাঙালি বলে অনেকে এই দুজনকে বিশ্বাস করতে পারে না। মাস্টার বাঙালি হলেও মান্দাইদের প্রতি তার অপার মমতা। বনবাসী এই মানুষদের জীবন, আবাস, সংস্কৃতি, ভাষা রক্ষায় সে চেষ্টা করে যাচ্ছে দিনের পর দিন। একারণে এলাকার দখলদার বাঙালিরা তার ওপর ক্ষিপ্ত; 'বেজন্মা বাঙালি' বলে গাল দেয়। কোনোভাবে নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না দেখে শেষ পর্যন্ত বাঙালিরা তার মাস্টারির চাকরিটা কেড়ে নেয়। কিন্তু তাতেও সে ভেঙে পড়ে না। বনবাসী এই মানুষদের শিক্ষাদানের জন্য নিজেই একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। নিম্নবর্গের মানুষ অনেক সময় নিজেদের স্বকীয়তা এবং সাংস্কৃতিক শক্তিকে অনুধাবন করতে পারে না। কিন্তু কেউ একবার তাদের সেটি বোঝাতে সক্ষম হলে তার প্রতি আনুগত্য, শ্রদ্ধা, সম্মান, মর্যাদা দিতে তারা কার্পণ্য করে না। মাস্টারই তাদের স্বকীয়তা তুলে ধরে। বাঙালির নিপীড়ন তারা যাপিত জীবনের বাস্তবতায় পেলেও ভাষিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তাদের জানতে হয় মাস্টারের মতো মানুষের মাধ্যমে।

–জান এই বেশি না পঞ্চাশ বছর আগেও তোমাগরে নিজস্ব ভাষা ছিলো বিভক্তি ক্রিয়াপদ বিশেষ্য, বিশেষণ সবই ছিল। সেই ভাষায় কথা বলতো সবাই। কেরমে কেরমে বাঙালিগো অত্যাচারে তোমাগরে মুখের ভাষাও ছাপায়া গেছে।[২০০]

বাঙালিরা আধিপত্য ধরে রাখার স্বার্থে ভাষার মতো এমন অনেক গৌরবময় বিষয়কে আত্মসাৎ করে এবং তার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণও তারা রাখে না। অন্যদিকে নিম্নবর্গীয় মানুষ নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য অবিস্মরণীয় বর্তমানকে লিপিবদ্ধ করার কোনো প্রয়োজনও বোধ করে না। সেই সচেতনতাটুকু তাদের নেই। ফলে স্ব-গোষ্ঠীর ইতিহাস, ভাষা, কিংবা সংগ্রামী ঐতিহ্যের কথা তাদের শুনতে হয় মাস্টারের মতো বাঙালির মুখ থেকে। উল্লেখ্য, অনিল তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্য নিয়ে গীত রচনা করতে চায়, যা তাদের বর্তমান সংকট থেকে মুক্তির সাহস যোগাবে। এই ভাবনাটাও সে পায় মাস্টারের কাছ থেকে। তবে তারা এতটাই জাতিগত সংকটাপন্ন অবস্থায় যে, অতীতের সংগ্রামী চেতনা এখন তাদের কাছে আজগুবি মনে হয় কিংবা বর্তমানের ভূমিতে দাঁড়িয়ে তাকে মানতে না পেরে হা-হুতাশে মরণকে বরণ করতে বাধ্য হয়:

–হ হ। তুমি মান্দাই কোচগণের আচানক চরিত গীত করলা। তারপরেই না নিরপেন বিষ খায়া মরল।
–আমারে কইছিল নিরপেন কাকা পরন কথার গান বানতে। নগদ কুড়ি টাকা দিয়া আগাম বায়না করতে গেছিল আমি টাকা লই নাই।
– তবে আমাগরে পূর্ব পুরুষের যুদ্ধে হাইরা যাওনের গীতটাই করলা।[২০১]

পৃথিবী প্রযুক্তিগতভাবে অনেক এগিয়ে গেলেও বনবাসী মানুষের জীবনে তার কোনো স্পর্শ এখনো লাগেনি। এখনো তারা বন্দুকের বিপরীতে ঢালসড়কি নিয়ে যুদ্ধ করে। তবে তাদের সম্মিলিত প্রতিরোধের কারণে অনেক সময় বন্দুকবাহিনীও পরাজিত হয়। এসূত্রে বলা যায়, রাজেন্দ্র ভিটা দখল করতে এসে মান্দাইদের সংঘবদ্ধ শক্তির কারণে রাজু মহাজনের বন্দুক বাহিনীর পলায়ন করা। এই পরাজয় আধিপত্যবাদীরা মেনে নিতে পারে না। বাঙালিরা এই ঘটনার সূত্র ধরে বহেরাতৈলে মান্দাইদের আবাসস্থলে আগুন লাগিয়ে দেয়। পুড়িয়ে মারে অনেককে। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতা থেকে যারা বেঁচে যায় তারা আজীবন বাঙালির ওপর চরম ঘৃণা পোষণ করে। তাই সোনামুখি যৌবনের দোহাই দিয়ে ফরস্টোর হাসানের কাছে যায় শুধু এক দলা থু থু দেয়ার জন্য:

ফরেস্টার কোমর জড়িয়ে ধরে সোনামুখির। তারপর এগুতে থাকে। ফরেস্টার বলে।–
–সোনামুখি তুমার মুখটা দেখি।
– দেখ। সুপুরুষ।
সোনামুখি ফরেস্টারর মুখের কাছে মুখ নিয়ে হঠাৎ শ্লেষ্মা ছুঁড়ে দেয়।–
– থুঃ থুঃ।
ঘটনার আচম্বিতায় ফরস্টোর হাসান স্তব্ধ হয়ে যায়। আলো অন্ধকারে গোখরা সাপের ফুঁসে উঠা ফণা দেখেও এতটা চমকাত না। সে মুখ মুছতে পর্যন্ত ভুলে যায়।
– তুমার স্বজাতিরা আমাগরে ঘর পোড়াইছে ভিটাবাড়ি থনে উচ্ছেদ করছে। করে নাই। থুঃ থুঃ।[২০২]

মান্দাইদের অনেকের মধ্যে আছে স্বার্থকেন্দ্রিক ক্ষমতাগ্রহণের লিপ্সা। একারণে কেউ কেউ একতাবদ্ধ প্রতিরোধের চেয়ে নিজের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে বেশি তৎপর হয়। বাঙালিদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেয়ে বিশ্বেশর চেষ্টা করে গোষ্ঠীর মধ্যে ভাঙন ধরাতে। কারণ ফাল্গুন মাসে প্রাচীন বুড়ো গুনীন মারা গেছে। আর ওদিকে বাঙালিরা আগের বার পরাজয়ের কারণে এবার আরো বেশি প্রস্তুতি নিয়ে আসছে। ফলে সে ধরে নেয় তার কথা মান্দাইরা সহজে মেনে নেবে। সংকটাপন্ন সময়ে গোষ্ঠীগত এই ভাঙন যে তাদের বিপদ ডেকে আনতে পারে এই চিন্তা তারা করে না। তাই মাস্টারের কথায় তারা ক্ষেপে যায়, সচেতন হয় না:

–তবে আইজ থনে আমার সমাজ আলাদা। আমারে যারা যারা মানবা তারা আমার লগে আহ।
লুৎফর বলে–
–কলহপ্রিয় অসভ্য কতকগুলান। মাথার উপরে খড়গ ঝুলতাছে মরণের তারা আছে সংস্কার নিয়া। বিশ্বেশ্বর, তুমি যাও এ ভিটা থিকা। অনিল যাবে না তুমার সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বেশ্বরের লোকজন লাফিয়ে পড়ে।
–তুমারে খুন কইরা অস্ত্র পূজা করব। তুমার রক্ত দিয়া অস্ত্র পূজা হব।
অনিল চিৎকার করে–
–এত বড় সাহস তগরে। খবদ্দার–। তারপর বলে–
–আমি ডরাই তগরে। তরা ত অস্ত্র পূজা ঘরবাড়ির দখল ঠেহাইতে আসস নাই। আসছাস গুণীনের মরণের পরে সুমাজ ভাগ করতে। যা ভাগ এই ভিটা থিকা। আমি গুণীন দাদার সেবক। তার নাতনী যেই বৃক্ষটারে সিন্দুর দেয় সেখানে তারে আমি পরনাম করি। আমি সুকির সমাজে থাকব। আছি।[২০৩]

মান্দাইদের অন্তর্কলহের কারণে মহাজনের লোকেরা কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই খুব সহজে বন, বাসভূমি, ঘরবাড়ি দখল করে ফেলে, নির্বিচারে হত্যা করে তাদের, নির্মম নির্যাতন চালায় নারীদের ওপর।

প্রশাসনের সঙ্গে জোতদার মহাজনের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক সখ্যতার কারণে ফরেস্টার হাসান চেষ্টা করেও কিছু করতে পারে না। বরং ট্রান্সফার নিয়ে তাকে চলে যেতে হয়। তবে নাট্যকার শেষ পর্যন্ত মানবতাবোধের প্রকাশ দেখাতে চান। তাই লুৎফর সোনামুখির সঙ্গে সংসার পাতে। আবার ধর্ষিত সুকির গর্ভে বাঙালির ঔরসজাত সন্তান বেড়ে উঠলেও অনিল-সুকি পিতামাতার অপার মমতাই ব্যক্ত করে। মহান মানবিক চেতনা প্রতিফলিত হয় নাটকের শেষে। *বনপাংশুল* নাটক সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেন: 'বৃক্ষের ভেতর প্রাণের অস্তিত্বে বিশ্বাসী সেলিম আল দীন সর্বপ্রাণবাদের উদার জমিনে রচনা করলেন বনপাংশুল নাটক। সর্বপ্রাণবাদী তিনি, এই নাটকেও তৈরি করেন এমন এক প্রকৃতিপুরাণ যেখানে রয়েছে অবহেলিত মান্দাই নৃগোষ্ঠীর সংগ্রাম ও বঞ্চনার প্রকৃতিগন্ধী পুরাণকথা। সর্বপ্রাণবাদের আলোয় পরিস্নাত নাট্যকার দেখালেন মানুষ এবং বৃক্ষ কোনোভাবেই পৃথক হতে পারে না। যারা বৃক্ষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে ধ্বংস করতে চায়, তারা আসলে মানব সভ্যতার বিনাশ চায়।'[২০৪] কিন্তু যে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক কাঠামোর কারণে বনভূমি নিধন করা হয়, স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয় মান্দাইদের– সেই কাঠামোর স্বরূপটি তিনি এড়িয়ে যান।

প্রাচ্য (২০০০) শুধু নাটকের নাম নয়। এ নাটকে সেলিম আল দীন প্রাচ্য ভাবনা ও দর্শনকেই, আরো স্পষ্ট করে বললে, বাংলার লৌকিক তৃণমূলকেই তিনি আশ্রয় করেছেন।[২০৫] এতে তিনি নব আঙ্গিকে-ঐশ্বর্যে বেহুলা-লখিন্দরের প্রণয়গাথা নির্মাণ করেছেন।[২০৬] তবে মধ্যযুগের আবহে নয়, স্বকালের চেতনায়। মূলত বাংলার প্রান্তিক মানুষের নিজস্ব দর্শন ও তার প্রবহমানতাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন এ নাটকে। নিম্নবর্গের জীবনের সার্বিক রূপায়ণ প্রাচ্য নাটকে নেই, আছে লোকজ দর্শনভাবনা এবং সংস্কৃতির স্বতন্ত্র উপস্থাপন। নিম্নবর্গের মানুষ বেঁচে থাকার সংগ্রামে অনুপ্রেরণা হিসেবে পায় তার সংস্কৃতিকে। যা উচ্চবর্গের সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী রূপের মধ্যে থেকেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। সয়ফর চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার বাংলার লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতির সেই শক্তির দিকটি তুলে ধরেছেন। *প্রাচ্য* নাটকের কাহিনী শুরু হয়েছে বিয়ের ঘটনা দিয়ে। শামুকভাঙা গ্রামের সয়ফর ভাসানযাত্রা দেখতে গিয়ে নোলককে দেখে তার প্রেমে পড়ে যায়। যে কোনো কিছুর বিনিময়ে নোলককে পেতে তার মন হয় উতলা। তাই নিজের শেষ পৈতৃক জমিটুকুও জিতু মাতবরের ছেলে আইজলের কাছে বন্ধক রেখে বিয়ে করতেও সে এতটুকু কষ্ট পায় না। কাজলাকান্দা গ্রামের নোলকই হয়ে ওঠে তার পরম পাওয়া। কোনো কৃত্রিমতা নেই তাতে। আর্থ-সামজিক অবস্থান বিবেচনায় নিম্নবর্গের হলেও ভালবাসার মানুষকে কাছে পাওয়ার জন্য সে সব কিছু করতে প্রস্তুত: 'আপনারে দেখে পাগল হইছি। রক্ত বেইচা যদি বিয়া করতে হইত করতাম।'[২০৭]

নাটকের শুরুতে বিয়েকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের বর্ণনা থেকে নিম্নবর্গের সংস্কৃতি এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার বিষয়টিও প্রতিফলিত হয়। তবে তার মধ্য থেকেও সেলিম আল দীন তুলে ধরেছেন শোষণ-বঞ্চনার চিত্র:

সাঁঝের বিবাহ বরের গৃহ প্রবেশের দর কষাকষি আশি টাকা ভাড়ার মাইকে খালি গলায় কন্যাপক্ষের নানা জনের সুর বেসুরা গান যথা সোনার ময়না পাখি রূপবানের বাড়ির দক্ষিণ ধারে বাদ্যভাণ্ড এবং শোন তাজেল গো মন না জেনে প্রেমে মইজো না। মাঝে মধ্যে মাইজভাণ্ডার শরীফের গভীর নিনাদিত গাউসুল আজম বাবা। কতকগান রেকর্ডে কতক আনন্দিত বিবাহ প্রাঙ্গণে কন্যাপক্ষের নারীপুরুষের গান। কিছু হ্যালো হ্যালো খুট খুট টোকা মাইক্রোফোন। আর কন্যার দিনমজুর পিতার সমুদয় সঞ্চয়ের যে অংশ লাল নীলে রাঙা হল তা দিয়ে কাগজের শেকল ও নানা নকশা শনের চালের বারান্দায় ঝুলানো।[২০৮]

খাওয়ার আনন্দের পেছনেও আছে কষ্টের ইঙ্গিত:

একটি মুরগি। গোল গোল সদ্য শীতান্তের ডাঁশা কয়েকটি পিঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা। এক বাটিতে সেরেক চালের পোলাও। সঙ্গে খেজুরের গুড়ের ক্ষীর।
নোলকের বাবা দিনমজুর আনাম খাঁর একমাত্র মেয়ের বিবাহে এটুকুই বিশেষ আয়োজন। সে আয়োজনের অন্ধকারে পরের জমির শস্যক্ষেত বপন রোপণ ঘাম ও শ্বাস কেউ দেখে না।[২০৯]

নোলকের বাবার যেমন শ্রমে-ঘামে কষ্টে চালানো সংসার, ঠিক তেমনি পিতামাতাহীন সয়ফরেরও। বাবা লাঠিয়াল আর মা জোতদারের মেয়ে হলেও ক্ষমতার কোনো সূত্রই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে নেই। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর দাদির কাছে থেকে বড় হয়েছে। গ্রামের শ্যামল-সবুজ প্রকৃতির মতোই তার মনটা কোমল, সহজ-সরল। তার জমি জিতু মাতবরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ঠকলেও তার কোনো বিকার নেই। নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তার কোনো প্রশ্ন জাগে না। চিরন্তন রীতি হিসেবে সে সব কিছু যেন মেনে নিয়েছে:

একবার সেই মহাজনের কাছ থিকা সুদে টেকা নিয়া গাভী কিনছিল ধবল বরণ। ভেবেছিল দুধ বেচে সুদ দিয়ে মূল টাকাটা ফিরত দিবে। কিন্তু তা হয়নি। সে জানত না দুধ বেচে মহাজনের সুদ শোধ করা যায় না। শেষমেষ দশ ডিসিম জমি দিয়ে তবে সে জেল পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং দশ ডিসিমের মাটি খাওয়া রাক্ষুসে গাভীটাকে সয়ফর দুই হাজার টাকা ধরে জিতু মাতবরের হাতেই ফেরত দেয়। জিতু মাতবরের লাভ হয় কত দিক থেকে। অনেক সুদ পেল খানিক জমির দামে আর সয়ফরের গরুটি দিব্যি আরও দৈনিক সোয়া সের করে দুধ দিতে থাকল তার চোখের সামনে। অসম্মান এই যে দুধ কামলা খাটা সয়ফরকে জিতু মাতবরের বাড়িতে দুইয়ে দিয়ে আসতে হত। গরুর দুধ দোয়াতো জিতু মাতবরের বাড়িতে সয়ফর কারণ গ্রামের সালিশে তা তার শাস্তিস্বরূপ নির্ধারিত হয়েছিল।[২১০]

জমিদারি প্রথা লুপ্ত হলেও বাংলার গ্রামীণ সমাজমানসে এখনও এই চেতনা বিদ্যমান। ফলে সমাজের সিদ্ধান্তগুলোও প্রতিপত্তিশালী লোকের পক্ষেই যায়। সমাজস্থিত বলেই সয়ফরের মতো মানুষ এই সিদ্ধান্তকে অকপটে মেনে নেয়। শোষণের নাগপাশ থকে বেরোনোর কোনো চেষ্টা তার থাকে না। তবে এজন্য তার যে কোনো ক্ষোভ নেই তা বলা যাবে না। এক রাতে সে জিতু মাতবরকে খুন করার চেষ্টাও করেছিল। প্রথমবার ব্যর্থ হওয়ার পর আর সে পথে এগায়নি সয়ফর। তার মন সব সময়, সচেতনভাবে না পারলেও অবচেতনে প্রকাশ করে জিতুর প্রতি ঘৃণা। বুঝে নেয় গ্রামীণ মাতবরের শোষণ-বঞ্চনা। তাই সাপ আর জিতু মাতবর কিংবা আইজল পরস্পরের সমার্থক হয়ে ওঠে। বিয়ের জন্য সর্বস্ব বন্ধক দিয়ে পাওয়া নোলককে যেমন সাপ অন্ধকারে দংশন করে তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়, ঠিক তেমনি জিতু মাতবর এবং তার ছেলে আইজলও নিয়ে নেয় তার জমিটুকু। সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় কৃষকের ওপর গ্রামের ভূমিমালিকদের যে শোষণ তার বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো কোনো চেতনা বা বোধ গ্রামের সব মানুষের নেই। এর প্রতিফলন পাই আমরা মৃত্যুর আগে জিতু মাতবরের কথায়:

বেবাক মাতবর যা করে আমিও তাই করছি। জমি থাকলেই কেনা বেচা থাকে সয়ফর। আমি যাইতাছি।– যে দশ ডিসিম জায়গা গাইগরু এই বছর কাইড়া নিছিলাম বোক ফিরত দিলাম। আমার পোলা আইজল থাকল। তুইত বছর ঘুরতে আবার জমি বেচবি তয় ঐ দশ ডিসিম তুই আইজলের কাছে বেচিস।[২১১]

ঋণের শেকলে যেন বাধা পড়েছে সে। তা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় তার জানা নেই। তবে বাসর রাতে স্ত্রীকে দংশনকারী সাপটি মাতবর আইজলের মতো ক্ষমতাবান নয়। খুনের বদলা খুন করার জন্য নিদ্রাহীন, বিশ্রামহীন পরিশ্রম করে সে সাপকে হাতের মুঠোয় পেতে পারে। কিন্তু সারা জীবন পরিশ্রম করলেও সে মাতবরের মুখোমুখি প্রতিবাদমূলক কোনো কথা বলতে পারে না। ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। *প্রাচ্য* নাটকে নিম্নবর্গের আচার-বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ও সেলিম আল দীন তুলে ধরেছেন। যে সাপটি নোলককে কামড়ায় সেটি বাস্তুসাপ– গ্রামীণ ধারণায় যা পারিবারিক সমৃদ্ধির প্রতীক। তাই স্ত্রী হারানোর শোকে প্রচণ্ড ক্রোধে সাপকে মারতে চাইলেও তার দাদি তাকে বাধা দেয়। দাদির নিষেধ নিঃসন্দেহে সামাজিক সংস্কার; ফলে নাটকের পরিণতি দাঁড়ায় প্রান্তিক জনমানুষের এ ধরনের সংস্কারের কারণে আইজলের মতো সামাজিক শোষকেরা বেঁচে যায়। নাট্যকার প্রচলিত শোষণকাঠামোর স্থায়ী রূপটিই যেন প্রকাশ করেন। শোষকরা বার বার শোষণ করে যাবে কিন্তু সয়ফরের মতো মানুষরা তাদের কিছু করতে পারবে না; কিংবা সুযোগ পেলে ক্ষমার মহান আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার কারণে নিম্নবর্গের হাত থেকে শোষকরা রেহাই পাবে। সাপে কাটার পরে চিকিৎসার জন্য আসা মালেক ওঝা যে সব কৃত্যের মধ্য দিয়ে বিষ নামানোর চেষ্টা করে তাও বাংলার লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরে। এর মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। শিক্ষা, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষের চিন্তা-চেতনা, সংস্কার ইত্যাদি বিকাশমান। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নয়নে মানুষ ঝাড়ফুঁক, ওঝা-কবিরাজে আগের মতো বিশ্বাস করে না। কিন্তু নিম্নবর্গের মানুষ সেই সুবিধা-উন্নয়ন থেকে এখনও বঞ্চিত। আর্থ-সামাজিক রাজনীতিক, ভৌগোলিক কারণে তাদের মাঝে আধুনিক জীবন যাপনের উপকরণও ধরাছোঁয়ার বাইরে। ফলে ঝাঁড়ফুক, তন্ত্র-মন্ত্রে তাদের শুধু যে আরোগ্য লাভের জন্য বিশ্বাস– তা নয়, জীবন যাপনের প্রয়োজনে এই বিশ্বাসটুকু না করে তাদের উপায় থাকে না।

সেলিম আল দীন এ নাটকে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্গের মানুষের ওপর উচ্চবর্গ তথা জিতু মাতবর, আইজলের শোষণ-বঞ্চনা তুলে ধরলেও শেষ পর্যন্ত নাটকটি হয়ে ওঠে দার্শনিক ধারণার বহিঃপ্রকাশ। অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে সাপটাকে আবিষ্কার করার পরও সয়ফর সেটিকে আর মারে না। যে আক্রোশ, প্রতিশোধ স্পৃহা তার ছিল শেষ পর্যন্ত তা দপ করে প্রশমিত হয়ে যায়। সাপের প্রতি এক ধরনের সমীহ-শ্রদ্ধাবোধ জাগে তার। এর মধ্য-দিয়ে নাট্যকার প্রাচ্যদেশীয় এক মধুর মনোরম মানবীয় দর্শনকেই তুলে ধরেন। আর তা হচ্ছে ক্ষমার দর্শন।[২১২] এই দর্শনের মধ্য থেকে আরেকটি বিষয় উঠে আসে– শোষণকারীর ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সয়ফরের মতো প্রান্তিক মানুষ কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে না। জনম জনম তারা পরাজিতই থেকে যায়। এটাই তাদের জীবনবাস্তবতা।[২১৩] নাটকটি সম্পর্কে নাসির উদ্দিন ইউসুফ বলেন: '*প্রাচ্য* নাটকের দর্শন হলো প্রাচ্য জনপদের হাজার বছরের জীবনদর্শনের একটি প্রতিফলন। বিষয়টিকে আমি এভাবেই দেখেছি। কিন্তু সেলিম সৃষ্ট উপাখ্যানটি নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ। ক্ষমার শক্তিকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করতেই হয়তো সেলিম এরকম একটি মর্মান্তিক গল্পের আশ্রয় নিয়েছে।'[২১৪] তবে আমাদের বিবেচনায় যারা নিম্নবর্গের মানুষ, তারা নাট্যকাহিনী বর্ণিত সয়ফরের জীবনের মতো কোনো পরিস্থিতিতে কতটুকু মার্জনাকারী হয়ে উঠতে পারে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। নাট্যকার নিম্নবর্গের জীবনবোধকে এখানে গুরুত্ব দেননি, দিয়েছেন নিজস্ব দর্শনচেতনার উপস্থাপনকে। ফলে নিম্নবর্গের সামষ্টিক চেতনার দ্যোতক কোনো বৈশিষ্ট্য এ নাটকে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায় না। তবে নাট্যকার সংস্কৃতির যে দিকগুলো তুলে ধরেছেন তা নিম্নবর্গের জীবনবোধের প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে বলা যায়: 'এখনও গ্রামেগঞ্জে

সূচিশিল্প, পাটশিল্প, মৃৎশিল্প, গৃহশিল্প, বিশেষত নারী সৃজিত শিল্পসমূহ বেঁচে আছে। সঙ্গীত-নৃত্যের, পাঁচালি-কথকতার বিশেষ বিশেষ শাখা লোকায়ত, মানবিক আবেদনে অনন্য। সেগুলি যেমন সাবঅল্টার্নদের জীবনযাপন, জীবনঅভীপ্সা, আদর্শ বিশ্বাসকে উদঘাটন করছে, তেমনি আগামী দিনের সংস্কৃতির উপযোগ রক্ষা করছে।'[২১৫]

নাট্যজীবনের শেষপর্যায়ে সেলিম আল দীন নাট্যাখ্যানে দার্শনিক চেতনা উপস্থাপনায় বেশি মনোনিবেশ করেন। তবে তা নাট্য কাহিনী বা চরিত্র আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার আলোকে নয়, একান্তই নিজস্ব চেতনার আবহে। ফলে *প্রাচ্য*-এর মতোই *স্বর্ণবোয়াল* (২০০৭) রচনাটিও দার্শনিক চেতনাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। *স্বর্ণবোয়াল* সম্পর্কে নাট্যকারের বক্তব্য: 'পাশ্চাত্যে মাছ শিকারের মহৎ ও কালজয়ী উপাখ্যান আছে। আমি সেগুলোর ভেতরে পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের বিশেষ প্রবণতার একটা আভাস পাই। মানুষের জীবিকা বলি, পেশা বলি– শিকারীর জিতে যাওয়াটাই আসল। বড়শি থেকে মাছ ছুটে গেল– তো সাধারণ চোখে তাকে মাছের কাছে শিকারির হার বলে ধরে নেওয়াই সঙ্গত। কিন্তু এখানে তার উল্টোটাই ঘটে গেছে। এ কাব্যের পরিণতি– শিকার-শিকারি কিংবা হার-জিত এক অদ্বৈত নৈসর্গিক ঐক্যে বাঁধা।'[২১৬] ফলে স্বর্ণবোয়াল নাটকেও নিম্নবর্গের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে এড়িয়ে নাট্যকার তুলে ধরেন তাঁর নিজস্ব দার্শনিকসত্তাকে।

স্বর্ণবোয়াল-এর কাহিনী আবর্তিত হয়েছে চিরলি গাঙের বিশাল এক স্বর্ণবোয়াল মাছকে ঘিরে। মাছটির কাহিনী নিকারিপাড়ার লোকেরা শুনেছিল লিক্কত মাঝির কাছ থেকে। স্বর্ণবোয়াল শিকারে গিয়ে জনম মাঝির গহিন গাঙে হারিয়ে যাওয়া, খলিশা মাঝির মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গোনা– এ সবই মাছটিকে চিরলি গাঙ-অঞ্চলের মানুষের কাছে মিথে পরিণত করে। শরীরে মাছশিকারির রক্ত প্রবহমান বলে তিরমনের মধ্যেও স্বর্ণবোয়াল ধরার বাসনা জাগে। কিন্তু সাঁঝমালার প্রতি ভালোবাসার কারণে সে সহজে দুঃসাহসিক এই কাজে প্রবৃত্ত হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সাঁঝমালার সঙ্গে তার বিয়ে ব্যর্থ হলে স্বর্ণবোয়ালের ওপর ক্ষোভে ফেটে পড়ে তিরমন। কারণ নিকারিপাড়ার অধিবাসীদের ধারণা– পূর্বপুরুষদের মতো সেও স্বর্ণবোয়াল ধরার নেশায় অকালে প্রাণ হারাবে। প্রিয় মানুষটিকে না-পাওয়ার বেদনায় প্রায়-উন্মাদ হয়ে যায় সে। তাই পিতাকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত রেখে, মায়ের নিষেধ উপেক্ষা করে ভাদ্রের এক ঝড়ের রাতে সে চলে যায় বেউলা বিলে। হাতে তার বিখ্যাত তিতকামারের বড়শি। মাছ ধরতে গিয়ে সে দেখতে পায় বোয়ালশিকারিদের। মৃত হলেও যারা এখনো স্বর্ণবোয়াল ধরার আশায় চিরলির বুকে অপেক্ষমান। নায়েবালির গানে ও এলাকার মানুষের মুখে শুনে, খোয়াবে দেখে তিরমন নিজের সত্তার সঙ্গে তাদের একীভূত করে ফেলে। নিজেকে মনে করে তাদের একজন। তাদের সঙ্গে অবচেতনে কথা বলে। এরপর বড়শি ফেলে সে ধ্যানীর মতো বসে থাকে স্বর্ণবোয়ালের আশায়। এক সময় সুতোয় টান পড়ে। সে ভাবে 'কাছিম আছিম– আইড় বাইড়'[২১৭] কিংবা 'বড় জোর প্রকাণ্ড গুজি আইড় কি– সুরমা সাদা কালোর নকশা কাটা বাঘ আইড়।'[২১৮] কিন্তু কিছুপরেই সে বুঝতে পারে স্বর্ণবোয়াল তার বড়শি গিলেছে। শুরু হয় মাছটি ধরার জন্য তিরমনের প্রাণান্তকর চেষ্টা। স্বর্ণবোয়ালের চেষ্টা বড়শি থেকে ছুটে যাওয়ার আর তিরমনের চেষ্টা মাছটি ডাঙায় তোলার। কিন্তু স্বর্ণবোয়াল সহজে ধরা দেয় না। তিরমনকে সে টানতে থাকে গহিন জলের দিকে। ভয় পায় তিরমন। কিন্তু মুহূর্ত-মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে মাছটিকে ডাঙায় তুলতে সংগ্রামে নেমে পড়ে:

> যদি ধরা না দেবেন তবে রেহাই দেন আমারে। আমি নিকারির ছাওয়াল– আমি আপনেরে ছাড়ব না– তবে আপনি যদি নিজের কৌশলে নিজে ছুটবার পারেন আমি অখুশি হমু না। আমি হার-জিত বুঝি না। আপনি গিলছেন আধার আমি আটকাইছি। বাস! এইটা আমার পেশা। আমি ধরতে চাইব– আপনি ছুটতে চাইবেন। জগত সিরজন থিকা মাছ আর মানুষের এই খেলা। খেলা খেলা। এই খেলা চলবে।[২১৯]

তিরমনের এই সাহস মূলত নিম্নবর্গের মানুষের জীবনাভিজ্ঞতা ও সাহসের বহিঃপ্রকাশ। তার পূর্বপুরুষরা মাছটি ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। তবু তারা ধরার আশা ত্যাগ করেনি। পুনরোদ্যমে আবার মাছটি ধরার জন্য চেষ্টা করেছে। তাই তিরমনের ভয় দ্রুত সাহসে পরিণত হয়। আবার লড়াই শুরু করে স্বর্ণবোয়ালকে ডাঙায় তোলার। এলাকার লোক ছুটে আসে স্বর্ণবোয়াল দেখতে। শিকারির প্রশংসায় তারা আপ্লুত হয়। মাছটির শক্তি ও বিশালতায় তিরমনের মধ্যে সম্ভ্রম জেগে ওঠে। সে ভাবতে থাকে মাছটি স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে তাকে ধরা সম্ভব নয়। এতক্ষণের পরিশ্রম, ক্ষোভ পরিণত হয় শ্রদ্ধায়, মায়ায়, অহিংসায়। আপন মনে সে মাছের সঙ্গে কথা বলে:

তিরমন জনম মাঝির কসম দিতেছে। আপনে স্বইচ্ছায় ধরা দিয়েছেন। কোশা নৌকায় তুইলা নিয়া যাবো আপনেরে। সকলে দেখবে– চিরলি কি ধন দিয়াছে তিরমনরে। তারপর উঠানে তুলব। ভয় পাইবান না। নিলামে তুলব না– বিক্রয় করব না– খুন করব না। বেবাকে দেখবে– আর আপনারে এই নাওতে নিয়া ফের চিরলির গাঙে আইন্যা ছাইড়া দিব।[২২০]

যে স্বর্ণবোয়াল এলাকার মানুষের কাছে দেবতার সমান, তাকে ধরে মানুষের সম্মুখে এনে নিজের বীরত্ব জাহির করতে চায় তিরমন। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর এক সময় মাছটি ধরা দিলেও তিরমনের আশা পুরোপুরি সফল হয় না। মাছটি কূলে এসে হঠাৎ বড়শি খুলে মাছটি গহিন গাঙে অন্তর্হিত হয়। নিকারির পাড়ার মানুষের কাছে স্বর্ণবোয়াল অজেয়ই থেকে যায়। কিন্তু পরাজিত হয় না তিরমন। কারণ মাছটি ধরেছিল, শুধু গগনধুলার বাজারে আনতে পারেনি। তাই স্বর্ণবোয়াল ও তিরমন দু'জনেরই পরস্পরের কাছে হার-জিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে নাট্যকার এক দার্শনিক প্রশ্ন তুলে ধরেন– হার-জিত বলে কিছু কি আছে? নায়েবালি বিশ্বাস করে এই বিশাল পৃথিবীতে হার জিত বলে আসলে কিছু নেই। মৃত্যুমুহূর্তে সেই একই বিশ্বাস জন্মে লিক্কত মাঝির। তাই যে ঘড়িয়াল শিকার করতে গিয়ে তার মৃত্যু হয়, সেই ঘড়িয়ালের কবরের পাশেই নিজেকে সমাহিত করার বাসনা আপন জনের কাছে ব্যক্ত করে:

হারজিত সোমান সোমান হইল পারঘাটায়। এখন ওইটার চামড়া তুলবা না খবরদার। আমার ভিটায় আমার পাশে কবর দিবা তারে। সোম্মান দিবা তারে।[২২১]

ঠিক এই বোধ জন্মে তিরমনেরও। টানা একদিন দুই রাত অনাহারে থেকে প্রচণ্ড সংগ্রামের পরেও স্বর্ণবোয়াল ধরতে-পারা এবং ডাঙায় তুলতে না-পারার কারণে লিক্কত মাঝির মতোই হারজিত হীন এক জীবনবাস্তবতা সে অনুভব করে। হার-জিতের এই অভেদাত্মক দার্শনিক চেতনাই এ নাটকের মূল উপজীব্য। তবে নিম্নবর্গের জীবনের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাকে নাট্যকার একেবারে এড়িয়ে যেতে পারেননি। অর্থনৈতিকভাবে নিকারিপাড়ার অধিবাসীরা তেমন সচ্ছল নয়। তাই খলিশা মাঝির-ধরা বড় রুই মাছটা নায়েবালি কিনতে চাইলেও পারে না। কারণ এগারো শ টাকা দিয়ে মাছ কেনার সামর্থ্য তার নেই:

নায়েবালি টাকার অত উঁচু গাছে উঠতে পারে না। একজ অচিন লোক কানসায় আঙুল দিয়ে সেই বেপুল শরীর মাছটি তুলে নেয়।[২২২]

আবার নিকারিদের প্রতিবাদী চেতনাও নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন। ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কারণে খাসজমিন বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে নিম্নবিত্তের চেয়ে বিত্তশালীরা বেশি লাভবান হয়। কারণ যে আমলাতান্ত্রিক পর্যায় অতিক্রম করে জমি অধিকার করতে হয়, তা ঠিকমতো জানা এবং তার ব্যয় বহন করা নিম্নবিত্তের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই তাদের আয়ের উৎস দখল হয়ে যায় কোনো ক্ষমতাবান, অর্থশালী লোকের দ্বারা। সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে বেউলা বিলে নিকারিপাড়া ও জাইলাপাড়ার অধিবাসীরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু ক্ষমতার কারণে সেই বিল আবার

বন্দোবস্ত নেয়ার পায়তারা করে বড় সাহেব এবং তার লোকজন বিনা মূল্যে বড় বড় মাছগুলো আড়ত থেকে নিতে চায়। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় নিকারিরা:

একজন কানসায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে বলে
– নিলাম কিরে। এই পুরা বিল সরকারের খাস জমিন। আমাগো বড় সাবে বন্দোবস্ত নিবো। আছস থাক তরা। মাছটা নজরানা দিলি।
গর্জে ওঠে খলিশা মাঝি–
–না
–না
– খবরদার মাছ কোশায় উঠাও– না হইলে ঝামেলা হবো।
– নাম কিরে তর।
– নামে কি কাম। আমাগরে পৈতৃক সম্পত্তি বেউলা বিল। আমরা জাইলাপাড়া আর নিকারিপাড়া– বন্দোবস্ত আনছি সরকার থিক্যা দুই বছর আগে তিনসনি বন্দোবস্ত। বাস।
– মাছ উঠাও।
তিরমন লাফিয়ে ওঠে।
–খবরদার। নিকারির জাত আমরা। লউয়ের মদ্যি আগুন জ্বললি পরে থামাবার পারবাইন না। সারা আড়তে হৈ চৈ পড়ে যায়।
তাদের পিতৃপুরুষের বিল– শতবর্ষ ধরে– সে বিল নিলামে ডেকে এনেছে তারা। এবং তা অজানা অচেনা লোক বন্দোবস্ত নিয়েছে। আগুন্তকদের একজন বলে–
–আমরা আসব– এগোরে উচ্ছেদ করতে। মাছ ওঠা কোশা নৌকায়।
কালিবাউসটা তিন জেলে মিলে ধরাধরি করে ধরতে গেলে লাফিয়ে ওঠে খলিশা–
–তোমরা আউগায়া আহো। নিকারির লউ যদি শইল্লে থাকে আউগাও।
তিনজন লোক পিছিয়ে যায় খলিশা মাঝির চিৎকারে।
–এই মাছ নিলামে উঠব। এই মাছ আমি এম্বায় দিমু না। নিলাম ছাড়া দিমু না।[২২৩]

কিন্তু এই প্রতিরোধসত্তা নাট্য-কাহিনীর শেষে নাট্যকারের দার্শনিকসত্তার মধ্যে লীন হয়ে যায়। সর্বপ্রাণবাদী এবং প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির অভেদাত্মক চেতনার পরাবাস্তবীয় রূপায়ণে নিকারিপাড়ার মানুষের জীবনবাস্তবতা অনেকাংশে হয়ে ওঠে আরোপিত এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বহির্ভূত। কাহিনীর চরিত্ররা যেসব কথা বলে, তাদের দৈনন্দিন জীবনবাস্তবতার সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

স্পষ্ট যে, নিম্নবর্গের শ্রেণিসত্তার প্রধান যে অবলম্বন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধপ্রবণতা, তা সেলিম আল দীনের বেশির ভাগ নাটকে অনুপস্থিত। *আতর আলীদের নীলাভ পাট*, *করিম বাওয়ালীর শত্রু অথবা মূল মুখ দেখা*, *বাসন* এবং *বনপাংশুল* বাদ দিলে নিম্নবর্গের প্রতিরোধ-চৈতন্যের চিত্র আর কোনো নাটকে ধরা পড়ে না। মৌলিক সৃষ্টিতে তিনি যতবেশি উদ্যোগী হন, প্রতিরোধ চেতনার নাট্যিক রূপায়ণ থেকে তত দূরে সরে আসেন।[২২৪] প্রান্তিক, শোষিত, অত্যাচারিত, নির্যাতিত মানুষের সম্মিলিত শক্তির চেয়ে তিনি দেখাতে চান তাদের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-চেতনাকে। ফলে তা পাঠককে এই বোধে উন্নীত করে যে, নিম্নবর্গের মানুষ তাদের জীবনবাস্তবতা নিয়ে খুব বেশি সংকটাপন্ন নয়। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অপ্রাপ্তির মধ্য থেকেও তারা জীবনের আনন্দ খুঁজে পেতে জানে। এর কারণ, সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত চেতনাধারণকারী লেখক মাত্রই রাজনীতি ও প্রতিরোধ চেতনাকে লেখায় অন্তর্ভুক্ত করতে চান না। তাদের ধারণা, এই দুটি থাকার কারণে প্রকৃত শিল্প তার সৃষ্টিশীলতা হারায়।[২২৫] সেলিম আল দীন তাঁর নাটককে প্রাচ্য বা নিজস্ব রীতিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে আদর্শজ্ঞান করেন। কিন্তু তাকে অধিকার করার বদলে তিনি তার অধীনস্থ হয়ে পড়েন। বিচারের কষ্ঠিপাথর বয়ে যায় মধ্যযুগের কবিদের হাতে, তিনি যা কিছু লেখেন সবই আসে তাঁদের ছাড়পত্র নিয়ে। ফলে সমকালীন জীবনে যে নানামুখী সম্পর্ক, টানাপোড়েন, বিস্তার ও ব্যাপ্তি তার সবটুকুর ওপর তিনি অধিকার ও বোঝাপড়া প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না।[২২৬] তাই তাঁর নাটকে নিম্নবর্গের মানুষ

প্রতিশোধস্পৃহাহীন, অন্তর্মুখি, অতীতচারী বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে রূপায়িত হয়। অত্যাচার, বঞ্চনা, শোষণ থেকে সংঘবদ্ধভাবে বাঁচার চেয়ে নিজের মত থাকতে তারা বেশি পছন্দ করে।

আবদুল্লাহেল মাহমুদের (১৯৫৫-) *নানকার পালা* (১৯৮৫) নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে বাংলার কৃষকবিদ্রোহের চিত্র। এদেশের কৃষকরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য বারবার জমিদার, মালিকশ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছে। নানকার আন্দোলন সেই প্রমাণ বহন করে। নাটকটির কাহিনী বেশ নাটকীয়। নিম্নবর্গের জীবনে অতীত ঘটনা বেশ প্রভাব ফেলে। সেখান থেকে তারা শিক্ষাও নেয়। এই সত্য নানকার পালা নাটকে উঠে এসেছে। হাওড় এলাকায় কাজ করতে আসা একদল ক্ষেতমজুর, যারা স্থানীয়ভাবে জিরাতী নামে পরিচিত– তাদের ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের আন্দোলন নাট্যকাহিনীর কেন্দ্রে। গেন্দু মিয়ার বাড়িতে কাজ করতে আসা মজুররা প্রতিদিন কাজ শেষে হাশেম মিয়ার কাছে শোনে নানকার কৃষকদের বিদ্রোহের গল্প। গল্পে বর্ণিত কৃষকের সঙ্গে তারা নিজেদের মিল খুঁজে পায়। এরই মধ্যে তারা খবর পায় এবার গেন্দু মিয়া তাদের ধান কম দেবে। নানকার বিদ্রোহ তখন তাদের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। তারা নিজেদের ধান বুঝে নিতে গেন্দু মিয়ার ধানের গোলায় উঠেপড়ে। তখন গেন্দু মিয়া পুলিশ নিয়ে এসে সবাইকে ধরিয়ে দিয়ে জেল খাটায়। কৃষক তথা নিম্নবর্গের চেতনার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে নাট্যকার সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আবেগের আতিশয্যে ভেসে যাননি। প্রচলিত শাসনকাঠামো সম্পর্কে নিম্নবর্গ অজ্ঞাত। তাই বিদ্রোহের গল্প এবং বাস্তবের বঞ্চনা তাদেরকে সহজে পরিণাম বিবেচনা থেকে দূরে রেখে অন্যের গোলা থেকে ধান নামিয়ে নেয়ার মতো দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত করেছে। তবে বিদ্রোহীদের পরাজয়ের কারণ নাটকে স্পষ্টভাবে উঠে আসেনি।[২২৭] কৃষক ইতিহাসের আলোকে নিম্নবর্গের সংগ্রামী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে আবদুল্লাহেল মাহমুদের *কৈবর্তগাথা* (২০০০) নাটকেও। শাসকের অত্যাচার বিদ্রোহীর জন্ম দেয়।[২২৮] পাল বংশের রাজা মহীপালের শাসনামলে বাংলার নিম্নবর্গের মানুষের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। এই সংকটপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য কৈবর্ত, হালিক, জালিক, নিষাদ, পুলিন্দ ইত্যাদি নিম্নবর্ণের মানুষরা হয়ে পড়ে দিশেহারা। তাদের এই সংকট থেকে উদ্ধার করেন কৈবর্তরাজ দিব্যোক। জাতপাতের সামাজিক শৃঙ্খল ভেঙে অন্ত্যজ-অচ্ছ্যুৎদের তিনি দেন মানুষের মর্যাদা। বরেন্দ্রকে তিনি স্বশাসিত রাজ্যে পরিণত করেন। ফলে নিম্নবর্গের মানুষের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন দেবতাতুল্য। উচ্চবর্গীয়দের কাছে এই সম্মান অসহ্য হয়ে ওঠে। অপরূপ সুন্দর বরেন্দ্র শাসন করবে একজন কৈবর্ত – পাল রাজারা এটি মেনে নিতে পারে না। স্বাভাবিকভাবে মহীপাল দিব্যোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং নিহত হন। সেই থেকে পাল রাজারা বারবার বরেন্দ্র দখলের চেষ্টা করেছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে বরেন্দ্রর রাজা ও প্রজার সম্মিলিত চেষ্টা এবং দেশপ্রেমের কারণে। তবে তৃতীয় কৈবর্তরাজ ভীম আর বরেন্দ্রকে স্বাধীন রাখতে পারেন না। সভাসদ চণ্ডকের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তিনি পরাজিত হন রামপালের কাছে। তবে ভীম নতি স্বীকার করেননি কিংবা জীবনও ভিক্ষা চাননি। এ নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কঙ্কাবতী। বারাঙ্গনা হয়েও সে দেশকে পালবংশ থেকে মুক্ত রাখার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করে গেছে। ভীমকে হত্যা করার পর রামপাল নানাভাবে বরেন্দ্রর জনগণের ওপর অত্যাচার শুরু করে। বিশ্বাসঘাতক চণ্ডকের কাছ থেকে ছলে তথ্য নিয়ে কঙ্কা আগে থেকেই মানুষকে সাবধান করে দিত। কিন্তু বিত্তপালের কূটবুদ্ধির কারণে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে। চণ্ডক ক্ষেপে যায় তার ওপর। তবে কঙ্কাও ছাড়ার পাত্রী নয়। তার ভেতরে আছে দেশের প্রতি ভালোবাসা-জাত সাহস।

চণ্ডক: তোরে মেরে আজ জগতেরে দেখাবো– বেশ্যারে বিশ্বাস করে–
কঙ্কাবতী: তুই বেশ্যা নোস? ভীমের বিশ্বাস রেখেছিলি? তোর স্ত্রীর বিশ্বাস, এই বরেন্দির জনমানুষের বিশ্বাস? আমি নিজেরে বেচি অন্ন পাবো বস্ত্র পাবো বলে। তোদের কি নেই? ঘরে অন্ন মাথায় ছাদ– সব রইতে তুই বেশ্যা হলি কেন–[২২৯]

ইতিহাসকে কেন্দ্র করে নাট্যকার নিম্নবর্গের মানুষের দেশপ্রেম ও বীরত্বকে তুলে ধরেছেন। জীবনের মায়া নয়, তাদের কাছে বড় হলো কৈবর্তরাজ্যকে স্বশ্রেণির মানুষের শাসনে রাখা। কানাই, বিদুর, কঙ্কার আপ্রাণ চেষ্টা সেই মহত্ত্ব প্রকাশ করলেও চণ্ডকের বিশ্বাসঘাতকতা শ্রেণিগতভাবে তাদের হেয় করে। কিন্তু চণ্ডকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো ক্ষমতা তাদের নেই। ফলে শুধু দেখে যেতে হয় তার নৃশংসতা।

মলয় ভৌমিকের (১৯৫৬-) *বহে প্রান্তজন* (২০০৪) নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে সীমান্তবর্তী মানুষের জীবন যাপনের নির্মম বাস্তবতা। নাট্যকার কোনো দেশের নাম নাটকে উল্লেখ না করলেও নাট্যকাহিনী, সংলাপ ইত্যাদির সূত্রে স্পষ্ট যে, পদ্মা যেখানে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তকে নিজ বক্ষে ধারণ করেছে– সেই অঞ্চলের মানুষের জীবনই এ নাটকের বিষয়বস্তু। বুদ্দু, বোবা, মনি, সূর্য, বুদ্দুর মা প্রান্তিক এই সব মানুষের যাপিত জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় পূর্ব পাড়ের ঘেটু মহাজন ও পশ্চিম পাড়ের ঠাকুর চরিত্রের দ্বারা। বেঁচে থাকার তাগিদে চোরাচালান, অবৈধবস্তু এক দেশ থেকে অন্যদেশে পাচার করে সীমান্ত অঞ্চলের নিম্নবর্গের মানুষকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তাদের দারিদ্র্যকে নিজের অর্থনৈতিক লাভের উপায় হিসিবে ব্যবহার করে ঘেটু মহাজন ও ঠাকুরের মতো ক্ষমতাধর মানুষেরা। অর্থ ও ক্ষমতার জোরে তারা আত্মসাৎ করে মাতৃত্ব, প্রেম, ভালোবাসা। বুদ্দুর ঔরসে মনির গর্ভে সন্তান এলে ক্ষেপে যায় তারা। কারণ মনি তাদের পণ্য পাচারের উপায়। মেয়ে বলে গর্ভবতী মহিলার বেশ ধরে সহজে সে মাল পাচার করতে পারে। কিন্তু সত্যিকার মা হলে তার দ্বারা সেটি সম্ভব হবে না। তাই ঠাকুর ও মহাজন দুজনই ক্ষিপ্ত হয়। তারা দুই দেশের বাসিন্দা হলেও উভয়ের শ্রেণিস্বার্থ এক। নিরন্ন, অসহায় মানুষগুলোকে ব্যবহারের জন্য তারা তৈরি করে নতুন নতুন ফাঁদ। বুদ্দু যেন কখনো ঘেটু মহাজনের অবাধ্য না হয়, সে জন্য তার নামে আছে চুরির মামলা। এ থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো উপায়ও বুদ্দুর জানা নেই। ফলে মহাজনের কথাই তাকে মেনে চলতে হয়। বিসর্জন দিতে হয় সাধ-আহ্লাদকে:

বুদ্দু: বিহ্যা! বুইলছো কি তুমি? তুমার আমার মনের মিল যদি হয় সেডা বিহ্যা লয়। এছাড়া ইপারের মানুষ সকলে জানে তুমার সাথে আমার হয়্যাছে বিহ্যা।
মনি: মাইষের জানায় কিছুই হবে না। ঐ ঘেটু মেম্বার যেডা বুইলবে সেডাই লিতে হবে মান্যা।[২৩০]

নিম্নবর্গের মূল শক্তি তাদের ঐক্যের মধ্যে বিদ্যমান। ঘেটু মহাজনের মতো লোকের বিরুদ্ধে এককভাবে কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সামষ্টিক শক্তিতে সীমান্তবর্তী নিম্নবর্গ বলীয়ান নয় বলে খুব সহজে নদীর বুকে জেগে ওঠা তাদেরই জমি দখল করতে পারে মহাজন। আবার কেউ যদি মহাজন বা ঠাকুরের কথামতো না চলে তাহলে তার ওপর নেমে আসে সীমান্তরক্ষীর অত্যাচার। কারণ সীমান্তরক্ষীরা উৎকোচ পায় ওই দুজনের কাছ থেকে। বুদ্দুর পরিণতিতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। মনিকে ভালোবেসে সে সংসার করতে চাইলে মহাজনের স্বার্থে আঘাত লাগে। তাই রক্ষীর হাতে তাকে আটক হতে হয় আর নবজাতককে রেখে মনিকে যেতে হয় অন্য দেশে। এর মাধ্যমে অটুট থাকে মহাজন এবং ঠাকুরের কর্তৃত্ব।

নিম্নবর্গের দেশপ্রেম এবং অসহায়ত্বের প্রতিফলন ঘটেছে মান্নার হীরার (১৯৫৭-) *ভাগের মানুষ* (১৯৯৯) নাটকে। লাহোরের পাগলা গারদে বন্দী পাগলদের কথোপকথন ও ভারত-পাকিস্তানের সীমান্তরক্ষীদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে উচ্চবর্গের রাজনৈতিক চেতনার নির্মমতা এবং নিম্নবর্গের করুণ পরিণতি উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। উচ্চবর্গের মতো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার বাসনা, লোভ নিম্নবর্গের নেই। তাই তাদের দেশপ্রেম অকৃত্রিম। কোনো সংকীর্ণতা তাদের এই চেতনায় চিড় ধরাতে পারে না। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা লালন করে মাতৃভূমির প্রতি অপার মমত্ব। *ভাগের মানুষ* নাটকের টোবাটেক সিং চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার এই বক্তব্যই যেন প্রকাশ করতে চান। আসল নাম

বচন সিং হলে পরিবর্তন করে জন্মস্থানের নামেই সে নিজের নাম রাখে টোবাটেক সিং। ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় মানুষকে রক্ষার জন্য জীবন বাজি রাখে। ধর্ম তার কাছে কখনো মানুষের থেকে বড় হয়ে ওঠেনি। ভারত বা পাকিস্তান নয়, টোবাটেকই থাকে তার সত্তার সঙ্গে গ্রথিত।

টোবাটেক: টোবাটেক দে– টোবাটেক আমার টোবাটেক, বাবা টোবাটেক, মা টোবাটেক, রূপা টোবাটেক।[২৩১]

পাগলা গারদে থেকেও জন্মভূমিকে সে ভুলতে পারে না। টোবাটেকের প্রতি ভালোবাসা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতায় আবদ্ধ নয় বলে ভৌগোলিক সীমানা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার নামে তাকে হত্যা করে দুই দেশের সৈন্যবাহিনী। শেষ পর্যন্ত টোবাটেকের মৃতদেহ পড়ে থাকে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের নো ম্যানস ল্যান্ডে। উচ্চবর্গের কাছে টোবাটেকের দেশপ্রেম পাগলামি হিসেবেই পরিগণিত হয়। ধনতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় শাসক-শোষক শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী বাসনার পরিপূর্ণতায় তৎপর হয়ে ওঠে। এ জন্য তারা গড়ে তোলে নানা বাহিনী। ক্ষমতার খুব কাছাকাছি অবস্থান করে বলে বাহিনীর সদস্যরাও নিজের স্বার্থ, লোভ, লালসা চরিতার্থতায় কোনো ভয় পায় না। আইন, ধর্ম, সংবিধান, সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের হাতে:

১ম পাক সৈন্য: প্রথমত তুমি মাতাল, পাগল নও– দ্বিতীয়ত তুমি সেনাবাহিনীর লোক– তাই সত্য কেবল আমরাই বলতে পারি ওরা নয়– কারণ আইন, সার্বভৌমত্ব, সংবিধান–
১ম ভারত সৈন্য: এবং ধর্ম–
১ম পাক সৈন্য: সবই আমাদের হাতে।[২৩২]

ফলে বন্দি টিয়াকে ধর্ষণ করেও তারা রক্ষা পেয়ে যায়। ডাক্তারের পক্ষেও সত্য রিপোর্ট লেখা সম্ভব হয় না। কারণ ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে যে কোনো অন্যায় থেকে তারা রক্ষা পেয়ে যায়।

গ্রামীণ মানুষের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও ক্ষমতাবানদের স্বার্থপরতা বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে গোলাম শফিকের (১৯৬১-) *শিলারি* (২০০৬) নাটকে। শিলারি শব্দটির অর্থ শিলা নিয়ন্ত্রণ করে যে। মঙ্গলচরণ দাস নামের এক শিলারির জীবন-বাস্তবতাই এ নাটকের উপজীব্য। আসানপুর, মিঠামইন, ইটনা ইত্যাদি গ্রামের মানুষের বিশ্বাস শিলারিরা মন্ত্রবলে শিলাবৃষ্টি বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই জমির মালিকরা বোরো ধান কাটার মৌসুমে শিলারিদের বেতনভুক হিসেবে রাখে। কিন্তু শিলাবৃষ্টির কারণে যখন ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়, তখন শিলারিদের ওপর নেমে আসে অত্যাচার। বঞ্চিত হয় তারা মজুরি থেকে। এরকম এক অনিশ্চয়তার মধ্যেই মঙ্গলচরণকে পরিবার নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তবু সে শিলারি পেশা ছাড়তে পারে না। পিতৃপেশার সঙ্গে সে অনুভব করে আত্মিক বন্ধন:

একবার ত ছাড়ছিলাম শৈল। কিন্তু মেঘের ডাক যে আমারে পাগল কইরা দেয়। এই ডাক শুনলে ঘরে থাকবার পারি না বৌ। কী মধু আছে এই ডাকে কেডা জানে?[২৩৩]

গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় শাসকের ক্ষমতার স্থিতিশীলতার জন্য দরকার তার অধিবাসীদের পেশাগত অপরিবর্তনীয়তা। গ্রামের মাতবর, মহাজন, সামর্থ্যবান গৃহস্থ কখনো চায় না মঙ্গলচরণ শিলারি পেশা ছেড়ে কৃষকে পরিণত হোক কিংবা কর্ম পালন না করে ঘরে বসে থাকুক। কারণ তা হলে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় তাদের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ন হতে পারে। তাই মহাজন চাষের জন্য জমি দিতে রাজি না হলেও শিলা আটকাতে পারলে বেশি ধান দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। ধানের লোভ এবং আত্মিক টান– দুইয়ের কারণে স্ত্রী-পুত্রের নিষেধ উপেক্ষা করে আবার মঙ্গলচরণ মাঠে নামে শিলা নিয়ন্ত্রণে। উচ্চারণ করতে থাকে মন্ত্র। শেষ পর্যন্ত শিলায় ঢাকা পড়ে মৃত্যুবরণ করে সে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে বর্ণপ্রথার ছিল প্রবল প্রতাপ। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও জন্মগতভাবে শুধু নিম্নবর্ণ হওয়ার কারণে অনেকে প্রাপ্য সম্মান থেকে হয়েছে বঞ্চিত। ব্রাহ্মণ্যবাদী

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের কাছে পরাজিত হয়েছে নিম্নবর্গের শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান। মহাভারতের একলব্যের কাহিনী সেই বঞ্চিত নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতিচ্ছবিকেই উপস্থাপন করে। সেই কাহিনী অবলম্বনে নাট্যকার মাসুম রেজা (১৯৬৩-) রচনা করেছেন *নিত্যপুরাণ* (২০০২)। সময়ের প্রবাহমানতার সঙ্গে তাল রেখে বস্তুজগতের নানা অগ্রগতি হলেও নিম্নবর্গের জীবনের গতি-প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন নেই। আর্থ-সামাজিক কর্তৃত্বকে কুক্ষিগত করে রাখার স্বার্থে শাসক কৌশলে নিম্নবর্গের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের পথকে রুদ্ধ করে দেয়। *নিত্যপুরাণ* নাটক উচ্চবর্গের শঠতা, মিথ্যাচার এবং প্রতারণার এক দলিল। মেধা এবং আগ্রহ থাকার পরেও শুধু নিষাদপুত্র হওয়ার কারণে ব্রাহ্মণ্যবাদী আচার্য দ্রোণ একলব্যকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন না। তবু একলব্য গুরুর ভক্তি ও নিষ্ঠায় অবিচল থাকে। প্রত্যাখাত হয়ে নির্জন সর্জবনে দ্রোণের মূর্তি সামনে রেখে নিজ চেষ্টায় সে শেখে যুদ্ধবিদ্যার নানান কৌশল। কয়েক বছর পর সেই বনে পাণ্ডবরা শিকারে এলে ঘটনাক্রমে তাদের সঙ্গে একলব্যের সাক্ষাৎ হয়। তার যুদ্ধবিদ্যা ও কৌশলে ভীত, সন্ত্রস্ত ও সন্দিহান হয়ে পড়ে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। তার মনে সন্দেহ জাগে– গুরু দ্রোণ কি তাকে অনেক কৌশল শেখায়নি? বিদ্যা, কৌশল, জ্ঞান, বাক্যবিনিময়– সব ক্ষেত্রেই একলব্যের কাছে পরাজিত হয় পাণ্ডবরা। তাদের পরাজয় বার্তা পেয়ে সেখানে হাজির হন দ্রোণ। একলব্যের গুরুভক্তি দেখে তিনি বিস্মিত হন। ক্ষত্রিয় অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য কূটকৌশলে গুরুদক্ষিণা হিসেবে দ্রোণ একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুলি দাবি করেন। বৃদ্ধাঙ্গুলি ছাড়া একজন ধনুর্ধারীর পক্ষে বাণ চালানো সম্ভব নয়। তারপরও গুরুভক্তির কারণে একলব্য গুরুর চাওয়াই পূরণ করে। আর এর মাধ্যমে অর্জুন তথা ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা এবং কর্তৃত্ব থাকে অক্ষুণ্ন। মহাভারতের এই কাহিনীই নাট্যকার মাসুম রেজা তুলে এনেছেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। নাটকের শুরুতে নাট্যকার ব্যক্ত করেন একলব্যের জীবন ও পরিণতিকে নতুনভাবে উপস্থাপনার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন একলব্যের নিয়তিকে পরিবর্তন করতে। মহাভারতের একলব্যের মতোই *নিত্যপুরাণ*-এর একলব্যও ব্রাহ্মণের কুটিলতার কাছে আরেকবার পরাজিত হয়। অটুট থাকে ক্ষমতাকাঠামো। এর মধ্য দিয়ে নাট্যকারের গভীর সমাজ বীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতের কাহিনী সূত্রে স্পষ্ট যে, প্রাচীন ভারতে শাসন কাঠামোর ভিত্তিমূলে কৌলিন্য প্রথার ছিল সুদৃঢ় স্থিতি। একলব্য এই প্রচলিত সুদৃঢ় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এক সত্তা। আবহমান ব্যবস্থাকে তোয়াক্কা না করে নিষাদ তথা নিম্নবর্ণের হয়েও ক্ষত্রিয়ের চেয়ে বেশি বিদ্যা অর্জন করে সে। এতেই দোদুল্যমান হয় ক্ষমতার ভিত। দ্রোণ মূলত সেই ক্ষমতাকাঠামোর ধারক– যা উচ্চবর্গের স্বার্থকে রক্ষা করে। তার পক্ষে সম্ভব হয় না নিম্নবর্গের কোনো মানুষকে ক্ষমতার অংশীদার করা। তা হলে প্রচলিত শাসনব্যবস্থাটি ভেঙে পড়তে পারে। তাই কৌশলে দ্রোণ একলব্যের শক্তিকে নির্মূল করে। আর দৃঢ় ও স্থায়ী করে উচ্চবর্গীয় ক্ষমতার ভিত।

বর্তমান শাসনকাঠামোর ক্ষেত্রেও উপর্যুক্ত বিষয়টি দৃশ্যমান। ধনতান্ত্রিক সমাজে মোট সম্পদের সিংহভাগ থাকে কতিপয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অধিকারে। অর্থনৈতিক ক্ষমতার কারণে তারা অর্জন করে সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতা। সমাজ, আইন, ধর্ম সব কিছু চালিত হয় তাদের স্বার্থে। কেউ এই প্রচলিত ব্যবস্থা অস্বীকার বা পরিবর্তন করতে চাইলে যে কোনো ভাবেই তাকে নিবৃত্ত করতে চায় তারা। তাই বর্তমানের একলব্যের পরিণতিও হয় মহাভারতের একলব্যের মতো। উচ্চবর্গের কৌশল সে আবারও ধরতে ব্যর্থ হয়। সমকালীন সমাজব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির নীতিহীনতা এবং নিম্নবর্গের আকাঙ্ক্ষা ও পরাজয়কে নাট্যকার মাসুম রেজা *নিত্যপুরাণ* নাটকে প্রতীকীভাবে উপস্থাপন করেছেন।

নিম্নবর্গের অসহায়ত্ব, সংস্কার এবং ক্ষমতাবানদের নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতার প্রতিফলন ঘটেছে মাসুম রেজার *জলবালিকা* (২০০৪) নাটকেও। এর কাহিনী গড়ে উঠেছে আলেক বাউলের জীবনের করুণ বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে। জয় বাউল নামে সে পরিচিত বিল সিন্দুরিয়ার মানুষের কাছে। কারণ নৌকা

Dhaka University Institutional Repository

বাইচের সময় যে নৌকায় সে গান গায়, সেই নৌকারই জয় হয়। এতে আলেক বাউল খ্যাতি অর্জন করলেও বস্তুগত লাভ হয় আমোদ মহাজনের। কারণ এই আয়োজনের কেন্দ্রে সে। নৌকা, মাঝি সবই তার। প্রতি বছরের মতো এবারও মহাজন আয়োজন করেছে নৌকা বাইচের। এজন্য আলেক বাউলকে এবার নৌকায় গাওয়ার জন্য সে নতুন গান বাধতে বলেছে । মহাজনের কথামতো গান লিখলেও আলেক বাউল এবার গাইতে অস্বীকৃতি জানায়। তার চাওয়া এবার কন্যা ঝলকই নৌকায় গান করুক। আলেকের এ প্রস্তাব মহাজন মানতে নাই চাইলেও শেষ পর্যন্ত গুনিনের কথায় রাজি হয়। ঝলকের গান-লয়-সুরের সমন্বয়ে মহাজনের নৌকা শেষ পর্যন্ত জয় লাভ করে। বিল সিন্দুরিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ঝলকের খ্যাতি। মেয়ের মধ্যে নিজের ছায়া, বেঁচে থাকার আশা দেখে আলেক বাউল। কিন্তু হঠাৎ চলে আসা-বান এবং স্ত্রীর দুঃস্বপ্ন তার জীবনে নিয়ে আসে করুণ পরিণতি। বানে ঘরবাড়ি ডুবে গেলে পরিবারসহ সে আশ্রয় নেয় স্কুলে। সেই রাতে বাউলের স্ত্রী নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে বাউল শেষ পর্যন্ত ছেলে ভাসান ও মেয়ে ঝলককে তাদের মামাবাড়ি শ্যামপুরে রেখে আসতে সম্মত হয়। কিন্তু বিশাল বিল পাড়ি দেয়ার মতো নৌকা তাদের নেই। মহাজনের কাছে নৌকা চাইলে সে রাজি হয় না। শেষে হরিশ মাল্লার ছোট নৌকায় ছেলেমেয়ে নিয়ে আলেক বাউল রওনা হয়। মাঝ বিলে যাওয়ার পর হঠাৎ ঝড় শুরু হয়। দুই তীরই তখন তাদের থেকে সমান দূরে। ঝড়ের দাপটে উল্টে যায় নৌকা। সন্তানদের নিয়ে সে তখন সাঁতার কেটে এগোতে থাকে। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর সে বুঝতে পারে, দুজনকে নিয়ে তার পক্ষে সাঁতরে তীরে ওঠা সম্ভব নয়। সঙ্কটে পড়ে আলেক বাউল। কাকে সে জনমের মতো ত্যাগ করবে? শেষ পর্যন্ত কন্যা ঝলকের থেকে সে হাত ছাড়িয়ে নেয়। ছেলেকে নিয়ে সাঁতরে ওঠে শ্যামপুর। বংশরক্ষার বাসনা এবং পুরুষতান্ত্রিক চেতনার কাছে পরাজিত হয় তার শিল্পসত্তা।

পুরুষতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর কারণে নিম্নবর্গের কামনা এবং বাসনা-জগতে নারীর থেকে পুরুষই বেশি স্থান দখল করে থাকে। আলেক সাধারণ নিম্নবর্গের থেকে চেতনাগতভাবে অগ্রসর হলেও প্রচলিত কাঠামোকে অস্বীকার করার মতো ব্যক্তিত্ব তার নেই। তাই যে মেয়েকে তিনি কলকাতার সঙ্গীতস্কুলে পড়ানোর চিন্তা করেন কিংবা যার মধ্যে নিজের ছায়া দেখেন– পঙ্গু ছেলেকে বাঁচানোর আশায় তাকেই তিনি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন। প্রচলিত ধারণায় বংশ রক্ষা করা লৌকিক এবং অলৌকিক উভয় ক্ষেত্রের জন্য অনুপেক্ষণীয়। কন্যা পিতৃবংশের অস্তিত্বকে বহন করতে পারে না। এই চেতনাটি নিম্নবর্গের মধ্যে বিদ্যমান বলে আলেক শেষ পর্যন্ত ছেলে ভাসানকে বাঁচিয়ে রাখে। নাটকটিতে নাট্যকার নিম্নবর্গের সামষ্টিক সত্তা বা ক্ষমতাকেন্দ্রিক কোনো বিষয়কে প্রাধান্য দেননি। নাটকের বেশির ভাগ স্থান জুড়ে থাকে গান নিয়ে আলেকের চিন্তা-চেতনা, স্বপ্ন। নাট্যকার তার যাপিত জীবনের কোনো সংকটও তেমনভাবে তুলে ধরেন না। ফলে সাংস্কৃতিক চেতনার সঙ্গে আর্থ-সামাজিক চেতনার সম্পর্কের কার্যকারণ এ নাটকে পাওয়া যায় না।

আলোচনা শেষে এটা বলা অত্যুক্তি নয় যে, বাংলাদেশের নাটকে গ্রামীণ নিম্নবর্গের জীবন বহুমাত্রিকভাবে রূপায়িত হয়েছে। প্রত্যেক নাট্যকার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে উপস্থাপন করেছেন গ্রামীণ-সমাজের অবহেলিত, দলিত, নির্যাতিত শ্রেণির মানুষকে। তাদের প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, প্রতিদিনের যাপিত জীবন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, অধীনতা– সর্বোপরি অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম প্রতিফলিত হয় আমাদের আলোচ্য কাল পরিসরের নাটকে। তবে এটা ঠিক যে, নাট্যকাররা শ্রেণিগত দিক থেকে মধ্যবিত্ত হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। নিম্নবর্গের জীবন উপস্থাপনে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও কার্যকারণ সম্পর্কের পরিবর্তে কখনো কখনো তারা মধ্যবিত্তীয় ভাবালুতা দ্বারা আচ্ছন্ন পড়েছেন। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের নাট্যকাররা যথেষ্ট মমতা ও সহানুভূতির সঙ্গে নিম্নবর্গের জীবন উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র নির্দেশ:

১. সৈয়দ জামিল আহমেদ, *উন্নয়ন নাট্য: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, সমাবেশ, ঢাকা, ২০০১, পৃ ২৭।
২. গৌতম ভদ্র, *ইমান ও নিশান, বাংলার কৃষক চৈতন্যের এক অধ্যায়*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৪। দ্রষ্টব্য: বইটির ফ্ল্যাপ।
৩. সৈয়দ শামসুল হক, *কাব্যনাট্য সংগ্রহ*, "ভূমিকা", 'নূরলদীনের সারাজীবন', বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ ৬১।
৪. সেলিম মোজাহার, *স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০৮, পৃ ৮৮।
৫. সৈয়দ শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫-৭৬ ।
৬. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস" *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ ১২।
৭. সেলিম মোজাহার, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৯।
৮. রাহমান চৌধুরী, *রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ওস্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক*, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৮।
৯. আবদুল্লাহ আল-মামুন, *নির্বাচিত নাটক*, রামেন্দু মজুমদার (সম্পা) "ভূমিকা", নালন্দা, ঢাকা, ২০১১।
১০. আবদুল্লাহ আল-মামুন, *নির্বাচিত নাটক*, 'এখন দুঃসময়', প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ ৬০।
১২. প্রাগুক্ত,পৃ ৬৬।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৮০।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৮২।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭।
১৭. সৌমিত্র শেখর, "আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে সমসময়" রামেন্দু মজুমদার (সম্পা) 'থিয়েটার', ৩৮তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০০৯, পৃ ৭৬।
১৮. আলমগীর খান, "মামুনুর রশীদের নাটক" 'থিয়েটার', ৩২তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মার্চ, ২০০৩, পৃ ১৪১।
১৯. ড. আশিস গোস্বামী, *আরণ্যক একটি নাট্যদলের কথা*, মধ্যমা, ঢাকা, ২০০১, পৃ ৫০।
২০. আলমগীর খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪২।
২১. মামুনুর রশীদ, *নির্বাচিত নাটক*, "ভূমিকা", মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯।
২২. আলমগীর খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪১।
২৩. মামুনুর রশীদ, *নির্বাচিত নাটক*, 'ইবলিশ' প্রাগুক্ত, পৃ ১০৯-১১০।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১২২।
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬।
২৬. প্রাগুক্ত পৃ ১৫৬।
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬০।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬০।
২৯. মামুনুর রশীদ, *ইবলিশ*, "ভূমিকা", মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৩।
৩০. মামুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত।
৩১. মামুনুর রশীদ, *অববাহিকা*, "ভূমিকা", মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬।
৩২. মামুনুর রশীদ, *নির্বাচিত নাটক*, 'অববাহিকা', প্রাগুক্ত, পৃ ২৭২।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২৮২।
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৩।
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৩।
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৬।
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৮।

৩৮. রাহমান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯৩।
৩৯. অরাত্রিকা রোজী, *বাংলাদেশের নাটক*, বাংলা একাডেমী,ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ ৪১।
৪০. মামুনুর রশীদ, *নির্বাচিত নাটক*, 'এখানে নোঙর' প্রাগুক্ত, পৃ ১৭২।
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৮।
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮০।
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯২।
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪।
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৭।
৪৬. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।
৪৭. মামুনুর রশীদ, *নির্বাচিত নাটক*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৮।
৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২০৫।
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ ২০৬।
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ ২০৭।
৫১. মামুনুর রশীদ, *এখানে নোঙর*, "ভূমিকা", মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৪।
৫২. অরাত্রিকা রোজী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১।
৫৩. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।
৫৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৫।
৫৫. রাহমান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০৩।
৫৬. আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস*, পড়ুয়া, ঢাকা, ২০০৩, পৃ ৪৬।
৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮।
৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮।
৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪।
৬০. ড. আশিস গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৩।
৬১. মামুনুর রশীদ, *নির্বাচিত নাটক*, 'রাঢ়াং', প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪৯।
৬২. ইলা মিত্রকে নাচোলের চণ্ডীপুর, কৃষ্ণপুর, কেন্দুয়া, ঘামড়া, শিবনগর, মান্দা, গোলাপাড়া, কানপুর ইত্যাদি গ্রামের সাঁওতালরা রাণীমা বলতো। দ্রষ্টব্য: মালেকা বেগম, *ইলা মিত্র*, , জ্ঞান প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ ৪৬।
৬৩. মামুনুর রশীদ, *নির্বাচিত নাটক*, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩৮।
৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪৪।
৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫১।
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫৩।
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫৩।
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬১।
৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬২।
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫৫।
৭১. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫৮।
৭২. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫৯।
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬৯।
৭৪. অরাত্রিকা রোজী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১।
৭৫. মামুনুর রশীদ, *নির্বাচিত নাটক*, 'সংক্রান্তি', প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯৪।
৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৬১৩।
৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৬০৫।
৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৬১৪।

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৬২৮।

৮০. মামুনুর রশীদ, *নির্বাচিত নাটক*, 'রাষ্ট্র বনাম', প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪০।

৮১. আলমগীর খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪১।

৮২. অরাত্রিকা রোজী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০।

৮৩. উদাহরণ হিসেবে গিনিপিগ নাটকের কথা বলা যায়। এনাটকে তিনি অবিশ্বাস্যভাবে গ্রাম থেকে আগত রাজার প্রতি সরকারী কর্মকর্তার কন্যা পপির দুর্বলতা দেখিয়েছেন। তাছাড়া পিস্তল, গুলি থাকা সত্ত্বেও রাজার মামার কাছে পপির শহুরে মাস্তান মামার কাছে হার স্বীকার করাও আরোপিত মনে হয়। মূলত নাটকটিতে নাট্যকারের বক্তব্য স্পষ্ট নয়।

৮৪. অনুপম হাসান, "সেলিম আল দীন-এর নাটকে প্রান্তিক মানুষ ও সমাজ-জীবন", হাসান শাহরিয়ার (সম্পা), 'থিয়েটারওয়ালা', ১০ম বর্ষ, ১-২ যৌথ সংখ্যা, জানু-জুন ২০০৮, পৃ ১৩৪।

৮৫. মোসাদ্দেক মিল্লাত ও সাইমন জাকারিয়া সম্পাদিত, ঢাকা থিয়েটার উৎসব স্যুভেনিরে দলের নাট্যাদর্শ, শেকড়ের সন্ধানে, বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার, ঢাকা: ১৬ মার্চ, ২০০২, পৃ ৩।

৮৬. অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩১।

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩১।

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩২।

৮৯. নুরুল করিম নাসিম, "নাট্যচক্রের 'করিম বাওয়ালীর শত্রু'", 'থিয়েটার' ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ ১৩০।

৯০. লুৎফর রহমান, *বাংলা নাটক ও সেলিম আল দীনের নাটক*, নান্দনিক, ঢাকা, ২০১২, পৃ ২৩০।

৯১. সেলিম আল দীন, *রচনাসমগ্র-১*, 'করিম বাওয়ালীর শত্রু অথবা মূল মুখ দেখা', সংকলন ও গ্রন্থন: সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৫, পৃ ১৪৮।

৯২. রাহমান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১০।

৯৩. লুৎফর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩০)

৯৪. অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৩।

৯৫. লুৎফর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩২।

৯৬. সেলিম আল দীন, *রচনাসমগ্র-১* 'আতর আলীদের নীলাভ পাট', প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৫।

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৪।

৯৮. লুৎফর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৪।

৯৯. রাহমান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১০।

১০০. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র-৩*, 'বাসন', সংকলন ও গ্রন্থন: সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ ২৪।

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫।

১০২. প্রাগুক্ত, পৃ ২৮।

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৩১।

১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪।

১০৫. পরিপ্রেক্ষিত দ্রষ্টব্য।

১০৬. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র-৩*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮।

১০৭. লুৎফর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬০।

১০৮. রাহমান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৩।

১০৯. অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৫।

১১০. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র-২*, 'কিত্তনখোলা', সংকলন ও গ্রন্থন: সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ ৯৬।

১১১. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮।

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৪।

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৫।
১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৫।
১১৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৬।
১১৬. রাহমান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৪।
১১৭. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র*-২, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৪।
১১৮. অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৭।
১১৯. লুৎফর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪১।
১২০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৪।
১২১. সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র- ২, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬১।
১২২. সেলিম আল দীন রচনা সমগ্র-২, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৯।
১২৩. লুৎফর রহমান, "বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাট্যচর্চা ও হরগজ" মফিদুল হক ও অরুণ সেন (সম্পা), *সাত সওদা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ ১৪৯।
১২৪. লুৎফর রহমান, *বাংলা নাটক ও সেলিম আল দীনের নাটক*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৬।
১২৫. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র*- ২, 'কিত্তনখোলা', প্রাগুক্ত, পৃ ১০৯।
১২৬. লুৎফর রহমান, "বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাট্যচর্চা ও হরগজ" মফিদুল হক ও অরুণ সেন, (সম্পা), *সাত সওদা*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৯।
১২৭. বেগম আকতার কামাল, "সেলিম আল দীনের 'মঞ্চের ট্রিলজি': শিল্পদর্শনের তিন সূত্র" 'উলুখাগড়া', সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পা), ১০ম সংখ্যা, পৃ ১৮৯।
১২৮. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র*- ২, 'কিত্তনখোলা' প্রাগুক্ত, পৃ ৮৪।
১২৯. অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৯।
১৩০. লুৎফর রহমান, *বাংলা নাটক ও সেলিম আল দীনের নাটক*, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪০।
১৩১. অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৯।
১৩২. লুৎফর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪১।
১৩৩. অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪০।
১৩৪. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র*-২, 'কেরামতমঙ্গল', প্রাগুক্ত, পৃ ২২৭।
১৩৫. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র*-২, প্রাগুক্ত, পৃ ২২৮।
১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩০।
১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৭।
১৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২৪০।
১৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৩।
১৪০. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫১।
১৪১. অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪২।
১৪২. লুৎফর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৫।
১৪৩. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র*-২, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৪।
১৪৪. অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৩।
১৪৫. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র*-২, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭২।
১৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৬।
১৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৯।
১৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৪।
১৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৮।
১৫০. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯২।
১৫১. অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৪।

১৫২. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র*-২, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৪।
১৫৩. রাহমান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৬।
১৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৬।
১৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৬।
১৫৬. সেলিম আল দীন *রচনা সমগ্র*-২, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৬।
১৫৭. বেগম আকতার কামাল, প্রাগুক্ত, ১৮৯।
১৫৮. অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৭।
১৫৯. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র*-৩, 'হাতহদাই', সংকলন ও গ্রন্থনা সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ ৭৮।
১৬০. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৩।
১৬১. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭।
১৬২. রণজিৎ সিংহ, "সেলিম আল দীনের নাটক: আঞ্চলিকের মহাকাব্য", *সাত সওদা*, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০।
১৬৩. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র*-৩, 'হাতহদাই', প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪।
১৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৬।
১৬৫. পবিত্র সরকার, "নানা গল্পের নকশি কাঁথা", *সাত সওদা*, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬।
১৬৬. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র*-৩, 'হাতহদাই',প্রাগুক্ত, পৃ ২০৮।
১৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৬।
১৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৭।
১৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১১০।
১৭০. প্রাগুক্ত, পৃ ১২৪।
১৭১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭১-১৭২।
১৭২. লুৎফর রহমান, *বাংলা নাটক ও সেলিম আল দীনের নাটক*, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭০।
১৭৩. বেগম আকতার কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৭।
১৭৪. অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৭।
১৭৫. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র-৪*, 'চাকা', সংকলন ও গ্রন্থনা: সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ ১৩৭।
১৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৮।
১৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৫।
১৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৫।
১৭৯. প্রাগুক্ত।
১৮০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬।
১৮১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬০।
১৮২. অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৮।
১৮৩. গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, "সাবঅলটার্ন কি কথা বলতে পারে?" জিল্লুর রহমান (অনু), *লিরিক* ১৩ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ ২৩০।
১৮৪. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র-৪*, ' যৈবতী কন্যার মন', প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪-১৯৫।
১৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২০০।
১৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২০৩।
১৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২০৭।
১৮৮. ফৌজিয়া খান, "যৈবতী কন্যার মন: দুই নামে দুই কায়া", 'উলুখাগড়া', প্রাগুক্ত, পৃ ২২৮।
১৮৯. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র-৪*, 'যৈবতী কন্যার মন', প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৫।

১৯০. অমর্ত্য সেন, "ভারতে শ্রেণী বিভাগের তাৎপর্য", অভীক সরকার (সম্পা),'দেশ', ৭০বর্ষ: ৬ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৩, পৃ ৩৯-৪০।
১৯১. লুৎফর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৬।
১৯২. অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩।
১৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩।
১৯৪. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র-৫*, 'বনপাংশুল', সংকলন ও গ্রন্থনা: সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ ৩১৭।
১৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৮-৩৫৯।
১৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭২।
১৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৫।
১৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭৭।
১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৪১৪।
২০০. প্রাগুক্ত, পৃ ৫০৬।
২০১. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭৯।
২০২. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯৩।
২০৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৫১৭।
২০৪. আফসার আহমেদ, "সেলিম আল দীন: মহাকালের মৃৎপাত্রে অঙ্কিত কালের কুমার" রামেন্দু মজুমদার (সম্পা), *নাট্যপরিক্রমা: চার দশকের বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯১।
২০৫. শান্তনু কায়সার, "প্রারম্ভিক সেলিম আল দীন", *থিয়েটারওয়ালা*, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪।
২০৬. অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৪।
২০৭. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র*-৬, 'প্রাচ্য' সংকলন ও গ্রন্থনা: সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ ৫৩।
২০৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১১।
২০৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩।
২১০. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯।
২১১. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭।
২১২. সাজেদুল আউয়াল, "কালের কথক: সেলিম আল দীন" *সাত সওদা*, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৫।
২১৩. অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৫।
২১৪. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র*-৬, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬৮।
২১৫. অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৪।
২১৬. সেলিম আল দীন *রচনাসমগ্র*-৬, 'স্বর্ণবোয়াল', সংকলন ও গ্রন্থনা; সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ ৫৭৩,
২১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯৪।
২১৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯৪।
২১৯. প্রগুক্ত, পৃ ৩৯৭।
২২০. প্রাগুক্ত, পৃ ৪২০।
২২১. প্রগুক্ত, পৃ ৪০৯।
২২২. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩০।
২২৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫০-৩৫১।
২২৪. বদরুজ্জামান আলমগীর, "সেলিম আল দীনের চরিতমানস" *থিয়েটারওয়ালা*, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪।
২২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪।
২২৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯।

২২৭. রাহমান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১১।

২২৮. আবদুল্লাহেল মাহমুদ, 'কৈবর্তগাথা' 'থিয়েটার', দ্বাবিংশতি বর্ষ, ১ম-২য় যুগ্ম সংখ্যা, নভেম্বর, ২০০০, পৃ ১৬।

২২৯. আবদুল্লাহেল মাহমুদ, কৈবর্তগাথা, 'থিয়েটার', প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭।

২৩০. মলয় ভৌমিক, 'বহে প্রান্তজন', 'থিয়েটার', ৩৩তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ ৭১।

২৩১. মান্নান হীরা, *ভাগের মানুষ*, এপিক বুক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ ৪১।

২৩২. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮।

২৩৩. গোলাম শফিক, 'শিলারি', 'থিয়েটার', ৩৫তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই ২০০৬, পৃ ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেই বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই'– চর্যাপদের ১৭ সংখ্যক এই পদের সূত্র ধরে বর্তমানে এটা স্পষ্ট যে, উনিশ শতক নয়, নাটক বলতে যা বোঝায় তার অনেক কিছু চর্যার সময় থেকেই বিদ্যমান। চর্যাকাররা আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিবেচনায় ছিলেন নিম্নবর্গ। উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ শাসকের অত্যাচারে সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়ে, বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তাঁদের আশ্রয় নিতে হয় পাহাড়ে-জঙ্গলে। শাসকের সুদৃষ্টি ছিল না বলে সাংকেতিকভাবে তাঁরা রচনার মধ্য দিয়ে সাধনতত্ত্ব ও জীবনবঞ্চনার কথা তুলে ধরতেন। এ সূত্রে বলা যায়, প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের মানুষ ও তার জীবন বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। সমাজ কর্তৃক নিপীড়িত-বঞ্চিত হওয়ার কথা চর্যাপদে বর্ণিত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা নাট্যেও আমরা নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের রূপায়ণ দেখতে পাই। ফলে একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, অভিনয় ও প্রদর্শনযোগ্য বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের মানুষের জীবন উঠে এসেছে উনিশ শতকের বহু আগে থেকেই।

হেরাসিম লেবেদেফের হাত ধরে অবিভক্ত বাংলায় পাশ্চাত্য ধারার যে নাট্যচর্চার শুরু হয় সেটির উদ্দেশ্য ছিল বিনোদন। ইংরেজ, দেশীয় জমিদার, মহাজন, উঠতি ধনীরা নিজেদের আনন্দ-উল্লাস, উপভোগপূর্ণ অবসর যাপনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয় নাটককে। নাট্যকাররাও ছিলেন সমাজের উচ্চবিত্ত, কিংবা উচ্চমধ্যবিত্ত থেকে উঠে আসা। তাই কথাসাহিত্যের মতো উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে রচিত বেশির ভাগ নাটকের বিষয় ছিল পৌরাণিক এবং অভিজাত চরিত্রকেন্দ্রিক। তবে সামাজিক অসঙ্গতির বিষয়টিও কেউ কেউ তুলে ধরেছেন। উদাহরণ হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ*'র কথা উল্লেখ করা যায়। এর হানিফ চরিত্রকে উনিশ শতকের বাংলা নাটকে নিম্নবর্গের সার্থক রূপায়ণ বলা যায়। ১৮৬০ সালে রচিত দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* বাংলা নাটকে নতুন মাত্রা যোগ করে। অভিজাত ও পৌরাণিক চরিত্র কিংবা সামাজিক অসঙ্গতি শুধু নয়, শাসক কর্তৃক সমাজস্থিত মানুষের শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতনও নাটকের বিষয় হয়ে উঠতে পারে *নীলদর্পণ*-এ নাট্যকার যেন সেটাই ব্যক্ত করেন। ক্ষমতা, শক্তি, ও আধিপত্যচেতনার কারণে এদেশের কৃষককে নীল চাষে বাধ্য করতে কোনো দ্বিধা করে না তারা। শাসকের কাছে এদেশীয় সবাই হয়ে পড়ে নিম্নবর্গ। কোনো প্রতিবাদে তারা সম্মিলিত হতে পারে না। শাসক কর্তৃক অত্যাচার ও দেশীয় কৃষকের অসহায়ত্ব খুব ভালভাবেই তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন দীনবন্ধু মিত্র। এভাবে ধীরে ধীরে বাংলা নাটক অভিজাত, উচ্চবর্গের মানুষের জীবনকে বাদ দিয়ে নিম্নবর্গ এবং মধ্যবিত্তকে নাটকের বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করতে শুরু করে। বাংলাদেশের নাটক সেই ধারাবাহিকতাকে ধারণ করে বিকাশমান।

১৯৪৭-পরবর্তী বাংলা নাটকে উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষও বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। আসকার ইবনে শাইখের বেশির ভাগ নাটকই নিম্নবর্গের মানুষকে নিয়ে। একরৈখিক ভাবে তিনি তাঁর নাটকে নিম্নবর্গের জীবন ও সমাজ বাস্তবাসবতা উপস্থাপন করেছেন। তবে শ্রেণিগত দিক বিবেচনায় মধ্যবিত্ত হওয়ার ফলে তাঁর নাটকে অনেক ক্ষেত্রে নিম্নবর্গ হাজির হয় মধ্যবিত্তীয় চেতনায় প্রভাবিত হয়ে। বেশির ভাগ নাট্যকারই ছিলেন মধ্যবিত্ত। এই শ্রেণিগত বোধ ও চেতনা তাঁরা নাটকে তুলে ধরেছেন। মূলত, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক কারণে ১৯৫০-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের নাট্যকার প্রতিবাদী ও শোষিত সমাজ চিত্রের চেয়ে আঙ্গিকগত ও সমাজবাস্তবতার প্রচ্ছন্ন রূপায়ণের দিকে বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েন। ফলে বেশির ভাগ নাট্যকার নিম্নবর্গের জীবনকে নাটকে উপস্থাপন করেননি।

১৯৭২- ২০০৭ কাল পরিসরে নাটকের বিষয় বিবেচনায় এটা প্রতীয়মান যে, স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ের তুলনায় এ সময়ে নাট্যকাররা নিম্নবর্গের জীবনকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই নাট্যবিষয়ে তুলে এনেছেন।

সহানুভূতির সঙ্গেই চিত্রিত করেছেন সমাজের অন্তে-থাকা এই শ্রেণির মানুষের জীবনবাস্তবতা। স্বাধীনতা-পূর্ব নাট্যকারদের মতো একাত্তর পরবর্তী নাট্যকাররা মধ্যবিত্ত হলেও শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতা তারা পূর্বসুরি তুলনায় বেশি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে পুরোপুরি পারেননি। তাই নিম্নবর্গের জীবন রূপায়ণে অনেক ক্ষেত্রে ভাবাবেগের প্রাবল্য আমাদের গবেষণার কালপরিসরের নাটকে দেখা যায়।

দেশ স্বাধীন হলেও আর্থ-সামাজিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। নিম্নবর্গের মানুষের জীবনযন্ত্রণার অবসানে শাসকরা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তাই নিজেদের জীবনের পরিবর্তনের ভার তাদের নিজেদের হাতে তুলে নিতে হয়। গ্রামীণ প্রেক্ষাপট তো বটেই, শাহরিক প্রেক্ষাপটের নাটকের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামো নিম্নবর্গের জীবনের কোনো নিরাপত্তা দিতে পারেনি; মৌলিক চাহিদাগুলোর একটাও রাষ্ট্র পুরোপুরি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বেঁচে থাকার তাগিদে তাই ভূমি, ভিটা, পিতৃপেশা কোনো কিছুই নিম্নবর্গের মানুষ ধরে রাখতে পারে না। কাটাতে হয় উদ্বাস্তু জীবন। এ জীবন থেকে মুক্তির আশায় তারা সম্মিলিত হয়েছে, প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু শাসকের ক্ষমতা ও শক্তির কাছে তাদের পরাজয় ঘটে বার বার। সৈয়দ শামসুল হক *নুরলদীনের সারা জীবন* নাটকে ইতিহাসের আলোকে নির্মাণ করেছেন সমাজবঞ্চিত এই জনগোষ্ঠীর সংগ্রামী জীবনবাস্তবতাকে। মামুনুর রশীদের *ওরা কদম আলী*, *ওরা আছে বলেই*, *ইবলিশ*, *এখানে নোঙর*, *অববাহিকা*, ইত্যাদি নাটকে নিম্নবর্গের একতাবদ্ধ প্রতিবাদ, প্রতিরোধের কথা উঠে এসেছে।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত না হলে জনমনে দেখা দেয় হতাশা। এই হতাশা থেকে এক সময় ক্ষোভ ও প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়। এটি আবদুল্লাহ আল মামুনের নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে তিনি নিম্নবর্গের সামষ্টিক জীবনকে উপস্থাপন করেননি। মধ্যবিত্ত চেতনাকে অতিক্রম করতে পারেননি বলে ব্যক্তির সুখ, দুঃখ, বেদনা, প্রতিবাদই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর নাটকে। *এখন দুঃসময়* নাটকের সোনা, *এখনও ক্রীতদাস* নাটকের বাক্কা মিয়ার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

পিতৃতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বিচারে নারীরা নিম্নবর্গের কাতারে। সমাজকর্তৃক তারা নানাভাবে বঞ্চিত হয়। তবে প্রতিবাদও করে মাঝে মাঝে। *কোকিলারা* নাটকের তিন নারী, *মেহেরজান আরেকবার* নাটকের মেহেরজান, *এখানে নোঙর* নাটকের সফুরা, *ইবলিশ* নাটকের আতশী চরিত্ররা সেই সত্য বহন করে। স্বাধীনতা তাদের জীবনে কোনো পরিবর্তন এনে দিতে পারে না। তাই শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন, প্রতারণা থেকে মুক্তি পেতে এবং স্বশ্রেণির মানুষকে মুক্তি দিতে নিজেরাই দায়িত্ব গ্রহণ করে। নিম্নবর্গের মানুষের আছে নিজস্ব জীবন দর্শন। যার বেশির ভাগই তারা অর্জন করে জীবনাভিজ্ঞতা থেকে। সেলিম আল দীনের নাটকে বিষয়টি ভালোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এরই আলোকে আনার ভাণ্ডারি, কেরামতকে সার্থক চরিত্র হিসেবে অ্যাখ্যা দেয়া যায়।

নিম্নবর্গের প্রতিবাদ কোনো সাংগাঠনিক নিয়ম মেনে চলে না। তাদের স্বতঃস্ফূর্ততার কারণে বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ সংঘটিত হয়। কোনো অধিকার আদায়ের জন্য যে দীর্ঘ মেয়াদী প্রস্তুতি, আন্দোলন ও কার্যক্রমের দরকার হয়, সমষ্টিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বিষয়টি নিম্নবর্গ অনুধাবন করতে পারে না। ফলে তাদের আন্দোলন উচ্চবর্গের শাসন কাঠামোয় একটা ধাক্কা দিতে সক্ষম হলেও পুরোপুরিভাবে সফলতা অর্জন করতে পারে না। বিষয়টি প্রতিবাদী নাটকগুলোতে অনুপস্থিত।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা উচ্চবর্গের শোষণের পথকে আরো প্রশস্ত করে। আর্থ-সামাজিক কাঠামোর কারণে নিম্নবর্গ প্রছলিত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না বলে নানাভাবে প্রতারণার শিকার হয়। *অববাহিকা* নাটকের জামান, *এখানে নোঙর*-এর চেয়ারম্যান, *কিত্তনখোলা*-র ইদু কন্টাক্টর, *বনপাংশুল*

নাটকের রাজু মহাজন– এদের মতো লোকেরা তাদের সহজে ঠকাতে পারে। ধর্মকে উচ্চবর্গ ব্যবহার করে নিজের স্বার্থে। কিন্তু বিশ্বাস প্রবল বলে এই সত্যটি নিম্নবর্গের চেতনায় সহজে ধরা পড়ে না। *ইবলিশ* নাটকের মুনশী, *এখনো ক্রীতদাস* নাটকের হাজী চরিত্ররা ধর্মের নামে সমাজে নিজের অবস্থানই শুধু পোক্ত করতে চায়।

নিম্নবর্গ হিসেবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনও রূপায়িত হয়েছে আলোচ্য কাল পরিসরে রচিত নাটকে। *রাঢ়াং* নাটকে উপস্থাপতি হয়েছে সাঁওতালদের উদ্বাস্তু জীবনের সংকট ও অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। সেলিম আল দীনের *বনপাংশুল* নাটকে তুলে ধরেছেন মান্দাই গোষ্ঠীর মানুষের অনিবার্য জীবনবাস্তবতা। বাঙালির আধিপত্যকামী মানসিকতার কারণে দিনে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা। তবু তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে সেগুলো ধরে রাখার জন্য।

নিম্নবর্গীয় মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপায়ণ ঘটেছে বাংলাদেশের নাটকে। গ্রাম-শহর উভয় স্থানের নিম্নবর্গের জীবন-সত্যকে আলোচ্য কাল পরিসরের নাটকের রচয়িতারা তুলে ধরেছেন। রূঢ় জীবনবাস্তবতা থেকে নিম্নবর্গের পরিত্রাণে এবং জীবনব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আলোচ্য নাটকগুলো আমাদের দিক নির্দেশনা দিতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

মূল গ্রন্থ

কাব্যনাট্যসংগ্রহ: সৈয়দ শামসুল হক, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা ১৯৯১।

নির্বাচিত নাটক: আবদুল্লাহ আল মামুন, নালন্দা, ঢাকা, ২০১১।

নির্বাচিত নাটক: মামুনুর রশীদ, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯।

সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-১ : সংকলন ও গ্রন্থন সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৫।

সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র- ২: সংকলন ও গ্রন্থন সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬।

সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৩: সংকলন ও গ্রন্থন সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮।

সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৪: সংকলন ও গ্রন্থনা সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯।

সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র- ৫: সংকলন ও গ্রন্থনা সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১০।

সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৬: সংকলন ও গ্রন্থনা: সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১।

নাটকসমগ্র: আবদুল্লাহেল মাহমুদ, নতুন কুঁড়ি, ২০০৪।

কৈবর্তগাথা: আবদুল্লাহেল মাহমুদ, থিয়েটার, দ্বাবিংশতি বর্ষ, ১ম-২য় যুগ্ম সংখ্যা, নভেম্বর, ২০০০।

বহে প্রান্তজন: মলয় ভৌমিক, থিয়েটার, ৩৩তম বর্ষ, তয় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০০৪।

ভাগের মানুষ: মান্নান হীরা, এপিক বুক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৯।

শিলারি: গোলাম শফিক, থিয়েটার, ৩৫তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই ২০০৬।

নিত্যপুরাণ: মাসুম রেজা, থিয়েটার, ৩১তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০০২।

জলবালিকা: মাসুম রেজা, থিয়েটার, ৩৩তম বর্ষ, তয় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০০৪।

সহায়ক গ্রন্থাবলি:

নিম্নবর্গের ইতিহাস: গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪।

বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ: মহীবুল আজিজ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২।

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার: কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, ডি রিয়াজনভ ও ভি. জি কিয়ের্নান সম্পা, সেরাজুল আনোয়ার অনূদিত, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৩।

আনতোনিও গ্রামশি বিচার-বিশ্লেষণ: শোভন দাশগুপ্ত (সম্পা) ১ম খণ্ড, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৩।

আনতোনিও গ্রামশি বিচার-বিশ্লেষণ: শোভন দাশগুপ্ত (সম্পা) ২য় খণ্ড, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০।

জাতি বর্ণ ও বাঙালি সমাজ: শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পা, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৮।

ইমান ও নিশান, বাংলার কৃষক চৈতন্যের এক অধ্যায়: গৌতম ভদ্র, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৪।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন: মো. মেহেদী হাসান, মনন প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ: মিল্টন বিশ্বাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯।

বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস: রঙ্গলাল সেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৭।

ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ: ইরফান হাবিব, ভাষান্তর কাবেরী বসু, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬।

ভারতের ইতিহাস: হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ, ১৯৯৭।

বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব: নীহাররঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৬।

বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: সালাহউদ্দীন আহমদ, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২।

বাংলাদেশ: রাষ্ট্র সমাজ সামাজিক অর্থনীতির স্বরূপ: অনুপম সেন, সাহিত্য সমবায়, ঢাকা, ১৯৯৯।

বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি: আসকার ইবনে শাইখ, সাত রং প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬।

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা: সুকুমার বিশ্বাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।

বাংলাদেশের ইতিহাস (তয় খণ্ড): সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০।

নাট্যপরিক্রমা: চার দশকের বাংলাদেশ: রামেন্দু মজুমদার (সম্পা), নবযুগ, ঢাকা, ২০১৩।

মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম: মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।

রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের নাটক: রাহমান চেন্ধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭।

বিষয়: নাটক: রামেন্দু মজুমদার, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬।

স্বাধীনতা-উল্টর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা: সেলিম মোজাহার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮।

বাংলাদেশের নাটক: অরাত্রিকা রোজী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬।

উন্নয়ন নাট্য: তত্ত্ব ও প্রয়োগ: সৈয়দ জামিল আহমেদ, সমাবেশ, ঢাকা, ২০০১।

আরণ্যক একটি নাট্যদলের কথা: ড.আশিস গোস্বামী, মধ্যমা, ঢাকা, ২০০১।

বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস: আমজাদ হোসেন, পড়ুয়া, ঢাকা, ২০০৩।

ইলা মিত্র: মালেকা বেগম, জ্ঞান প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯।

বাংলা নাটক ও সেলিম আল দীনের নাটক: লুৎফর রহমান, নান্দনিক, ঢাকা, ২০১২।

সাত সওদা: মফিদুল হক ও অরুণ সেন (সম্পা) সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮।

সেলিম আল দীন নাট্যকারের স্বদেশ ও সমগ্র: অরুণ সেন, দুই বাংলার থিয়েটার প্রকাশন, বগুড়া ২০০০।

কহনকথা, সেলিম আল দীনের নির্বাচিত সাক্ষাতকার: সংকলক ও গ্রন্থক সোহেল হাসান গালিব, নওশাদ জামিল, শুদ্ধস্বর, ঢাকা, ২০০৮।

সহায়ক ইংরেজিগ্রন্থ:

Subaltern Studies-1: রণজিৎ গুহ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লি, ১৯৮২।

Subaltern Studies-5: রণজিৎ গুহ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস , দিল্লি, ১৯৮৭।

Selections form the prisons note books: আন্তোনিও গ্রামসি,ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, মাদ্রাজ, ১৯৯৬।

An Introduction to the Study of Indian History : দামোদর কোশাম্বী, পপুলার প্রকাশন, বোম্বে, ১৯৭৫।

Changing Society in India, Pakistan and Bangladesh: এ কে নাজমুল করিম, পাকিস্তান এ্যান্ড বাংলাদেশ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৬।

সহায়ক পত্রিকা:

উলুখাগড়া: সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পা), ১০ম সংখ্যা, ২০০৮।

নতুন দিগন্ত: সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা) ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৪।

আবহমান: আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ২য় বর্ষ ১ম-৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০০৬।

আবহমান বাংলা: মুস্তাফা নুর-উল ইসলাম (সম্পা), আকাশ প্রদীপ, ঢাকা, ১৯৯৩।

থিয়েটার: রামেন্দু মজুমদার (সম্পা), ১৩তম বর্ষ, ৩য়-৪র্থ যুগ্ম সংখ্যা, জুন ১৯৮৭।

থিয়েটার: দ্বাবিংশতি বর্ষ, ১ম-২য় যুগ্ম সংখ্যা, নভেম্বর, ২০০০।

থিয়েটার: ৩২তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মার্চ, ২০০৩।

থিয়েটার: ৩৮তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯।

থিয়েটার: ৩৯তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই ২০১০।

থিয়েটারওয়ালা: হাসান শাহরিয়ার (সম্পা), ১০ম বর্ষ: ১ম-২য় যৌথ সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, ২০০৮।

থিয়েটারওয়ালা: হাসান শাহরিয়ার (সম্পা), ১০ম বর্ষ: ৩য়-৪র্থ যুগ্ম সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৮।

দেশ: অভীক সরকার (সম্পা), ৭০বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৩।

শেকড়ের সন্ধানে: (ঢাকা থিয়েটার উৎসব স্যুভেনিরে দলের নাট্যাদর্শ) , মোসাদ্দেক মিল্লাত ও সাইমন জাকারিয়া (সম্পা), বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার, ঢাকা, ২০০২।